অন্নদাশঙ্কর রায়

ছড়া সমগ্র

DESERTER

SCANNED BY

THE FALLEN ANGEL OF BOOKS

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৯৪
তৃতীয় সংস্করণ
মে ১৯৯৮
চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ
জানুয়ারি ২০০৩

© আনন্দরূপ রায়

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
প্রণবেশ মাইতি

লেখকের আলোকচিত্র
রবি দত্ত

একশো ত্রিশ টাকা

ভূমিকা

আমার কতক ছড়া ছোটদের জন্যে, কতক বড়োদের জন্যে, কতক ছোট বড়ো নির্বিশেষে সকলের জন্যে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কয়েকটি বই ছোটদের জন্যে ও কয়েকটি বড়োদের জন্যে অভিপ্রেত। এখন সকলের জন্যে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হচ্ছে।

ছড়া কত রকমের হয়। ইংরেজী ভাষায় তার অশেষ বৈচিত্র্য। বাংলায় এত রকম বৈচিত্র্য নেই। চেষ্টা করেছি কিছু বৈচিত্র্য যোগ করতে। কিন্তু জোর করে নয়। ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চা[illegible] পদ্য। তাতে [illegible] থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে, নয়তো নয়।

আরো একটা লক্ষ্য ছিল আমার। যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আয়েসে আরামে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী উপায়ে? আমি তো চাষী বা কারিগর বা মজুর নই। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেইজন্যে গান্ধীজী বলেছেন সুতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে আমার মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছি, ছেড়ে দিয়েছি। পিতৃঋণ ঋষিঋণ ইত্যাদির মতো এটাও এক প্রকার ঋণ। কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। পারবও না। কোনো মতেই সেসব রচনা সহজবোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তা হলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? 'না' 'না' করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি। তারপর থেকে লিখে আসছি। পেরেছি কি পারিনি যাদের জন্যে লেখা তারা বিচার করবে।

ব্যালাড ঠিক ছড়া নয়, কিন্তু লোকসাহিত্যের সামিল। চেষ্টা করেছি, আরো করা উচিত, অবসর পাইনি। ইচ্ছে আছে, দেখা যাক।

এই সঙ্কলনের উদ্যোক্তা শ্রীমান ধীমান দাশগুপ্ত ও শ্রীমান অবনীন্দ্র বেরাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যিনি প্রচ্ছদ এঁকেছেন তাঁকেও।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ | **অন্নদাশঙ্কর রায়**

ছোটদের জন্য আরো বই পেতে

এখানে ক্লিক করবেন

কথামুখ	৯-১৬
ছড়ার ভূমিকা	
ছড়ার কথা	
ছড়া লেখা	
অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ছড়া বিষয়ে সাক্ষাৎকার	১৭-২২
রাঙা ধানের খই (১৯৫০)	৩৫-৫৮
ডালিম গাছে মৌ (১৯৫৮)	৫৯-৮০
আতা গাছে তোতা (১৯৭৪)	৮১-১০৬
হৈ রে বাবুই হৈ (১৯৭৭)	১০৭-১২২
রাঙা মাথায় চিরুনি (১৯৮০)	১২৩-১৪২
বিন্নি ধানের খই (১৯৮৯)	১৪৩-১৭৪
সাত ভাই চম্পা (১৯৯৪)	১৭৫-১৯৮
দোল দোল দুলুনি (১৯৯৮)	১৯৯-২১৬
রাঙা ঘোড়ার সওয়ার (২০০২)	২১৭-২৩৪
উড়কি ধানের মুড়কি (১৯৪২)	২৩৭-২৮৯
শালি ধানের চিড়ে (১৯৭২)	২৯১-৩১৪
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ (১৯৯৪)	৩১৫-৩৪৬
অগ্রন্থিত ছড়া (২০০২)	৩৭৩-৩৭৫
গ্রন্থপঞ্জী	৩৭৭-৩৮৩

ছড়ার ভূমিকা

আমার নিজের ছড়া লেখা শুরু হয়েছিল এইভাবে—'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্য বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজি ক্লেরিহিউ, লিমেরিক, রুথলেস রাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না।

আমার কাছে আদর্শ ছড়া ছিল 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো', 'হাট্টিমা টিম টিম'—এই সব। একদিকে খাঁটি লোকসংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমিক যা সঞ্চারিত হয়। এসব ছড়া কার লেখা, কবে বানানো কেউ জানে না। আর একদিকে হিউমারাস বা ননসেন্স কিছু। তখন ছড়া পড়তাম।

বুদ্ধদেববাবুর তাগিদে হঠাৎ কিছু ছড়া তৈরি হয়ে গেল। কবিতার মত ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আরটিফিসিয়ালিটির স্থান নেই।

জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কতকিছু নিচ্ছি, অনেককিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দিচ্ছি কি? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়ার জন্যে একপ্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম। এমন লেখা যা সেলফ্-কনশাস্ না হয়ে পড়ে। যা পড়ার দরকার নেই, শুনলেই সবাই বোঝে, বুঝতে পারে। যাদের আমরা অশিক্ষিত, সাদামাটা ভাবি তাদের কাছেই আমার অনেক শেখার আছে।

লোকছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক্ উইস্‌ডম ধরা থাকে, এ ছাড়া নানান্ সম্প্রদায়ের ছড়ায় এথ্‌নিক ব্যাপারও থাকে।

আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্য দিয়ে ওই সাধারণদের জন্য বলতে। সব সময় পারিনি। আমার ছড়াও কখনো সফিস্‌টিকেটেড হয়ে গেছে।

ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আন্‌ইভেন। বাক্‌পটুতা, কারিকুরি নয়।

কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমন কি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ. একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু।

আমিও ওতেই লিখেছি। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করছি কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল। দু সিলেবল হবেই। তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না।

এসব অনেকে এখন মানেন না, এক সিলেবল মিল দিয়ে ছেড়ে দেন, ক্রিয়াপদের সঙ্গে

ক্রিয়াপদের মিল, ফাঁকিবাজি। ইংরেজি ছড়ায় দেখেছি শব্দ কখনো কখনো পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে দেয়। বাংলা ছড়াতেও ওটা এখন আসছে।

ভাব ও ছন্দ তো থাকবেই, এছাড়াও ছড়ার থাকবে ইমেজ ও মিল। ছড়ার ইমেজ মিল রেখে আসে না, পারম্পর্য কম। হাট্টিমা টিম টিম। তারা মাঠে পাড়ে ডিম। তাদের খাড়া দুটো শিং—শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়া হল। কমলাপুলির টিয়েটা। সূয্যিমামার বিয়েটা—ইমেজ আসছে হঠাৎ হঠাৎ।

ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বহু পুরাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়া নিয়মিত লেখার প্রচলনটা সম্প্রতি হয়েছে, গত তিরিশ চল্লিশ বছরে। এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা, সরস হবে তা কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে।

ধাঁধা প্রবচন লোকগীতি গাথা সবই তো সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না। আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

ছড়া যদি জনসাধারণ নেয়, শুধু আমি বা আমরা কয়েকজন ছড়া লিখবো, তা আমি কোনোদিনই চাই না। সবাই লিখুক, তার মধ্যেই কিছু ছড়া বেঁচে থাকবে, তাহলেই ছড়ার, ছড়ার ফর্মের সার্ভাইভ্যাল সম্ভব। নয়তো শুধু কয়েকজনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর কি হবে!

তবে এটা তো আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোযাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে, সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্টিভ সেন্সটা আর নেই।

আজ প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব ঢং এসেছে। মিল, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া।

একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সীরিয়াস কবি লেখকরা ছড়া লিখতেন না, যারা ছড়া বানাতো—মেয়েরা চাষীরা শিশুরা—তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সীরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়, বেশীর ভাগই পদ্য।

১৯৮০ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

ছড়ার কথা

বিশ বছর আগে কবিতা লিখতে লিখতে আমার মনে হলো কবিতার ভাষা ঠিক না হলে কবিতা ঠিক হবে না। ভাষা নিয়ে দশ বছর খাটতে হবে আমাদের কবিদের। দেখলুম, বাংলা

গদ্যের ভাষার বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পদ্যের ভাষার তেমন কিছু হয়নি। এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের বাল্যে যেমন ছিল বার্ধক্যেও মোটের উপর তেমনি রয়ে গেছে। ছন্দ দিয়ে, সংস্কৃত শব্দ দিয়ে এ সত্য ঢাকা পড়েছিল, আর ঢাকা থাকছে না। অনেকেই সেইজন্যে পদ্যের মতো করে সাজিয়ে ছদ্মবেশী গদ্য লিখছেন। ভাবছেন মানুষের কানকে ফাঁকি দিয়ে যা লিখবেন তা কবিতা বলে গণ্য হবে, কবিতার মতো আনন্দ দেবে। এই যে ফজলির বদলে ফজলিতরো এর মধ্যে সমাধানের ইঙ্গিত নেই। যা আছে তা সমস্যা থেকে পলায়নের কৌশল।

কবিতাকে পদ্য রেখে, পদ্যছন্দের শাসন মেনে তার ভাষা বদলে দেওয়া যায় কি না এই হলো তখনকার দিনে আমার প্রথম জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিজ্ঞাসা এল। ছন্দ তো যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটু সুর এলে মন্দ হয় না। সুর কিন্তু গানের সুর নয়। গানের সুর সঙ্গীতের রাজ্যের ব্যাপার। সঙ্গীত আমার পক্ষে পররাজ্য। আমি চাই কবিতার সুর, কথার সুর। গায়কের সাহায্য না নিলেও সে সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে।

লক্ষ্য করলুম অমিয় চক্রবর্তী এ লাইনে কিছু কাজ করছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ছন্দ পদ্যছন্দ নয়, গদ্যছন্দ; নাচন নয়, হাঁটন। আর করছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ছন্দ গদ্যছন্দ নয়, পদ্যছন্দ। একটা প্রচ্ছন্ন সুর তাঁর কবিতায় গুন গুন করে। বুদ্ধদেবকে প্রথমে কিছু কাজ করতে দেখা গেল। কিন্তু তিনি তখন ফ্রী ভার্স নিয়ে পরীক্ষারত। সেখানে তাঁর ভাষা সত্যি নতুন। কিন্তু পদ্যে হাত দিলেই সেই পুরনো বোল বেরিয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় উপলব্ধি করেছিলেন কোথায় কী বিগড়েছে। তাই ছড়ায় মন দিতে চেয়েছিলেন। লেগে থাকলে সেই মার্গে সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি তো বাঁচলেন না। বড়ো রকম পরীক্ষা চালাবার মতো বয়সও তাঁর নয়। বিশেষত তাঁর হাত যখন ছবির কাছে বাঁধা। আমার সঙ্গে একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, ওহে, ছড়া লেখ। আমিও লিখছি। আমার তখন চাকরির ঝামেলার উপর বৃহৎ উপন্যাসের ঝঞ্ঝাট। আমি তো কেবল কাহিনী বলে খালাস হইনে, বাক্যের পর বাক্য বানাই। বাক্য ঠিক না হলে আমার লেখাই এগোয় না। একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, অমন খুঁতখুঁত করলে তুমি কোনোদিন ঔপন্যাসিক হবে না, উপন্যাস লেখার রীতি ও নয়।

ঠিক ছড়া না হলেও লিমেরিক ও ক্লেরিহিউ গোটা কতক লিখেছিলুম ছেলেদের জন্যে। ছড়ার কথা ভাবিনি। রবীন্দ্রনাথের ছড়াও আমার কানে ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ার লাইন ওভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়। কিন্তু এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা বা সময় ছিল না আমার। আমি যেটুকু অবকাশ পেতুম উপন্যাস গঠনে নিয়োগ করতুম। ওটা একপ্রকার নির্মিতি। ছড়ার আর্জি এল হঠাৎ একদিন বুদ্ধদেববাবুর চিঠি থেকে। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্যে তিনি ষোলোটি কবিতা চেয়েছিলেন। ছড়া নয়। আমি তো এক কথায় 'নেই' বলে দিলুম। তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক দিনেই দশ-বারোটি

ছড়া তৈরি হয়ে গেল। বুদ্ধদেববাবুকে পাঠিয়ে দিলুম। বই হলো আরো কয়েকটি রচনা জুড়ে। এর পর থেকে ছড়ার চাড় এল। ছোট ও বড়ো উভয়ের জন্যে অনেক লিখতে হলো।

কিন্তু সে এক বিচিত্র প্রেরণা। আমার আসল লক্ষ্য শিক্ষিত আধুনিক ব্যঙ্গরসিক মন নয়। কিংবা কল্পনাপ্রবণ শিশু মন নয়। আমি চেয়েছিলুম সেইভাবে আমার ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করতে। যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের হাতে "ক্যাশ" নয়, "কাইণ্ড" দিতে। ঐ ভাবে যা গড়ে উঠবে তা একপ্রকার জনসাহিত্য বা লোকসাহিত্য। গণসাহিত্য কথাটা আমার ভালো লাগেনি। অবশ্য একজনের চেষ্টায় কতটুকুই বা হবে! এ কাজ একাধিকের। শতাধিকের। আমি শুধু আমারি কর্তব্যটুকুর দায়িত্ব নিয়েছি। এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই, আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কানে কানে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিক হয় তা হলেই আমি ধন্য। বই হবে, বিক্রি হবে, মুনাফা পাওয়া যাবে এসব তখন আমার চিন্তার বাইরে। মডেল হিসেবে আমি নিয়েছিলুম ছেলে-ভোলানো ছড়া। আগডুম বাগডুম ইত্যাদি। যার বয়স হাজার বছরেরও বেশী। একদিকে জনসাধারণ, অন্যদিকে নিরবধি কাল, দুই দিকে দুই মালিক আমাকে কান ধরে ওঠ-বস করিয়েছে।

এখন ছড়ায় তেমন রুচি নেই আমার। ব্যালাড লিখতে পারলে কৃতার্থ হই।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ **অন্নদাশঙ্কর রায়**
(শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রীকে লিখিত পত্র)

ছড়া লেখা

ছড়া লেখা কথাটা ঠিক নয়। হওয়া উচিত ছড়া কাটা। ছড়া কাটতে হয় মুখে মুখে। কলমের মুখে নয়। ঠাকুমা দিদিমারা এখনো মুখে মুখে ছড়া কাটেন। পুরনো ছড়া নয়, নতুন ছড়া। তাঁদেরই বানানো।

আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, সব দেশে দেশেই প্রথমে ছিল একটা মৌখিক ঐতিহ্য। ওরাল ট্রাডিশন। তার পরে এল লৈখিক ঐতিহ্য। রাইটিং ট্রাডিশন। ছড়া, বচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি প্রভৃতি লোকের মুখে মুখে গজিয়ে উঠত। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। পুরুষানুক্রমে! যুগ যুগ ধরে! সেসব সৃষ্টি কাগজে কলমে ধরে রাখার চেষ্টা করা হতো না। তাই অধিকাংশই বুদ্বুদের মতো উঠে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেত।

সংগ্রহ করে রাখার উদ্যম শুরু হয় পশ্চিমেই। ছাপার অক্ষরে। ক্রমশ প্রচার বাড়ে। যে ছড়া নিতান্ত সাময়িক সেটা সময়ের বেড়া পেরিয়ে যায়। যে ছড়া একান্ত স্থানীয় সে

ছড়া স্থানের সীমানা উত্তীর্ণ হয়। উপভাষায় রচিত ছড়া সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হতে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ভাষার ছাঁচে ঢালাই হয়। পশ্চিমের মতো এদেশেও সেইরকম ঘটে। গবেষক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'র আদি রূপ কী ছিল, তার উৎপত্তি কোথায়, তার সঙ্গে আর কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেটা কবে আর কোথায়? আমরা যে আকারে পাই সেই আকারটা নিশ্চয়ই কয়েক শতকের বিবর্তনের ফল। লিখিত ও মুদ্রিত হলে বিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্য যেখানে বিবর্তন সেখানে মুখে মুখে হয়।

আমরা যদি মনে রাখি যে ছড়ার ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের মৌখিক ঐতিহ্য তা হলে আমরাও সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ছড়া কাটব বা লিখব। যাঁরা লিখতে চান তাঁরা ঢাকার বা চট্টগ্রামের উপভাষাতেও লিখতে পারেন। পরে সেটাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার আদলে আনা যাবে। ছড়া হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। তার প্রধান শত্রু হচ্ছে কৃত্রিমতা ও চাতুরী। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। চালাকির দ্বারা খাঁটি ছড়াও হয় না।

খাঁটি ছড়া কলমের মুখে ফুটলেও তার ধরনটা হবে অশিক্ষিত মানুষের মুখে ফোটা ছড়ার মতো। দেশের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খাবে। সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবে। সহজেই মুখে মুখে ঘুরবে। লোকে একদিন ভুলে যাবে কে লিখেছেন। যেমন ভুলে গেছে 'আগডুম বাগডুম' কার মুখ থেকে নিঃসৃত।

লোকসাহিত্য যাকে বলা হয় তার মূলে এক একজন ব্যক্তিই। দশজনে মিলে একটা ছড়া বা কাহিনী বানায় না বা শোনায় না। তবে দশজনে মিলে কিছু কিছু জুড়ে দেয়। সেটা লিখিত ছড়া বা কাহিনীর বেলা চলে না। সেক্ষেত্রে লেখক কে তা স্পষ্ট। লেখকই তার গুণাগুণের জন্যে দায়ী। পদাবলীকাররা সযত্নে নিজ নিজ নাম সন্নিবিষ্ট করতেন। চিনতে ভুল হয় না কোন্ পদটা বিদ্যাপতির, কোন্‌টা চণ্ডিদাসের, জ্ঞানদাসেরই বা কোন্‌টা। পদাবলীর পদ কখনো দু'লাইনের বা চার লাইনের হয় না। ছয় লাইন বা আট লাইনেরও না। অপরপক্ষে ছড়া, বচন, ধাঁধা ইত্যাদি মনে রাখবার মতো সংক্ষিপ্ত।

শিক্ষিত ভদ্রলোকরা কখনো ছড়া জাতীয় রচনায় হাত দিয়েছেন বলে শোনা যেত না। এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রয়াস। তবে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যেও আমরা এ জাতীয় পঙ্‌ক্তি পাই। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। অনায়াসে মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথই আমাকে ছড়া লিখতে বলেন। তাঁর নিজের লেখা একখানা বইও পাঠিয়ে দেন! "সে।" তাতে তাঁর স্বরচিত ছড়াও ছিল। একজন মহাকবির পাকা হাতের লেখা। অশিক্ষিত পটুত্বের কণামাত্র নিদর্শন নেই। চতুর, কৌশলী রচনা। পদে পদে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। বাগ্‌বিভূতি! নিটোল নিপুণ পদ্য বলতে পারি, কিন্তু ছড়া? আমার ছড়ার ধারণার সঙ্গে মেলে

না। রবীন্দ্রনাথ যা-ই লেখেন তা সাহিত্য হয়। কিন্তু লোকসাহিত্য? চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার মতো রসাত্মক বাক্য? না বোধ হয়।

গুরুদেবকে বলি ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না। তার বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। "করেছি পণ নেব না পণ বৌ যদি হয় সুন্দরী।" তার পর আরো এগিয়ে যাই। আমার উদ্দেশ্য হয় এমন কিছু দেওয়া যেটা আমাকে যারা খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের অর্থাৎ চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলা ইত্যাদির ঋণশোধ। তারা যদি গ্রহণ করে ও স্মরণ রাখে তা হলেই আমি কৃতার্থ। বলাবাহুল্য তাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিল না। আমার প্রকাশিত রচনা তাদের কাছে পৌঁছয় না। অধিকাংশই নিরক্ষর। ক্রমে ক্রমে আমার ছড়া শিশুদের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। পত্রিকার সম্পাদকদের দিক থেকে অনুরোধ আসে। আমিও লিখে কৌতুক পাই। চাষীর সঙ্গে চাষী না হই, শিশুর সঙ্গে শিশু তো হয়েছি।

এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকটা ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাতীয় সংগ্রাম প্রভৃতির। আমার ছড়া সমসাময়িক ঘটনাবলীর খাতেও বয়। চারদিক থেকে তার জন্যে অনুরোধ আসে। ছড়াই হয়ে ওঠে আমার রাজনৈতিক ভাষ্য, যদিও আমি রাজনীতির বাইরের লোক। কৌতুক রসই আমার অবলম্বন। তার আড়ালে থাকে নিগূঢ় মর্মবেদনা। সে বেদনার শরিক সকলেই। "তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো" তেমনি এক বেদনার সকৌতুক প্রকাশ। যেখানেই যাই এটি শুনতে পাই। কাল সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে শুনে এলুম। বাংলাদেশে গিয়েও শুনেছি।

ছড়া লিখতে বসলেই লেখা যায় না। তার জন্যে মন মেজাজ অনুকূল হওয়া চাই। ইংরেজীতে যাকে বলে মুড, আমি তাঁর অপেক্ষায় থাকি। একটা কি দুটো লাইন আপনা থেকে আসে। তা না হলে ছড়া সুগম হয় না। এক একটা সুরও এক এক সময় আমাকে তার উপযুক্ত বাক্যের সন্ধানী করে। কথা আগে না সুর আগে? কখনো কথা আগে, কখনো সুর আগে। ছড়াকে লোকে ছড়া গানও বলে। ছড়াকে গান হিসাবেও গাওয়া যায়। আমার কোনো কোনো ছড়া গান হিসাবে গ্রামোফোন রেকর্ডে ঠাঁই পেয়েছে। সুর কিন্তু আমার দেওয়া নয়।

ছড়ায় হাত দেওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। আমি আগেকার দিনে কবিতাই লিখতুম। কিন্তু ছন্দ ও মিল বজায় রাখাই অভ্যাস। যাঁরা গদ্য-কবিতা লেখেন আমি তাঁদের একজন নই। আমি পুরাতন ঐতিহ্য অনুসরণ করি। কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন ভাষা খাপ খায় না। আর পুরাতন ভাষা আমার পছন্দ হয় না। গদ্যে আমি সাধুভাষার পক্ষপাতী নই। পদ্যেই বা হই কী করে? কবিতা কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না দেখে আমি কবিতা লেখা মুলতুবি রাখি। আগে ভাষাটাকে তার উপযোগী করি, তার পরে আবার লিখব। ইতিমধ্যে ছড়া লিখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। ঘোলও যথেষ্ট স্বাদু। গ্রীষ্মকালে ঘোলের সরবৎ কে না ভালোবাসে? দুধও থাকবে, ঘোলও থাকবে, উভয়ের সমঝদারও থাকবে। টক টক মিষ্টি

মিষ্টি ঘোল কারো কারো কাছে আরো মুখরোচক। আমার কবিতার পাঠকের চেয়ে ছড়ার পাঠকসংখ্যাই বেশী।

কবিতার মতো ছড়া লেখাও একটা সাধনা। মহাকবিরাও শব্দের মায়ায় পড়ে মায়ামৃগের পেছনে ছোটেন। সীতাকে ভুলে যান। ছোট ছোট ছড়াকাররা কিন্তু তেমন নন! 'খুকুমণির ছড়া' আমার আদর্শ। শব্দ ছড়াকারদের কাছে মুখ্য নয়। তাঁরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। অনেকেই মেয়েমানুষ। সহজে যা মুখে আসে সহজে যা মনে থাকে. সেই সামান্য পুঁজি নিয়ে তাঁদের কারবার। জীবনে হয় তো একটা কি দুটো ছড়া কেটেছেন। কবির লড়াইয়ের মতো ছড়ার লড়াইও হয়তো চলত। কথা কাটাকাটির মতো ছড়া কাটাকাটি। তার থেকে কিছু টিকে আছে। আর সব হারিয়ে গেছে।

সত্যি বলতে কী, ছড়ার রাজ্য আমাদের মতো লেখকদের রাজ্য নয়। সেটা তাদেরই রাজ্য যারা হাজার হাজার বছর ধরে ছড়া কেটে এসেছে। লেখাপড়ার ধার ধারেনি। যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় ছড়া কাটে। খুব একটা ভেবেচিন্তে নয়। ক্ষণিক আবেগে বা উত্তেজনায় বা হাস্যকৌতুকে। সেই ক্ষণটাই যদি সর্বকালের জন্যে বা দীর্ঘকালের জন্যে অক্ষয় হয়ে থাকে তবে সেটা তাঁদের গণনার বাইরে। অমর যে কেবল মহাকবিরাই হন তা নয়, নামহীন গোত্রহীন ছড়াকাররাও হন। ইংরেজী কবিতার সংকলনে শেক্সপীয়ার, মিলটনের প্রাশাপাশি 'অজ্ঞাতনামা'দেরও স্থান আছে। ছড়া যে কত বিচিত্র হতে পারে তা ইংরেজী কাব্যসংকলন পড়লে জানা যায়। দুঃখের বিষয় 'খুকুমণির ছড়া'র পর তেমন কোনো সংগ্রহপুস্তক আর হয়নি বা হয়ে থাকলে আমার নজরে পড়েনি। তবে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন গ্রন্থে ছিটানো ছড়ানো বিচিত্র ছড়া আমি লক্ষ করেছি। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের প্রকাশিত ছড়ার সংগ্রহ তেমন শ্রমসাধ্য নয়, কিন্তু গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোকমুখে উচ্চারিত বিভিন্ন প্রকার ছড়া বা ছড়া জাতীয় রচনার সংগ্রহ জীবনব্যাপী পরিশ্রমসাপেক্ষ। প্রদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর একজনের নয়, একাধিক জনের। টেপ রেকর্ডারে সুরটা ধরে রাখা উচিত।

আমার কাছে যাঁরা ছড়া সম্পর্কীয় উপদেশ চাইতে আসেন আমি তাঁদের বলি 'খুকুমণির ছড়া'র রসে অবগাহন করতে। শব্দ জুড়ে জুড়ে ছড়া লেখা শিক্ষিত জনের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু শিক্ষাভিমান ত্যাগ করে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত জনের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেওয়া সাধনা-সাপেক্ষ কাজ। চতুর যিনি তিনি স্বেচ্ছায় চাতুরী পরিহার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য বিসর্জন করেছেন এমন দৃষ্টান্তই বরং বেশী। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে বিষয় যেন বিষ। বিভূতির দ্বারা তাঁরা বিভ্রান্ত হতে চান না। লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের রচনা যোগ করতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরও সেইরকম একটা সাধনা বরণ করতে হবে। সাধনা অনুসারে সিদ্ধি। ছড়া একপ্রকার আর্টলেস আর্ট। শিশুরা সহজে পারে, বয়স্করা সহজে পারে না। মেয়েরা সহজে পারে, পুরুষেরা সহজে পারে না। অশিক্ষিতরা সহজে পারে, শিক্ষিতরা

সহজে পারে না। মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।

পরিশেষে স্বীকার করি, আমার সব ছড়া, ছড়া হয়নি। 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' তেমনি, যে লেখে বিস্তর ছড়া সে লেখে বিস্তর পদ্য। আমার নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। তাছাড়া পদ্য যেমন নিখুঁত হয়, ছড়া তেমন নিখুঁত হয় না। লোকমুখে নিখুঁত হয়নি ও হবে না। কোনো কোনো ছড়ায় আমি ইচ্ছা করে কিছু খুঁত রেখে দিয়েছি। অনেকসময় এক্সপেরিমেণ্টও করেছি। কতকটা বিলিতীর অনুসরণে। ছড়ার দেশ কাল নেই। দেশী বিলিতী অবান্তর।

১৯৮৪ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ছড়া বিষয়ে
ধীমান দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার

অন্নদাশঙ্কর : কী ভাগ্যি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন রেলপথে নিভৃত ভ্রমণ ঘটে। তিনি বলেন, 'আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখ না কেন?' আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, 'ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না।' তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। সেই একটি উপহারই আমি কবিগুরুর কাছ থেকে পেয়েছি। তাতে তাঁর নিজের অনেকগুলি ছড়া ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে আমিও সেরকম কিছু লিখি? তেমন ক্ষমতা বা অভিলাষ আমার ছিল না। যুদ্ধের মাঝখানে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্যে বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজী ক্লেরিহিউ, লিমেরিক, রূথলেস্ রাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না। বুদ্ধদেব বাবুর তাগিদে হঠাৎ কিছু ছড়া তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু সেসব ছড়া ছোটদের জন্যে লেখা নয়। বড়োদের জন্যে লেখা।

ধীমান : কিন্তু এর আগেই, ১৯২৭/১৯২৯ বা ১৯৩৩ সনে ছোটদের জন্য আপনি লিখেছেন 'লন্ডন ফগ্', 'লন্ডনের শীত', 'লন্ডনের গ্রীষ্ম', 'উই পোকাদের গান' এইসব ছড়া ও সেগুলো 'মৌচাক'এর মতো কাগজে বেরিয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর : এগুলো যখন লিখেছি তখনও ছড়া লিখব এমন অভিলাষ আমার হয়নি। অনেকটা পদ্যের মতো করেই এগুলো লেখা। ছড়া লিখব—পরিষ্কারভাবে এই সিদ্ধান্ত নিই পরে। তখন দেখা যায়; আমার কতক ছড়া ছোটদের জন্যে, কতক বড়োদের জন্যে, কতক ছোট বড়ো নির্বিশেষে সকলের জন্যে। ছোটদের জন্যে লেখার খেয়াল যখন জাগে তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' আমার আদর্শ হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া নয়। সুকুমার রায়ের ছড়াও নয়। যদিও আমি এঁদের ছড়ার ভক্ত।

ধীমান : ছড়া লেখার বহুল প্রচলন ও সচেতন হয়ে ছড়া লেখার অভ্যাস সাম্প্রতিক, বিগত এই কয়েক দশকের। আর এই সময়ে স্বাভাবিক ও সার্থক ছড়াকাররা প্রায়ই অন্য কোনো বিষয়ে সচেতন লেখক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, পরিশীলিত মনের অধিকারী। তো ছড়া লিখবেন—এই সিদ্ধান্তের পিছনে আপনার কোন্ সচেতন চিন্তা কাজ করেছিল?

অন্নদাশঙ্কর : একটা লক্ষ্য ছিল আমার। জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কতকিছু নিচ্ছি, কতকিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দেব কী? যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আরামে বাঁচিয়ে

রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী উপায়ে? আমি তো চাষী বা কারিগর বা মজুর নই। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেইজন্য গান্ধীজী বলেছেন সুতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে আমার মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছি, ছেড়ে দিয়েছি। পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ইত্যাদির মতো এটাও এক প্রকার ঋণ। কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। পারবও না। কোনো মতেই সেসব রচনা সহজবোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তা হলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? 'না' 'না' করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি।

ধীমান : অর্থাৎ সকলের উপযুক্ত করে কিছু লেখার জন্য একপ্রকার জনসাহিত্যের মতো আপনি ছড়াকে নিয়েছিলেন। এমন লেখা যা আত্মসচেতন না হয়ে পড়ে। যা পড়ারও দরকার নেই। শুনলেই সবাই বুঝতে পারে।

অন্নদাশঙ্কর : আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের। মুখে মুখে কাটা হতো, কানে শুনে মনে রাখা হতো। কাগজ কলম নিয়ে মাথা খাটিয়ে বানানো হতো না। ঠাকুমা দিদিমা মাসীপিসীর বা চাষাভূষার অশিক্ষিত মুখের ছড়া এক জিনিস আর চালাক চতুর সেয়ানা লেখকের পাকা হাতের ছড়া আর এক জিনিস। আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করতে চাই। তাই অচেনা অজানা ছড়াকারদেরই গুরুবরণ করি। ছল চাতুরি সযত্নে পরিহার করি। কলেজে পড়াশুনো করে, বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সরকারি চাকরি করতে করতে আমার মনে পাক ধরেছিল। আমার উপন্যাস প্রবন্ধ বা গল্প পড়তে গেলেই সেটা টের পাওয়া যেত। সেই আমি সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যখন ছড়া লিখতে বসে পড়ি তখন আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমার অন্য এক স্বরূপ। আমি মনে করি ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হাল্কা চালের পদ্য। গল্প উপন্যাস বানিয়ে বানিয়ে লেখা যায়, ছড়া বানাতে গেলে ছড়ার মতো শোনায় না। পদ্যের মতো শোনায়। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে, নয়তো নয়।

ধীমান : আপনার বহু ছড়াই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং আপনার ছোটদের জন্য লেখা ছড়াও বহু বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত পড়েন ও পড়ে মনে রাখবেন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে আপনার ছড়া কালজয়ী ও সার্বজনীন হয়েছে বলতেই হবে।

অন্নদাশঙ্কর : ছড়ার জন্য আমি অসংখ্য ফরমাস পাই। কিন্তু আমার নিয়ম হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত না হলে ছড়া না লেখা। ম্যানুফ্যাকচার না করা। কিন্তু কী করি, কেউ চাইলে 'না' বলতে পারিনে। সময় চেয়ে নিই। সবুরে মেওয়া ফলে। ছড়ার প্রেরণা আসে। ছড়া কত রকমের হয়। ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় তার অশেষ বৈচিত্র্য। বাংলায় এত রকমের

বৈচিত্র্য নেই। চেষ্টা করেছি কিছু বৈচিত্র্য যোগ করতে। কিন্তু জোর করে নয়। কেননা ছড়া লেখা একটা ইন্ডাস্ট্রি নয়। ছড়া লেখা একটা আর্ট। সেই শিল্পের সাধনা করে আসছি বহুদিন ধরে। আমার ছড়া কালজয়ী হয়েছে কিনা সে কথা আমি বলতে পারিনে। যাদের জন্যে লেখা তারা বিচার করবে।

ধীমান : এই প্রসঙ্গে এবার আমরা ছড়ার আঙ্গিকের কথায় আসবো।

অন্নদাশঙ্কর : বলেছি, আমার কাছে আদর্শ ছড়া ছিল, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো', 'হাট্টিমা টিম টিম' এইসব। খাঁটি লোকসংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমিক যা সঞ্চারিত হয়। একদিকে এই আর একদিকে হিউমারাস বা ননসেন্স কিছু। এই সব লোকছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক্ উইস্‌ডম ধরা থাকে। এ ছাড়া নানান্ সম্প্রদায়ের ছড়ায় নানা এথ্‌নিক ব্যাপারও থাকে। আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্য দিয়ে ওই সাধারণের জন্য বলতে।

এমনিতে কবিতার মতো ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আরটিফিসিয়ালিটির স্থান নেই। ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আন্‌ইভেন। বাক্‌পটুতা, কারিকুরি নয়। কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমনকি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু। আমি ওতেই লিখেছি মূলত। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করেছি, কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল দু সিলেবল হবেই, তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না। এসব অনেকে এখন মানেন না, এক সিলেবল মিল দিয়ে ছেড়ে দেন, ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের মিল, যতসব ফাঁকিবাজি। ইংরেজি ছড়ায় দেখেছি, শব্দ কখনো কখনো পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে দেয়। বাংলা ছড়াতেও এটা এখন আসছে।

ছন্দ ও মিল তো থাকবেই, এছাড়াও ছড়ার থাকবে ইমেজ ও ভাব। ছড়ার ইমেজ মিল রেখে আসে না, পারম্পর্য কম। হাট্টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাড়া দুটো শিং—শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়া হলো। কমলাপুলির টিয়েটা/সূয্যিমামার বিয়েটা—ইমেজ আসছে হঠাৎ হঠাৎ। ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বহু পুরাতনের স্পিরিট। আর এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা সরস হবে তা কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে। ধাঁধা, প্রবচন, লোকগীতি-গাথা সবই তো আর সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না, আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ছড়া যদি জনসাধারণ নেয়—শুধু আমি বা আমরা ছড়া লিখবো তা আমি কোনোদিনই চাই না, সবাই লিখুক, অনেকে লিখুক, তার মধ্যে কিছু ছড়া বেঁচে থাকবে—তাহলেই ছড়ার, ছড়ার ফর্মের সারভাইভ্যাল

সম্ভব।

ধীমান : আচ্ছা, ছড়ার বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বলা যায় : ছড়া কখনো কবিতার মতো—ব্রত ভাসাও জলে, কন্যা/ব্রত ভাসাও জলে;/তোমার মুখ আগুন, কন্যা/পাড়ার লোকে বলে। কখনো গানের মতো—লিয়ানা গো লিয়ানা/সোনার মেয়ে তুই/কোন্ পাহাড়ে তুলতে গেলি/গন্ধভরা জুঁই?। কখনো শ্লোকের মতো—সুবচনী কুচবরণী ফুল ছড়ানো গা/মাটির মায়া জলে ভাসে আগুনে ফেলে পা। কখনো ধাঁধার মতো—বকুল বকুল বকুল/বৃন্দাবন গোকুল/একে চন্দ্র তিনে নেত্র/কাশী আর কুরুক্ষেত্র। ইত্যাদি। একে কি ছড়ার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বলা যায়?

অন্নদাশঙ্কর : না। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বলতে কত বিচিত্র আঙ্গিকে ছড়া লেখা যায় তা। যেমন লিমেরিক। যেমন ক্লেরিহিউ। যেমন রূথলেস্ রাইম। যেমন ব্যালাড। যেমন ছড়া নাটিকা ইত্যাদি। তুমি যে উদাহরণগুলো দিলে সেগুলোতে মুডের বৈচিত্র্য, অ্যাপ্রোচের বৈচিত্র্য। সার্বিক আঙ্গিকের বৈচিত্র্য নয়। বিশেষ কোনো আঙ্গিকের ভেতর সেই আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা আঙ্গিকের অন্তর্বর্তী বৈচিত্র্য। সার্বিক আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এ থেকে আলাদা। যেমন ব্যালাড ঠিক ছড়া নয়, কিন্তু জনসাহিত্যের সামিল।

ধীমান : আমি মনে করি, কবি/লেখকরা যে কথা অন্যভাবে বলছেন না বা বলতে পারছেন না, ছড়া তাঁদের দিয়ে ছড়ায় তা বলিয়ে নেয়। অত্যন্ত রাশভারী মানুষটিও যেমন পার্টি পিকনিক বা অন্য কোনো প্রমোদ অনুষ্ঠানে আচার আচরণে ও হাবভাবে স্বভাববিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু করে থাকেন যা অন্য সময় করলে ভীষণ খেলো ও ছেলেমানুষি মনে হতো, খুব গুরুগম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিও যেমন ঘরে ফিরে এসে মনের মানুষের কাছে কত খোলামেলা হয়ে যান আর অন্তরঙ্গ, ছুটির দিনে দৈনিক রুটিনে যেমন স্বেচ্ছায় এমন অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা অন্যদিনে ঘটলে হয়ে উঠতো স্বেচ্ছাচার বা বিশৃঙ্খলা, ছড়াও আসলে তেমনি ওই ছুটির দিনের জিনিস, ভিতর ঘরের জিনিস, ছড়ার নাম প্রমোদন। এ-বিষয়ে আপনার মত জানতে ইচ্ছে করে।

অন্নদাশঙ্কর : ছোটদের জন্যে লেখা আর বড়োদের জন্যে লেখা একই কলমেই লেখা। যে লেখে সে একই মানুষ। তার মানসে বা হৃদয়ে দুটো পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই। তবু সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে একই লেখকের দুই চরিত্রের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমার নিজের কথায় বলতে পারি, আমার মধ্যে একজন ছেলেমানুষও ছিল। যে চাইত ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে। তাই একই সময়ে লেখা হয় 'বিচিত্রা'র জন্যে 'পথে প্রবাসে' আর 'মৌচাক'এর জন্যে 'ইউরোপের চিঠি', কিস্তিতে কিস্তিতে। আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু আমাকে দেখে অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এক মহাশিশু। মহাশিশু ও মহাশিল্পী। ছড়া লেখার জন্যে তেমনি ছেলেমানুষ হতে হয়।

আমার পণ—ইংরেজীতে কত সুন্দর সুন্দর ব্যালাড আছে, বাংলায় নেই, বাংলায় যাকে

ব্যালাড বলে চালানো হচ্ছে তা অন্য জিনিস, অনেক দিন থেকে আমি চেষ্টা করছি ব্যালাড লিখতে কিন্তু ব্যালাড রচনায় আমার প্রগতি বেশি দূর নয়—আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ব্যালাড আমি একদিন লিখবই। যদি ছেলেমানুষ হতে ভুলে না যাই।

ধীমান : আমার 'অনন্ত চতুর্দশী' উপন্যাসে কয়েকটি ছড়া ছিল। যেগুলো সম্পর্কে একটা চিঠিতে আপনি আমাকে লিখেছিলেন, 'আর বইয়ে যে ছড়াগুলো সেগুলো যেন আপনার লেখা নয়, যেন গ্রামবাংলায় যুগ যুগান্ত ধরে সেগুলো প্রচলিত ছিল এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ।' কিন্তু আধুনিককালে সত্যিসত্যি কারও পক্ষে কি আর গ্রাম্য বা লোকছড়া লেখা সম্ভব?

অন্নদাশঙ্কর : এটা তো আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্টিভ সেন্সটা আর নেই। আজ প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব ঢং এসেছে। মিল ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া। সকলে মিলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তবেই ছড়া বেঁচে থাকবে। নয়তো নয়। তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়, বেশীর ভাগই পদ্য।

ধীমান : আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একশো ছড়া' বইয়ের ভূমিকায় আপনি বলেছিলেন যে আপনার ছড়াও কখনো কখনো সেলফ্‌কনশাস ও সফিস্‌টিকেটেড হয়ে পড়েছে।

অন্নদাশঙ্কর : হ্যাঁ। আমারও তো ভয় হয় যে কখনো কখনো আমি ছড়া লিখতে গিয়ে পদ্য লিখেছি। পথভ্রষ্ট হয়েছি। না, আমার ছড়া সব সময় ছড়া হয়নি। বোধ হয় অত বেশি না লিখলেই হতো। আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু সে-কথা যখন আমি নিজেই বিশ্বাস করি না বা ভুলে যাই, তখনই আমার ছড়া কৃত্রিম হয়ে পড়ে। পদ্যের মতো শোনায়। তবে ছড়া লিখতে গিয়ে আমার আর একটা লাভ হয়েছিল। ছড়া লিখতে গিয়ে যে কারিগরী দক্ষতা আয়ত্তে এল তা আমার কবিতারও কাজে আসে। আমার হাত তৈরি হয়, ফলে কবিতা লিখতে গিয়ে ভাব নিয়ে বিষয় নিয়ে আমাকে ভাবতে হয় কিন্তু ভাষা নিয়ে ছন্দ নিয়ে আর ভাবতে হয় না। ছড়ার ক্ষেত্রে আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকুর দায়িত্ব নিয়েছি। জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই, আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কালে কালে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিক হয় তা হলেই আমি ধন্য। একদিকে এই জনসাধারণ, অন্য দিকে বাংলা ছড়ার নিরবধিকাল, দুই দিকে দুই মালিক আমাকে কান ধরে ছড়ার ঘরে ওঠবস করিয়েছে।

ধীমান : গানের সাথে ছড়ার সম্পর্ক নিবিড়। 'ছড়া গান' শব্দের ব্যবহারে তা বোঝা যায়। ছড়ার গীতিরূপ নিয়ে সম্প্রতি রেকর্ড বা ক্যাসেটও বেরোচ্ছে। আপনার ছড়া নিয়ে আমার গ্রন্থনায় প্রকাশিত হয়েছে ক্যাসেট—'রাঙা মাথায় চিরুনি'। অন্যেরাও আপনার বা

সুকুমার রায়ের ছড়ার গীতিরূপ দিয়েছেন। এই প্রকার গীতিরূপ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য, এতে ছড়ার জনপ্রিয়তা বাড়বে কি?

অন্নদাশঙ্কর : বছর পঞ্চাশ আগে কবিতা লিখতে লিখতে আমার মনে হয়েছিল কবিতার ভাষা ঠিক না হলে কবিতা ঠিক হবে না। ভাষা নিয়ে দশ বছর খাটতে হবে আমাদের কবিদের। দেখলুম, বাংলা গদ্যের ভাষার বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পদ্যের ভাষার তেমন কিছু হয়নি। কবিতাকে পদ্য রেখে, পদ্যছন্দের শাসন মেনে তার ভাষা বদলে দেওয়া যায় কিনা এই হলো তখনকার দিনে আমার প্রথম জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিজ্ঞাসা এল। ছন্দ যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটু সুর এলে মন্দ হয় না। সুর কিন্তু গানের সুর নয়। গানের সুর সঙ্গীতের রাজ্যের ব্যাপার। সঙ্গীত আমার পক্ষে পররাজ্য। আমি চাই কবিতার সুর, কথার সুর। গায়কের সাহায্য না নিলেও যে সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। লক্ষ্য করলাম অমিয় চক্রবর্তী এ লাইনে কিছু কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ছন্দ পদ্যছন্দ নয়, গদ্যছন্দ। নাচন নয়, হাঁটন। আর করেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ছন্দ গদ্যছন্দ নয়, পদ্যছন্দ। একটা প্রচ্ছন্ন সুর তাঁর কবিতায় গুনগুন করে।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই সমস্যাটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ছড়ায় মন দিতে চেয়েছিলেন। লেগে থাকলে সেই মার্গে সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি তো বাঁচলেন না। বড়ো রকম পরীক্ষা চালাবার মতো বয়সও তখন তাঁর নয়। আর তাঁর ছড়াও আমার কানে ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ায় লাইন ওভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়। তবে তার ভাষা ছন্দ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আর সুর। ছন্দে ছড়ানো শব্দচ্ছটা, সুরে ধরা ধ্বনিময় প্রাণ।

এখন গায়কের সাহায্য নিয়ে ছড়াকে গানের রূপ দিলে তার জনপ্রিয়তা বাড়বে মনে হয় না। হিতে বিপরীতও হতে পারে। 'তেলের শিশি' রেকর্ড হবার আগেও যেখানে গেছি সেখানেই শুনেছি। তবে ছড়ায় যাঁরা সুর দেবেন তাঁদের দেখতে হবে সুরের ভারে ছড়া যেন হারিয়ে না যায়। সুরে যেন জটিলতা বা বেশি কারিকুরি না থাকে। বাদ্যযন্ত্র যেন জগঝম্প না হয়ে পড়ে। সুরে বা আবহে এমন কিছু থাকবে না যাতে ছড়ার ভাব অর্থ বা ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়। ছড়ার গঠন যে কেমন ও রস যে কোন্‌খানে এটা তাঁদের বুঝতে হবে।

ধীমান : সমাপ্তিতে ছড়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন।

অন্নদাশঙ্কর : একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সচেতন কবি লেখকরা ছড়া লিখতেন না। যারা ছড়া বানাতো—মেয়েরা চাষীরা শিশুরা—তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সীরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হতো না। ছড়ার ঐতিহ্য বহুদিনকার, ছড়ার ভবিষ্যৎও নিরবধি।

ছোটদের ছড়া

রাঙা ধানের খই

লণ্ডন ফগ্	৩৭	৪৫	ঘ্যানঘ্যানানি
লণ্ডনের শীত	৩৮	৪৬	মৌতাত
লণ্ডনের গ্রীষ্ম	৩৯	৪৬	চন্দ্রমানিক ইন্দ্রমানিক
উই পোকাদের গান	৪০	৪৭	কাঁদুনি
লিমেরিক	৪১	৪৮	আর্তনাদ
ইরা তারা	৪১	৪৮	জিতুবাবুর জিৎ
নাগা খাঁ	৪২	৪৯	ঝুমঝুমি
রাক্ষস	৪২	৪৯	শিশুর প্রার্থনা
নামকরণ	৪৩	৪৯	খুকু ও খোকা
যুদ্ধের খবর	৪৩	৫০	টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল
ময়নার মা ময়নামতী	৪৪	৫১	দুই বেড়াল ও এক বাঁদর
হনুমানের গান	৪৪	৫৪	পিঠে ভাগের পর
মুখে মুখে জবাব	৪৫	৫৫	কলরব

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 515
তারিখ 15.6.2006
ফোন 2597317
…েন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

ডালিম গাছে মৌ

ছবি আঁকা	৬১	৭০	পড়ার ছড়া
ভেল্কি	৬১	৭১	বাদুড় ঝোলা
এই যে কুকুর	৬১	৭১	পার্সেল
কেউ জানে কি	৬২	৭২	পূরণ করো
পুতুল	৬২	৭২	পটল
ব্যাঙের ছড়া	৬২	৭২	সুকুমারী
কাতুকুতু	৬৩	৭২	যেখানে বাঘের ভয়
এই ঘড়িটা	৬৩	৭৫	পক্ষিরাজ
বগলানন্দ	৬৩	৭৬	তিন হাতী
পিঁপড়ে	৬৪	৭৮	কুত্তার কেরামতি
পার্বতীর ছড়া	৬৪	৭৮	কেমন কল
পার্বত্য মূষিক	৬৫	৭৮	বীণাদির দুঃখু
বেড়ালছানার হিমালয় ভ্রমণ	৬৬	৭৯	লিমেরিক
বমন বারণ মন্ত্র	৬৭	৭৯	বড়দি বড়দা
কুকুরপাগল	৬৭	৭৯	হাভাতে
ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী	৬৮	৮০	আদর কর বাঁদরকে
ঘোড়দৌড়	৬৯	৮০	বাতাসিয়া লুপ

আতা গাছে তোতা

হোঁদল	৮৩	৯৭	লতা কাহিনী
কলম কিনি কেন?	৮৩	৯৭	যুদ্ধযাত্রা
চিড়িয়াখানার খবর	৮৪	৯৮	হাঁউ মাঁউ খাঁউ
ঘোড়া	৮৫	৯৮	কালো
নাম করতে নেই	৮৫	৯৯	[redacted]
ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী	৮৬	১০০	চমৎকার ও চমৎকার
ভুট্টা বিলকুল খট্টা	৮৭	১০০	[redacted]
কক্কার	৮৮	১০০	হবুচন্দ্র রাজার
মহনা হাতীর কাহিনী	৮৯	১০১	মন কেমন করে
চন্দনা	৯০	১০১	কাঁকড়া
সন্ধি	৯১	১০২	মাঞ্জা
নাগরদোলা	৯২	১০২	ছাতা
বাঘের রাগ	৯৩	১০২	বেড়ালের স্বপ্ন
পায়রা	৯৩	১০৩	টিপু
হনুমান	৯৪	১০৪	কাটা কুটি খেলা
টেনিস	৯৪	১০৪	গুলফিকার
অলিম্পিক	৯৫	১০৫	বাঘের সঙ্গে দেখা
বৃষ্টিপাত	৯৫	১০৫	স্কাউট
ফলার	৯৬	১০৬	কলাভবন
নিশুত রাতের রোমাঞ্চ	৯৬	১০৬	জন্মদিন

হৈ রে বাবুই হৈ

লাল টুক টুক	১০৯	১১৩	বেঁজি ছিল ঘরমণি
জলসা	১০৯	১১৪	পিপীলিকার ভ্রমণকাহিনী
আদি যখন বড়ো হবে	১১০	১১৪	ধাঁধা
ধিক্ ধিক্ ধিকারী	১১০	১১৫	অবাক চা পান
ঝড়খালির বাঘ	১১০	১১৬	আধমণী কৈলাস
বাঘকে বাঁচাও	১১১	১১৬	হিংসুটে
বাঘবন্দী খেল	১১১	১১৭	নাও ভাসান
টোগো	১১১	১১৭	সাঁতার
সানী	১১২	১১৮	চুপ চাপ হাপ
বাহিনীর কাহিনী	১১২	১১৮	পিং পং
বিন্দি	১১৩	১১৯	তাসের আড্ডা
জবাব	১১৩	১১৯	হাসির বাহার

শতরঞ্জ	১১৯	১২১	দু' চক্ষের বিষ
ব্যাকরণ	১২০	১২১	চুকলি
ভাগ্য	১২০	১২১	জাপানেতে যাও যদি
নাই মামা ও কানা মামা	১২০	১২১	আলাদীন
কখনো না	১২০	১২২	আর একটি তারা
হুকুম	১২১	১২২	ইন্দ্রলুপ্ত

রাঙা মাথায় চিরুনি

কি[illegible]ঠবিড়ালীকা	১২৫	১৩৪	আহা কী রান্না
ছোট্ট ঘোড়সওয়ার	১২৬	১৩৪	পায়েস
বাঘের গন্ধ পাঁউ	১২৬	১৩৫	বিস্কুট
আমের দিনে আমভোজন	১২৭	১৩৫	হুড়ুম
আমার ঘরে আমি রাজা	১২৮	১৩৫	হরিণ
রাজার বিচার	১২৮	১৩৫	দাড়োয়ান
আগুন! আগুন!	১২৯	১৩৬	একহাতে বাজে না তালি
পিণ্ডারী না ঠগী	১৩০	১৩৬	খেলার মাঠে
সমুদ্রস্নান	১৩০	১৩৬	কুঁড়ের বাদশা
চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রা	১৩১	১৩৭	ঘোড়া পিটিয়ে গাধা
করিৎ কর্মা	১৩১	১৩৭	বর্গী এল ঘরে
কাকতালীয়	১৩২	১৩৭	ট্রেন প্লেন কপ্টার
মণ্ডূক	১৩২	১৩৮	করমর্দন
বেড়াল মাসী	১৩৩	১৩৮	ঢাকাই ছড়া
ভূতের ছড়া	১৩৩	১৪০	মামার বাড়ী যাওয়া
কান্না হাসি	১৩৩	১৪১	এক যে ছিল বাঁদর
ইঁদুরছানার কাণ্ড	১৩৪	১৪১	নেমন্তন্ন
মেয়ে কেমন শিখছেন	১৩৪	১৪২	ঢুলকিবাজি

বিন্নি ধানের খই

চাঁদমামার দেশে	১৪৫	১৪৭	কাঁকড়ার সঙ্গে হাতাহাতি
খৈরী	১৪৫	১৪৮	খেলা না যুদ্ধ
বীর হনুমান	১৪৬	১৪৯	খেলোয়াড়ি
এ্যালার্ম ঘড়ি	১৪৬	১৪৯	বিশ্বকাপ
শঙ্খচিল	১৪৭	১৫০	বর্ষার দিনে

রিক্শা	১৫০	১৬৪	লক্ষ্মীপ্যাঁচা
বিন্দি	১৫১	১৬৫	ডুবসাঁতার
বেগানা এক বেড়াল	১৫২	১৬৫	বন্যা
হাতী বনাম ব্যাঙ্	১৫২	১৬৫	খরা
ক্ষুদে পিঁপড়ে	১৫৩	১৬৬	মিষ্টি দাঁত
বাঘার ডাক	১৫৩	১৬৬	কাকের ডাক
বিয়ের ছড়া	১৫৩	১৬৬	পেয়ারা পেয়ারের ফল
উটের ছড়া	১৫৩	১৬৭	কিশোর বিজ্ঞানী
প্রিয় কুকুরের কাহিনী	১৫৪	১৬৭	বেড়াল বাঁচাও
শীতকাতুরে	১৫৫	১৬৮	বাসাবদল
কিস্সা ক্লে পিজন কা	১৫৬	১৬৮	ঘুঘুডাঙার পাঁচালি
দাদু এখন বন্দী	১৫৭	১৬৯	অঁইঠা কেলার কাহিনী
ঝড়িপোকা	১৫৭	১৬৯	আরসুলা
সোনার হরিণ	১৫৮	১৭০	পায়রা
কম বেশী	১৫৮	১৭০	মিষ্টান্নভুক
দুই ভাই	১৫৯	১৭০	কসরত
লালবরণ ঘুড়ি	১৫৯	১৭১	উকুন
রণ-পা	১৬০	১৭২	টাক
হ্যালির ধুমকেতু	১৬০	১৭২	খেলোয়াড়
কী আসে যায় নামে	১৬১	১৭২	তাক ডুমা ডুম ডুম
হিপ হিপ হুরে	১৬২	১৭৩	আপেল
সেরা এই ফলার	১৬২	১৭৩	বিশ্ব টেনিস
বরযাত্রী	১৬৩	১৭৪	মারাদোনা
কিস্সা বাঘসওয়ারকা	১৬৩	১৭৪	চন্দ্রযান
ব্যাঙের ডাক	১৬৪		

সাত ভাই চম্পা [প্রথম ভাগ]

খুকুর জন্যে ছড়া	১৭৭	১৮০	মুন্না
চিতাবাঘ	১৭৭	১৮১	কাকাতুয়া
হংসো মধ্যে বকো যথা	১৭৭	১৮১	এলসা
ভারতমাতার উক্তি	১৭৮	১৮২	বিপত্তি
দাদু ও নাতনি	১৭৮	১৮২	ফলার
রণজি ট্রোফি	১৭৯	১৮৩	পালাবদল
তিন পুরুষ	১৭৯	১৮৩	বার্সেলোনা!
অবাক কাণ্ড	১৮০	১৮৪	অলিম্পিক দৌড়

খেলার মাঠে ১৮৪
পাশাখেলার রাজা ১৮৫
কিস্‌সা বিশ্বকাপকা ১৮৫
ওটিয়া জরী ১৮৬
ধরি মাছ না ছুঁই পানি ১৮৭
সেসব জাহাজ ১৮৭
মিসিং ১৮৮
বাবু তো বাবু ১৮৮
টেকটেকাউঁ ১৮৯
সবুরে মেওয়া ফলে ১৯০
১৯১ কুচকাওয়াজ
১৯১ মারবেল খেলা
১৯২ ভোজবাজি
১৯৩ কপিলাস যাত্রা
১৯৩ বাঘ সিংহের লড়াই
১৯৪ কিশোর দিনের স্মৃতি
১৯৫ বাল্যকালে
১৯৬ এক যে ছিল ছাগল
১৯৮ সাধের বাইক

দোল দোল দুলুনি [প্রথম ভাগ]

অজানা ২০১
দেশভাগ ২০১
পাপুর ছবি ২০১
খেলার খবর ২০১
কিস্‌সা ইন্দুরকা ২০২
সামনে আকাল ২০২
জলপানি ২০৩
হাতির জন্য শোক ২০৩
সাগরযাত্রা ২০৪
বাঘের গলায় মালা ২০৪
অজানা এক যোদ্ধা ২০৫
সেকাল আর একাল ২০৬
সোনার ভারত ২০৭
কুচকাওয়াজ আবার ২০৭
মঙ্গলের বার্তা ২০৭
বর্ণপরিচয় ও কথামালা স্মরণে ২০৮
কম্বল আর টুপি ২০৮
২০৯ খেলার মাঠে হিরো
২১০ কাল্পনিক বাসযাত্রা
২১০ চানাচুর গরম
২১১ অবাক জলযান
২১২ চিড়িয়াখানার খবর
২১২ সৌরভ আমাদের গৌরব
২১২ লিয়েণ্ডার
২১২ প্যাঙ্গোলিন
২১৩ টিপসি
২১৩ খেলার ইতিহাস
২১৩ নদে এল বান
২১৪ যদি নিপততি বল্লী
২১৪ বৈশাখী বন্যা
২১৫ পদমর্যাদা
২১৫ গুরুশিষ্যসংবাদ
২১৬ লিচু ফল টক

রাঙা ঘোড়ার সওয়ার

তিনটি ছেলে ২১৯
বৃষ্টিপাত ২১৯
রাঙা ঘোড়ার সওয়ার ২১৯
২২০ পথ্য নির্দেশ
২২০ এবারকার বিশ্বকাপ
২২১ বাঘের গন্ধ পাঁউ

এক ঢিলে দুই লাখ পাখি	২২১	২২৮	তত্ত্ব আর সত্য
অণুমান	২২২	২২৮	আবার কাঁদুনি
বোমাবাজি	২২২	২২৮	মঙ্গলযাত্রা
বিশ্বকাপ ফাইনাল	২২৩	২২৯	গদাযুদ্ধ
পরম অমানবিক বোমা	২২৩	২২৯	নাচার
কে কী হবে	২২৩	২৩০	লড়াই
বাগমারীর ঝড়	২২৪	২৩০	গ্রাম্য কাজিয়া
সেলাম দু হাজার অব্দ	২২৪	২৩১	কৌতুক
টিকটিকির ছানা	২২৪	২৩১	বলদেও
একাদশ বাঙালি	২২৫	২৩২	লাইনার জাহাজ
নীরদ বিদায়	২২৫	২৩২	ডালাবালা
দাদুর বচন	২২৫	২৩৩	হিরোশিমা
বাঘের নাচন	২২৬	২৩৩	শান্তির পারাবত
ওরে বাপ	২২৬	২৩৪	লিমেরিক
হরবোলা	২২৭	২৩৪	ডাকসাইটে

বড়োদের ছড়া

উড়কি ধানের মুড়কি

ক্লেরিহিউ	২৩৯	২৪৪	পার্থক্য
রূথ্‌লেস রাইম্‌	২৩৯	২৪৪	প্রার্থনার উত্তর
এপিটাফ	২৩৯	২৪৫	দিলীপদাকে
স্বগত	২৪০	২৪৫	বিষ্ণুকে
পণ	২৪০	২৪৬	পিতাপুত্রসংবাদ
মহাজন	২৪১	২৪৭	সৈনিক
বিক্রমীরা	২৪১	২৪৮	উত্তম পুরুষ
গেরিলার গান	২৪১	২৪৮	শঙ্করন্‌ নম্বুদিরি
নিধিরামের নিবেদন	২৪২	২৪৯	হনুমান জয়ন্তী
পোড়ামাটি	২৪২	২৪৯	রামরাজ্যবাদীর বিলাপ
হিতোপদেশ	২৪২	২৪৯	হর্ষবাবুর হর্ষ
পারিবারিক	২৪৩	২৫০	সাত ভাই চম্পা
উভয়সঙ্কট	২৪৩	২৫১	শ্রীশ্রীবাহন বর্গ
কবিরা	২৪৩	২৫২	মরা হাতী লাখ টাকা

মোড়ল বিদায়	২৫২	২৭২	ধরাধরি
দুই রাণী	২৫৩	২৭৩	রাসপুটিন
গৃহযুদ্ধ	২৫৪	২৭৩	লেবু
মা নিষাদ	২৫৫	২৭৩	এবারকার গরম
লক্ষ্মণসেনের প্রত্যাবর্তন	২৫৫	২৭৪	জমিদার তর্পণ
অনুশোচনা	২৫৫	২৭৪	শুচিবাই
নজরুল	২৫৬	২৭৫	কৌতূহল
কাজী থেকে পাজি	২৫৬	২৭৫	বাজার
চোরের আত্মকথা	২৫৬	২৭৫	বীর বন্দনা
লিয়াকৎ আলির মস্কো যাত্রা	২৫৭	২৭৬	কিন্তু বাবু
গিন্নী বলেন	২৫৮	২৭৬	হট্টমালার দেশে
দিলীপদাকে আবার	২৫৮	২৭৭	শিলনোড়া সংবাদ
পাপ	২৫৮	২৭৭	নতুন রকম ক্লেরিহিউ
মণিদাকে	২৫৯	২৭৭	দাদা, সত্যি
নবদাকে	২৬০	২৭৮	কুমীর বিদায়
ভূষণ্ডী	২৬০	২৭৮	খনার বচন
কোনো নেতার মৃত্যুতে	২৬১	২৭৮	ভবানীপুরের গাথা
কালের হাওয়া	২৬১	২৭৯	দুরদৃষ্ট
আরে আরে	২৬২	২৮০	ধন্য নগর
কোথায় যাই?	২৬২	২৮০	পিতৃহত্যার দ্বিতীয় দফা
বঙ্গদর্শন	২৬৩	২৮০	উল্টো কেরল
ঘুঘু-চরানি ছড়া	২৬৩	২৮১	চাঁদের বুড়ি ছোঁওয়া
আড়ি	২৬৩	২৮১	শবরীর প্রতীক্ষা
ঘুঁটে গোবর সংবাদ	২৬৪	২৮১	দাদাতন্ত্র
আটান্নর হামলা	২৬৫	২৮২	ন্যাশনাল বেঙ্গল টাইগার
নাসিকের পরে	২৬৬	২৮২	সিঁদুরে মেঘ
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী	২৬৬	২৮২	ত্রিবেণী
বারো রাজপুত	২৬৭	২৮৩	ব্রহ্মপুত্র
ঢাকার কারবালা	২৬৭	২৮৩	বিদায়, মায়াবিনী
ত্রিকালদর্শী	২৬৭	২৮৩	জিজ্ঞাসা
পশ্চিম বঙ্গের প্র-জাতীয় সঙ্গীত	২৬৮	২৮৪	কালস্য কুটিলা গতি
ফতেপুর সিক্রী	২৬৮	২৮৪	ধন্যি কুকুর
পক্ষিপণ্ডিত	২৬৯	২৮৪	বল্ মা তারা
দোসরা কামাল	২৬৯	২৮৫	শব্দী
রাজা উজীর	২৭০	২৮৫	কোতরং
বানভাসি	২৭০	২৮৫	রকেট
পোষ্য	২৭১	২৮৬	রবীন্দ্র সরণি
ঠাকুরঘরে কে রে	২৭২	২৮৬	পরীক্ষা
চাল না পেলে	২৭২		

নিধুবাবুর টপ্পা	২৮৭	২৮৮	দেখা যাক
পরামর্শ	২৮৮	২৮৯	বানর বা নর নয়
নদীয়া	২৮৮	২৮৯	চাতকের গান
ভালেণ্টাইন	২৮৮	২৮৯	আমার কথাটি

শালি ধানের চিঁড়ে

চাঁদে নিয়ে যাও	২৯৩	৩০২	তবু রঙ্গে ভরা
খোয়াই	২৯৩	৩০২	চুনোপুঁটি
মৃত্যুঞ্জয়	২৯৩	৩০৩	দুই কাঙাল
বেনারসের সড়ক	২৯৩	৩০৩	মুখবন্ধ
বিড়ম্বনা	২৯৪	৩০৩	দাওয়াত
তিন সেন	২৯৪	৩০৩	স্বখাত সলিল
ধাঁধা	২৯৪	৩০৪	হে লেখক
উষ্ট্র রোগ	২৯৪	৩০৪	যেখানে যা নেই
একাত্তুরে মন্বন্তর	২৯৫	৩০৪	ক্ষীণমধ্যা
মূষিকপর্ব	২৯৫	৩০৫	কঙ্গ ভঙ্গ
গাছ-পাঁঠা	২৯৬	৩০৫	সেও
"ছি"	২৯৬	৩০৫	বর্ষশেষের প্রার্থনা
অরন্ধন	২৯৬	৩০৬	শূন্য হাঁড়িতে
মাথার খোরাক	২৯৬	৩০৬	ক্ষমতা
আকাল	২৯৬	৩০৬	দেখমারিজম
ট্যাঁড়স	২৯৭	৩০৭	শ্যামকুলিজম
শেষ সন্দেশ	২৯৭	৩০৭	শুক সারী সংবাদ
সরষে	২৯৭	৩০৭	ছন্দোগুরু প্রবোধচন্দ্র সেন
জিব্রলটার সং	২৯৭	৩০৮	সরস্বতী
ভাগের মা	২৯৮	৩০৮	রাসভশক্তি
বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ	২৯৮	৩০৮	শ্রেণীযুদ্ধ
কচ্ছপ	২৯৮	৩০৮	অসুবিধে
কিংকর্তব্যবিমূঢ়	২৯৮	৩০৯	তুষার-দম্পতির পরিণয় পঞ্চাশী
প্রভাসপত্তন	২৯৯	৩০৯	রূপকার
কলিযুগ পূর্ণ হলে	২৯৯	৩০৯	মূর্তিবদল
দাড়ি	৩০০	৩০৯	নামান্তর
সাহেব বিবি গোলাম	৩০০	৩১০	শরিক এল দেশে
চৌথী সাদী	৩০০	৩১০	আগডুম বাগডুম
মনোপলি	৩০১	৩১১	বাগবন্দী
আহমদবাদ	৩০২	৩১১	বঙ্গবন্ধু
নব পদাবলী	৩০২	৩১১	বাংলাদেশ

অঘ্রানের বান	৩১২	৩১৩	সোনার অক্ষরে লেখা
কাক মজলিস	৩১৩	৩১৪	ইন্দিরার সম্মান
মাণিকজোড়	৩১৩	৩১৪	স্বপ্নে দেখা দেবতাকে

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ

লোডশেডিং	৩১৭	৩৩১	বুলেট যার ব্যালট তার
বাইরে ও ভিতরে	৩১৭	৩৩১	শরণার্থী
হচ্ছে হবের দেশে	৩১৮	৩৩১	লঙ্কা তেঁতুল সংবাদ
বেড়াল খোঁজে নরম মাটি	৩১৮	৩৩২	এপার ওপার
দিল্লী চলো	৩১৯	৩৩২	ভীটো
জরুরি জারি গান	৩১৯	৩৩২	লেবাননের লড়াই
শতরঞ্জকে খিলাড়ি	৩২০	৩৩৩	মার্কো পোলোর প্রত্যাবর্তন
জেলখানা যায় যে-ই	৩২১	৩৩৩	লাল কুমড়ো চাল কুমড়ো
বাঘের পিঠে	৩২১	৩৩৪	ব্যাঙ্ বাদশা
বিসর্জন	৩২১	৩৩৪	নিউট্রন বোম
বাঘসওয়ার	৩২২	৩৩৪	লটারি
খিলাড়িকা খেল	৩২২	৩৩৪	নাক ডাকা
বারো রাজপুতের বারোমাস্যা	৩২৩	৩৩৫	মাছের বাজারে ব্যাঙ্
শুনহ ভোটার ভাই	৩২৩	৩৩৫	হাওড়া যাওয়া
যদুকুলনিপাত	৩২৪	৩৩৫	ঘটকালি
স্বয়ংবর	৩২৪	৩৩৬	সুবচন
দরখাস্ত	৩২৪	৩৩৬	কিসের অভাবে কী
স্বয়ংবরের পরে	৩২৪	৩৩৬	কলা
কেন এমন ভাগ্যি	৩২৫	৩৩৭	শ্যালক
ভোটের ফলাফল	৩২৬	৩৩৭	থোড় বড়ি খাড়া
ভঙ্গ রস	৩২৬	৩৩৭	লঙ্কা
গণতন্ত্রনিপাত	৩২৬	৩৩৭	তুষার-দম্পতির হীরক জয়ন্তী
দিল্লীকা লাড্ডু	৩২৭	৩৩৮	ছাতু
কেঁচো খোঁড়া	৩২৭	৩৩৮	উপমা
মৎস্যরক্ষা	৩২৭	৩৩৮	টোকাটুকি
জাদু	৩২৮	৩৩৯	নতুন ধাঁধা
সরাইঘাটের লড়াই	৩২৮	৩৩৯	ঘরোয়া
একুশে ফেব্রুয়ারী	৩২৮	৩৩৯	ক্যানিউট ও সমুদ্র
কুমীর	৩২৯	৩৪০	নিন্দাপ্রশংসা
নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব	৩২৯	৩৪০	পুরস্কার
বিদ্রোহী রণক্লান্ত	৩২৯	৩৪০	র‍্যাগিং
নোবেল প্রাইজ	৩৩০	৩৪০	অতঃপর
দেয়ালের লিখন	৩৩০	৩৪১	কলমবীর

সকল খেলার সেরা	৩৪১	৩৪৩	আজব শহর
সবজান্তা	৩৪১	৩৪৪	শ্যালক-ভগ্নীপতি সংবাদ
চিঠির জবাব	৩৪১	৩৪৪	কান পাতলা ও পেট পাতলা
খেলার মাঠ না কারবালা	৩৪২	৩৪৫	চোখ ওঠা
কলকাতার পাঁচালি	৩৪২	৩৪৫	অযোধ্যা কাণ্ড
ভগীরথের খেল	৩৪৩	৩৪৫	বর্ষশেষ
পাতাল রেল	৩৪৩	৩৪৬	বেনজীর

সাত ভাই চম্পা [দ্বিতীয় ভাগ]

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৪৯	৩৫৫	সবুজের অন্তর্ধান
ক্রেরিহিউ	৩৪৯	৩৫৫	তরুহীন মরু
উগাণ্ডা	৩৪৯	৩৫৬	বৃক্ষনিধন
দোভাগা	৩৪৯	৩৫৬	খোকনকে
এ নিষাদ	৩৫০	৩৫৬	বৃক্ষরোপণ
পুনরাবৃত্তি	৩৫০	৩৫৭	ড্রাগের নেশা সর্বনাশা
ঘোড়াবদল	৩৫০	৩৫৭	লেনিন মূর্তি
ছাতা রহস্য	৩৫১	৩৫৮	তৈলসঙ্কট
ছিন্নকেশী	৩৫১	৩৫৯	বহু অন্বেষণ
আধলা	৩৫১	৩৫৯	ঘূর্ণি ঝড়
আদার আকাল	৩৫২	৩৫৯	পদ্মা গঙ্গা দুই বোন
জল কামান	৩৫২	৩৬০	সেকালের স্মৃতি
ধৌত তুলসীপত্র	৩৫৩	৩৬০	কলকাতা তিন শ'
এঁরা আর ওঁরা	৩৫৩	৩৬১	ধন্য নগর
জাত ও জাতি	৩৫৩	৩৬১	রঙ্গময়ী কলকাতা
চালাকি	৩৫৪	৩৬২	কল্লোলিনী কলকাতা
ওষুধ	৩৫৪	৩৬২	কলকাতা
কাজ	৩৫৪	৩৬৩	পায়রা পুরাণ
ধন্বন্তরি	৩৫৫	৩৬৪	চাবুক

দোল দোল দুলুনি [দ্বিতীয় ভাগ]

অটোগ্রাফ	৩৬৭	৩৭০	ঘেন্না
জামাই আদর	৩৬৭	৩৭০	রামরাজ্য বাদ
সমুদ্রের জোয়ার	৩৬৮	৩৭০	অযোদ্ধা কাণ্ড
কলকাতার এ কী দশা	৩৬৮	৩৭১	হাটে হাঁড়ি
সবার উপর কপাল সত্য	৩৬৮	৩৭১	ঘোড়া বেচা কেনা
অবাক দুগ্ধপান	৩৬৯	৩৭১	সুষমার বিয়ে
পার্টিশন	৩৬৯	৩৭২	এপার ওপার
বিশ্বসুন্দরী	৩৭০		

অগ্রন্থিত ছড়া

ঐরাবত ৩৭৫

ছোটদের জন্য আরো বই পেতে

এখানে ক্লিক করবেন

রাঙা ধানের খৈ

অন্নদাশঙ্কর রায়

Book No.
Date

লণ্ডন ফগ্

ফগ্ কথাটার মানে
সত্যি ক'জন জানে
  ডিক্সেনারী দেখে
জানতে যদি চাও
লণ্ডনমে আও
  শেখো একবার ঠেকে।
ঘর থেকে আজ বেরিয়ে
দেখি বিষম দেরি এ
  ক্লাস্ কামাই'র জোগাড়।
পাঁচটি মিনিট ছুটে
টিউব্ ট্রেনে উঠে
  শেষ হলো কি ভোগার?
টিউব্ কাকে বলে?
মাটির নীচে চলে
  সুড়ং পথের রেল্।
আওয়াজটা তার অতি!
কিবা চঞ্চল গতি!
  কোথা পাঞ্জাব মেল!
মিনিট্ কুড়ি পরে
এস্ক্যালেটর চড়ে'—
  ("এস্ক্যালেটর কী?"
নাগরদোলার মতো
ঘুরছে অবিরত
  সিঁড়ির মতনটি।)
—স্টেশন ছেড়ে দেখি
ও মা, ব্যাপার এ কী!
  অমাবস্যার আঁধার!
যে দিক পানে চাই
পথ খুঁজে না পাই,
  ডান ধার কি বাঁ ধার।

ইলেকট্রিকের বাতি
তারার মতো ভাতি
  মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে!
বিশ্বগ্রাসী ধোঁয়ায়
কী যে চোখে ছোঁয়ায়
  চোখ ভরে যায় জলে।
সামলে চলি ধীরে
চরম দুর্গতি রে
  আচম্‌কা খাই ঠেলা।
অচিন্ লোকের সাথে
ফুট্‌পাথে ফুট্‌পাথে
  লুকোচুরির খেলা।
পা বাড়াতে ডর
পড়ুব কিসের পর
  চোখ থাক্‌তে কানা!
দাঁড়িয়ে থাকা দায়
পিছন থেকে হায়
  ধাক্কা বাজে নানা।
রাস্তা পারাপার
আজ হবে কি আর!
  ঐ ধারে মোর কাজ।
পথের মাঝে ভাই
কোন সাহসে যাই
  মোটর গাড়ীর মাঝ।
লোকের ভিড়ের ঠেলা
সে এক রকম খেলা,—
  মার খাই তো মারি।
কিন্তু গাড়ীর মার
ফিরিয়ে দেওয়া ভার
  প্রাণ যাবে যে ছাড়ি।

কোনো রকম করে
একটু যদি সরে
    আকাশ জোড়া ফগ্
একটু হলে ফরসা
বক্ষে জাগে ভরসা
    রক্ত সে টগ্‌বগ্।

তখন আপনা-বাঁচা
সকল ক'টি চাচা
    এ ধারে ওর পিছু
দল বেঁধে পথ কেটে
ক্রস্ করে যায় হেঁটে
    ভয় রাখে না কিছু।

১৯২৭

লণ্ডনের শীত

বিলেতবাসী আমরা সবাই
শীতে এবার হলেম জবাই—
    তোমরা কি এর খবর রাখো কোনো?
    বিষম ব্যাপার, শুন্‌তে চাও তো শোনো।
এবার হেথা যেমন বরফ
তেমনি কাশি সর্দি ও কফ
    ফ্লু (flu) জ্বরেতে সবাই ধরাশায়ী।—
    বাঁচ্‌বো কি না, ঠিক-ঠিকানা নাই।
জলের পাইপ্ গেছে জমে
জল আসে না কোনো ক্রমে—
    কুঁজো হাতে ঘুরছি দ্বারে দ্বারে
    সাফ্ হওয়াও ঘুচলো একেবারে!
পুকুর-নদী যেথায় যত
স্কেটিংরিঙ্কে (skating rink-এ) পরিণত,
    তার উপরে কেউ বা খেলা করে—
    বরফ ফেটে কেউ বা ডুবে মরে!
ঘরের মাঝে এক ফোঁটা জল
সেও জমে হলো অচল—
    দুধ খেতে গে' কুল্পীতে দি' মুখ—
    কেমন দেখ বিলেত আসার সুখ।
দেশে বোধ হয় চলছে ফাগুন—
সূয্যিমামা জ্বাল্‌ছে আগুন—

পয়সা বাঁচাও, তোমরা বড় চতুর!
কয়লা কিনে আমরা হলেম ফতুর।
পাহাড়-প্রমাণ লেপের তলে
কাঁপতে থাকি ঘুমের ছলে—
মুটের মতো পোশাক বয়ে ফিরি।
বরফ ঝরে সকল দেহ ঘিরি'।
দাঁতে দাঁতে ঠক্-ঠকানি,
গলার ভিতর খক্‌খকানি
খুব বেঁচেছো লণ্ডনে না এসে—
মিথ্যে কেন কাহিল হতে কেশে।
আচ্ছা তবে আসি এখন—
সেলাম.পাঠক-পাঠিকাগণ,
আজ্‌কে লেখা রইলো এই তক
খক্... খক্... খক্... খক্...

বই নং 515
তারিখ 15.6.2006
ফোন

লণ্ডনের গ্রীষ্ম

কী লিখি মৌচাকের তরে?
কী লিখি মৌচাকের তরে,
আষাঢ় মাসে গ্রীষ্ম আসে
বসন্ত যায় বনবাসে
সূর্য হেসে ঘুমিয়ে পড়ে
আমার মুখের হাসির পরে।
সূর্যলোকের ঘুম পাড়ানী
নীল আকাশের ঘুম পাড়ানী
আজ দুপুরে বাজায় দূরে
কোন গীতিকা কেমন সুরে
চোখের পাতায় বাজে বাণী
কাজ ভুলানী খেল্ ভুলানী।
ট্রামের সাথে পাল্লা দিয়ে
বাস্ চলেছে ঝিম্ ঝিমিয়ে।

চল্‌তে যে চায় না, হেন
গতিক ওদের হলো কেন?
চাকায় চাকায় ঘুম জড়িয়ে
থম্‌কে ওরা রয় দাঁড়িয়ে।
আইস্‌ক্রীমের ঠেলা গাড়ি
ভিড় জমেছে কাছে তারি।
ক্রিকেট্ খেলা সারা বেলা
তেষ্টা পেলে বরফ গেলা
খেলায় জেতার চেষ্টা ভারি
লোক জমেছে সারি সারি।
বনের মাঝে পাতার ফাঁকে
হাজার পাখী বেজায় ডাকে
গাছের তলা থামাও চলা
ছায়ায় শুয়ে ছাড়ো গলা

ভ্যাঙাও ঐ কুকু-টাকে
ব্ল্যাক্‌বার্ডকে স্প্যারো-টাকে।
প্রজাপতি গোটা দু'চার
হাতের কাছে উড়ছে ক'বার।
ধর্‌তে চাও? জাল বিছাও
চট্‌ করে, ভাই, জাল গুটাও!
ধরলে? ধরে কর্‌বে কী আর
মুক্তি তারে দাও গো এবার।

ঘুমের ঘোর ঘনায় চোখে
এবার যাবো স্বপ্নলোকে।
ফুলের বাস চারিপাশ
যে ফুলেরা ফেলছে শ্বাস
তাদের শ্বাস নাসায় ঢোকে
এখন আমি স্বপ্নলোকে।

১৯২৯

উই পোকাদের গান

তোমরা শুধু খাদ্য জোগাও
আমরা শুধু খাই
আজকে যেটা রাখ্‌লে ঘরে
কালকে সেটা নাই।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
বুদ্ধি ঝেড়ে লিখ্‌লে পুঁথি
ভাব্‌লে সে অমর
আমরা তারে কাটবো বলে
বেঁধেছি কোমর।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
যত্ন করে কিনলে কাপড়
পর্‌লে না একদিন
আমরা তারে কেটে কুটে
করেছি ভিন্‌ ভিন্‌।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
আদ্যে যাহা বাঁশের ঝাড়
কিংবা পেঁজা তুলো
অন্তে তাই মোদের কৃপায়
শাদা রঙের ধুলো।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
মিউনিকের সেই ক্যামেরাটা
ভারি তোমার প্রিয়
মোদের ছবি তুললে না তো
দেখবে এখন কী ও।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
গিন্নী তোমার সাহেবজাদী
বাজান পিয়ানো
দেখ্‌বে খুলে সেথায় মোদের
রসের ভিয়ানও।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
আদ্যে যাহা লোহার পাত
অথবা মেহগ্নি
অন্তে তাই ভস্ম করে
মোদের জঠর অগ্নি।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
মিথ্যে তুমি মানুষ হয়ে
ভাব্‌ছ মহা শ্রেষ্ঠ
অবশেষে মান্‌তে হবে
আমরা তোমার জ্যেষ্ঠ।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!
দাদা বলে কবুল করে
'মৌচাকে' ছাপাও
তবেই মোরা বল্‌ব, ভায়া,
আহ্লাদে লাফাও।
নইলে হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা!

১৯৩৩

লিমেরিক

১

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে এক দিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—
ফানুষ ওড়ায় মানুষ ॥

২

এক যে ছিল অসুর
রাবণ তার শ্বশুর।
দু বেলা তার বাবার
সামান্য জলখাবার
তিরিশ হাজার পশু ॥

৩

একটি মেয়ে ছিল তার নাম মিনু
তার এক ভাই ছিল তার নাম চিনু।
আর তার পুতুল
তার নাম তুতুল।
গুনে দেখ—এক, দুই, তিনু ॥

১৯৩৭

বই নং..
তারিখ..
ফোন..

ইরা তারা

ইরা ইরা ইরানী
রাঙা মাথায় চিরুনি।
ইরা যাবে তেহারান
ওরা ভেবে হয়রান।
পথ গেল হারিয়ে
গাড়ী গেল ছাড়িয়ে
এলেতোড় কেলেতোড় মেলেতোড়
পৌঁছল বেলেতোড়।

তারা তারা তাতার
ঘুম আসে না তার।
তারা যাবে বোখারা
বোঝে নাকো বোকারা
পথ গেল হারিয়ে
গাড়ী গেল ছাড়িয়ে
এলেতোড় কেলেতোড় মেলেতোড়
পৌঁছল বেলেতোড়।

১৯৪২

নাগা খাঁ

আগরতলার
আগা খাঁ
সোঁদরবনের
বাঘা খাঁ।
এঁদের সঙ্গে
মারামারি
করতে যাবে
এই পাড়ারই
দেড় বছরের
নাগা খাঁ।

১৯৪২

রাক্ষস

খোকা বলছে খুকুকে

হাঁউ মাউ খাঁউ
মান্‌ষের গন্ধ পাঁউ।
এই বলে ছুটে এসেছিল
রাক্ষস গদা নিয়ে হাতে
গদাটা কী জানি কার হাড়
মাংসও লেগেছিল তাতে।
ওটা সেই রাক্ষস যার
কথা শুনে ঠাকুমার কাছে
তীর ধনু বানিয়েছিলুম
কোন দিন দেখা হয় পাছে।
বন্ বন্ বন্ বন্ বোঁ
মুণ্ডুটা পেড়ে এনে থো।
এই বলে ধনুকের তীর
তাক করে দিয়েছিলুম ছেড়ে
ছেড়ে দেওয়া বাজপাখী যেন
তীরখানা গিয়েছিল তেড়ে।
মুণ্ডুটা উড়ে গেল, তবু
ধড়টা সে ধেয়ে আসে রেগে
আমি যেই সরে আসি সেটা
পড়ে যায় আপনার বেগে।

খুকু বলছে খোকাকে

তার পরে বল না কী হলো
রাক্ষস বাঁচলো না মলো?

খোকার জবাব

রাক্ষস বাঁচল না, কিন্তু
রক্তের ফোঁটাগুলো বাঁচল
এক একটা রাক্ষস হয়ে
ধিন্ ধিন্ ধিন্ করে নাচল।

খুকুর জেরা

তার পরে তুমিও কি নাচলে
কী করে যে বাঁচলে!

এর উত্তরে খোকা

আমার ছিল যে এক মাদুলি
দাম যার আধলা কি আধুলি
কোনো মতে বাঁচা গেল তাইতে
নাচা গেল সকলের চাইতে ॥

১৯৪৩

নামকরণ

খাটবে না খুটবে না
পড়বে না শুনবে না
লিখবে না শিখবে না কিচ্ছু
—এ ছেলেটা বিচ্ছু।
কাঁদবেই কাটবেই
খুঁৎ খুঁৎ করবেই
কিছুতেই হবে নাকো তুষ্টু
—এ মেয়েটা দুষ্টু।
চকোলেট লেমনেড
সন্দেশ কাটলেট
সব কিছু চাই তার আজই
—এ ছেলেটা পাজী।
চুষছে তো চুষছেই
মুখে পুরে পুষছেই
চানাচুর চাটনি কি মিশ্রী
—এ মেয়েটা বিশ্রী।

খেতে দিলে ছড়ায়
ফেলে রাখে, পালায়
বোঝে নাকো বাপ মা'র দুখ্খু
—এ ছেলেটা মুখ্খু।
দেখে যদি গয়না
ধরে শুধু বায়না
বলে, "আমি এমনটি পাইনি"
—এ মেয়েটা ডাইনী।
বাপ যত কিনছে
ছেলে তত ছিঁড়ছে
জামা জুতো ধুতী আর চাদর
—এ ছেলেটা বাঁদর।
মিষ্টি মিষ্টি হাসে
চুপি চুপি কাছে আসে
নাকে মুখে দিয়ে যায় নস্যি
—এ মেয়েটা দস্যি।

১৯৪৩

যুদ্ধের খবর

এসব আমার চক্ষে দেখা
নয়কো এসব শোনাশুনি
অশ্ব চলে আড়াই কদম
গজ চলেছে কোনাকুনি।

নৌকা চলে সরল রেখায়
সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে
মানুষ চলে গুটি গুটি
হাঁটছে যেন একটি পায়ে।

কী ভয়ানক লড়াই সে যে
এসব আমার বড়াই নয়।
একেক চালে একেক জনের
জানটা বুঝি কাবার হয়।

১৯৪৩

ময়নার মা ময়নামতী

ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই?
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভূতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিনে বলে, শুতুম।
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
আনতে গেছে কী?

চোখগুলো তার ছানাবড়া
চৌকিদারের ঝি।
ভূতুম কিন্তু লোক ভালো
মা লক্ষ্মীর বাহন কিনা
লক্ষ টাকায় ঘর আলো।
গয়না দেবে শাড়ী দেবে
সাত মহলা বাড়ী দেবে
মস্ত মোটর গাড়ী দেবে
সোনা কাহন কাহন।
ভূতুম মলে ময়না হবে
মা লক্ষ্মীর বাহন।

১৯৪৪

হনুমানের গান

ওরে হনুমানের দল!
যাস্‌নে কেন লম্ফ দিয়ে যেখানে ইম্ফল
যা লড়াই করে খা
বলুক লোকে, সাবাস বটে মহাবীরের ছা।
আমার বাগান ধ্বংস করে তোদের কিম্ফল,
ওরে হনুমানের দল!
ওরে হনুমানের দল!
অনুমান তো হয় না তোদের আছে বাহুর বল।
যা, বড়াই করে খা
হল্লা শুনে হাসুক লোকে, হা হা হা হা হা!
লম্ফ দিতে জানিস্ শুধু লাঙ্গুল সম্বল।
ওরে হনুমানের দল!

১৯৪৪

মুখে মুখে জবাব

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান!
"হনুমান।" "হনুমান।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
দল বেঁধে ডাকাডাকি করে?
কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া বলে
রাত্তিরে হাঁকাহাঁকি করে।
শুনি তোদের খেয়াল?
"শেয়াল।" "শেয়াল।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
খেয়েদেয়ে মোটা হয় খালি?
বেড়া ভেঙে বাগানেতে ঢোকে
ধরে তাকে নিয়ে যায় মালী।
শুনি তোদের হাসি?
"খাসী।" "খাসী।"

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
ধোপাদের বোঝা বয়ে আনে?
থেকে থেকে বিষম চেঁচায়
যেন আর সয় নাকো প্রাণে।
শুনি তোদের কাঁদা?
"গাধা।" "গাধা।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জঙ্গলে ঘোরে আড়ে আড়ে?
হরিণকে পেলে ছাড়ে নাকো,
গোরুকেও বাগে পেলে মারে।
দেখি তোদের রাগ?
"বাঘ।" "বাঘ।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জলে থাকে, ডাঙাতেও ঘর?
ভয় পেলে হাত পা ও মাথা
টেনে দেয় খোলার ভিতর।
দেখি তোদের মচ্ছব?
"কচ্ছপ।" "কচ্ছপ।"

১৯৪৪

ঘ্যানঘ্যানানি

ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর
করছে কেটা বানর!
অমন-ধারা বায়না
ধরে কেবল হায়না!
অমন করে কাঁদা
জানে কেবল গাধা।

ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো
করছে যেটা ব্যাঙ্ ও।
গলা ছেড়ে চ্যাঁচা
লোকে বুঝুক প্যাঁচা।
নাকে বাজা বিগল
লোকে বলুক ঈগল।

১৯৪৬

মৌতাত

সণ্ডর্সন সাহেব ছিলেন মানুষ চমৎকার।
আবগারিতে কর্ম নিয়ে কী যে হলো তাঁর
বিন্ খরচায় হতেন তিনি সপ্ত সাগর পার!
সাহেবকে আর যায় না দেখা,
হন না ঘরের বার।
মেলামেশার মানুষ গেল,
বাবা তো দিগ্‌দার।
আমাদেরও ঘুঁচে গেল সাহেবী খাবার।
দীননাথ মোড়ল ছিল ভক্ত গোছের লোক।
সাহেবেরই পিয়ন হতে হঠাৎ গেল ঝোঁক।
বিন্ খরচায় ধোঁয়া টেনে বুঁজত দুটি চোখ।
মোটাসোটা লোকটা হলো
রোগা একটা জোঁক।
সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হবে তো তার হোক
আমরা কি হায় ভুলতে পারি
হরির লুটের শোক!

১৯৪৪

চন্দ্রমানিক ইন্দ্রমানিক

"না খেলিও দাবা রে
না খেলিও দাবা,"
মানা দিয়ে বলেছিলেন
চন্দ্রনাথের বাবা।
দাবা খেলায় মগ্ন ছিলেন
উদয়গড়ের রাজা
শত্রু এসে রাজ্যি নিল
রাজা পেলেন সাজা।
চন্দ্রমানিক বলে, "ভাই
ইন্দ্রমানিক রে,
বাবা যখন আপিস যাবে
খেলব খানিক রে।"

ইন্দ্রমানিক বলে, "দাদা
দোষ দিয়ো না শেষে।"
চন্দ্র বলে, "জানবে না কেউ
দেখবে না কেউ এসে।"
খেলা যখন উঠল জমে
ইন্দ্র মারে ঘোড়া,
চন্দ্র তার মন্ত্রীটাকে
করে দিল খোঁড়া।
মন্ত্রী-শোকে অন্ধ হয়ে
ইন্দ্র মারে চাঁটি
চন্দ্র তখন তুলে নিল
মস্ত এক লাঠি।

ইন্দ্র পালায়, চন্দ্র তাড়ায়,
পাড়ার লোক জোটে
"কী হয়েছে" বলে সবাই
দিগ্‌বিদিকে ছোটে।
পুলিশ এসে নিয়ে গেল
ভাই দু'টিকে থানায়,
কেবলরাম চাকর গিয়ে
বাপকে তাদের জানায়।
"না খেলিও দাবা রে
না খেলিও দাবা,"
থানার থেকে আনার সময়
বলেছিলেন বাবা।

১৯৪৪

কাঁদুনি

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী।
মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ হাতে ও হাতে
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে
একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন করে ঠেকাই!
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?
বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে, "পালাই"।
জাপানীরা ভাগ্‌ল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত।
মশা
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সে দিন হতো
ডানকার্কের দশা।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!

১৯৪৫

আর্তনাদ

কেলো রে কেলো রে
এলো রে এলো রে
　　আয় আয় আয়।
কে এলো রে
কী এলো রে
　　কী হয়েছে ভাই?

কেলো রে কেলো রে
খেলো রে খেলো রে
　　হায় হায় হায়।
কে খেলো রে
কী খেলো রে
খুলে বল্ ছাই।
পিঁপ্ড়েটা আমাকে
　　কামড়াতে চায়।

১৯৪৫

জিতুবাবুর জিৎ

মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি
　　মরছি ফেটে আহ্লাদে
　　ও মাসী তুই পাল্লা দে।
হিটলার তো চিৎ হয়েছে
　　মুসোলিনি পটাং
জাপু এখন বর্মা ছেড়ে সটাং।
　　আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
　　সিঙ্গি ভালুক মিতে।
　　লড়াই যাবে থেমে
চীনে বাদাম সস্তা হবে ক্রেমে।
চীনে বাদাম! দো পয়সা!
চীনে বাদাম! এক পয়সা!
চীনে বাদাম! আধ পয়সা!
ও মাসী দে
　　পয়সা দে,
　　আধলা দে।
মরছি ফেটে আহ্লাদে।
আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
ঈগলপাখী মিতে।
জারমানকে হার মানিয়ে
আমরা গেছি জিতে।
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।

১৯৪৫

ঝুমঝুমি

দিদির মতন লক্ষ্মী মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
মিষ্টি লাগে দুষ্টু মেয়ের
দুষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি মেয়ের
মিষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।

দেখন হাসি, হেসে আকুল
হও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
কাঁদো যখন, কী বেদনা
সও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দিদির মতন শান্ত মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।

১৯৪৬

শিশুর প্রার্থনা

জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা
ভয় লাগে যে সারা বেলা
কেমন করে করব খেলা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।
ভয় ভেঙে দাও সকল লোকের
সকল রোগের সকল শোকের
সকল রকম ভয়ানকের
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

আমার খেলাঘর এ ধরা
আমার আপন জনে ভরা
পরকে চাই আপন করা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।
খেলব আমি আপন মনে
সারা দিবস অকারণে
তুমি থেকে সঙ্গোপনে
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

১৯৪৬

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

১৯৪৭

টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল

এক ছিল টুনটুনি দেখতে খাসা
দুষ্টু বেড়াল তার ভাঙ্‌ল বাসা।
বাসা ছিল বাগানে বেগুন গাছে
টুনটুনি চলল রাজার কাছে।
বলল, রাজা, তুমি খাচ্ছ খাজা,—
দুষ্টু বেড়ালটাকে কে দেবে সাজা?
রাজা শুনে হাঁকল বিল্লী লে আও।
লোক লস্কর হলো অমনি উধাও।
রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল ভাগে,
বেগুন গাছের পানে কামান দাগে।
বেড়াল তা দেখে দেয় চার পায় লাফ
দেবদারু গাছে উঠে করে দুপদাপ।
ডায়নামাইট এলো গাছ ওড়াতে—
সাবধানে রাখা হলো তার গোড়াতে।
কোটাল আগুন দিতে আঙুল বাড়ায়,
বেড়াল দেখ্‌ল আর নেই যে উপায়।
পথ দিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ার গাড়ী—
ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উপরে তারি।
বাপ বলে গাড়োয়ান চাবুক চালায়
ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো দৌড়ে পালায়।
লোক লস্কর কেউ নাগাল না পায়
চোখে মুখে ধুলো খেয়ে থমকে দাঁড়ায়।
শহরের বাইরে বাগানবাড়ী
সেইখানে থামল ঘোড়ার গাড়ী।
গাড়ী থেকে নামলো দুষ্টু পুষি
প্রাণে বেঁচে আছে বলে বেজায় খুশি।
মিঠে সুরে ডাকল মিআঁও মিআঁও
খোকা খুকু কে আছো, আশ্রয় দাও।
খুকু ছিল, ছুটে এলো, কোলেতে নিল,
পরম আদর করে খাবার দিল।
দুষ্টু বেড়াল হলো মিষ্টি বেড়াল
ভাঙে না পাখীর বাসা খুকুর দুলাল।
হাত তুলে খেলা করে খুকুর সাথে।
দুধ্‌ আর ভাতু খায় খুকুর পাতে।
ওদিকে তো রাগ করে বসেছে রাজা,
খায় না মোহন ভোগ, খায় না খাজা।
যাকে দেখে তাকে বলে, বিল্লী কাঁহা?
কে দেয় জবাব? কেউ জানে না, আহা!
চাকরি থাকে না দেখে চলল উজির
রাখল না কিছু বাকী খোঁজা ও খুঁজির।

রাস্তায় পড়েছিল বেড়াল-ছানা
কালো আর কুৎসিত খোঁড়া ও কানা।
উজির কুড়িয়ে নিল বাঁ হাত দিয়ে
ছুটল রাজার কাছে তড়বড়িয়ে।
পাওয়া গেছে, ফুকারে উজির বুড়ো।
পাওয়া গেছে, গর্জে রাজার খুড়ো।
দুষ্টু বেড়ালটার কী হয় সাজা—
দেখতে সবাই আসে। বলেন রাজা,
আধমরা জন্তুর হয় না বিচার।
মোটাসোটা করো একে মাস দুই চার।
তার পরে সাজা দেবো, আজ দেবো না।
সাজা হবে নিশ্চয়, কিছু ভেব না।
লোকজন ফিরে গেল নিরাশা ভরে,
বেড়াল চালান হলো রান্না ঘরে।
কোফ্‌তা কালিয়া আর কোর্মা কবাব
খায় আর মোটা হয় যেন সে নবাব।
ক্ষীর সর নবনী রাবড়ী পায়েস
খায় আর শুয়ে শুয়ে করে সে আয়েস।
মাছ ভাজা, ডালনা, চড়চড়ি, ঝোল
খায় আর ফুলে ফুলে হয় যেন ঢোল।
পাঁচটা জোয়ান মাস পাঁচেক পরে
বেড়ালকে নিয়ে যায় সাজার তরে।
লোকজন জমেছে দেখতে সাজা
সিংহাসনের পরে বসেছে রাজা।
এমন সময় এলো পাখী টুনটুনি
বলল, রাজা, তুমি হবে কি খুনী?
এ বেড়াল সে বেড়াল মোটেই নয়—
কার দোষে কার আজ শাস্তি হয়?
লোকজন বলে ওঠে, তোর কী তাতে?
সাজা আজ হবেই রাজার হাতে।
এই সেই বিল্লী, উজিরটা কয়,
এ টুনটুনি সেই টুনটুনি নয়।
রাজা দেখলেন এ তো মস্ত ফ্যাসাদ—
শাস্তি না যদি দেন ঘটবে প্রমাদ।
বললেন, আচ্ছা, ভাঁড়ার থেকে
নিয়ে আয় বস্তা শক্ত দেখে।
বস্তায় পুরে তার মুখটা বেঁধে
সাত ক্রোশ দূরে নিয়ে মুখ খুলে দে।
রাজার বিচার শুনে সবাই খুশি
থলের ভিতর ঢুকে কাঁদল পুষি।
যা হোক কান্না তার থামল তখন
থলের ভিতর থেকে নামল যখন।
সাত ক্রোশ দূরে এক বিশাল বনে
ছাড়া পেয়ে বাঁচল হৃষ্ট মনে!
বন্য বেড়াল বলে হলো যে মালুম—
শিকার করে ও ডাকে হালুম হালুম।

১৯৪৯

দুই বেড়াল ও এক বাঁদর

হুলো। তোর মতো দজ্জাল দেখিনি, ভুলো
পিষে তোরে করব ধুলো।
ভুলো। তোর মতো ধড়িবাজ দেখিনি, হুলো।
ধুনে তোরে করব তুলো।
হুলো। তোর মতো দুশমন নেই রে, ভুলো।
পিঠে তোর বাঁধব কুলো।

ভুলো।　তোর মতো শয়তান নেই রে, হুলো।
মুখে তোর জ্বালব চুলো।
হুলো।　হা রে রে রে রে রে।
ভুলো।　হা রে রে রে রে রে।
হুলো।　ভুলো আমায় মারে।
ভুলো।　হুলো আমায় মারে।
হুলো।　বিচার করো হে এসে লছমনদাস।
তোমারেই করি বিশ্বাস।
ভুলো।　বিচার করো হে এসে লছমনদাস।
তোমা পরে রাখি আশ্বাস।
লছমনদাস।　দু'জনেরই আমি মহাবন্ধু, জেনো।
তোমাদের কলহ কেন?
ভুলো।　হুলো চায় আস্ত পিঠে।
হুলো।　আস্ত না খেলে পিঠে লাগে না মিঠে।
ভুলো।　ভালো নয় অতি মিষ্টি
আধখানা পাই যদি হই হৃষ্টি।
হুলো।　অখণ্ড পিষ্টক খেতে অতি মিষ্টক
খণ্ডিত পিষ্টক খেতে যেন বিষ্ঠক।
ভুলো।　আধখানা পিঠাই খেতে যেন মিঠাই।
আস্ত যে খেতে চায় পেটে নয় পিঠে খায়।
হুলো।　দেখি তোর পৃষ্ঠ তবে রে পাপিষ্ঠ।
ভুলো।　তবে রে দুরন্ত দেখি তোর দন্ত।
হুলো।　তুই এক গুণ্ডা নেব তোর মুণ্ডা।
ভুলো।　তুই অতি তুচ্ছ কেটে নেব পুচ্ছ।
হুলো।　করো এর সুবিচার, লছমনদাস!
ভুলো।　লছমনদাস, এর করো সুবিচার!
লছমনদাস।　আচ্ছা রে আচ্ছা, বেড়ালের বাচ্চা
সুবিচার করব এক দম সাচ্চা।
ভুলো পাবে আদ্ধেক হুলো পাবে আস্ত
বকশিশ পাবে কিছু লছমনদাস তো?
হুলো।　রাজি।
ভুলো।　রাজি।

লছমনদাস। তোরা দুই বিল্লী চল তবে দিল্লী।

হুলো। আজই।

ভুলো। আজই।

লছমনদাস। দিল্লীতে এসেছি বড় ভালোবেসেছি।
হুলোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।

ভুলো। কাকে?

লছমনদাস। ভুলোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।

হুলো। কাকে?

লছমনদাস। হুলোকেই ভুলোকেই হুলোকেই ভুলোকেই
হু—ভু—হু—ভু
হুভ্‌লোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।

হুলো। খুশি।

ভুলো। খুশি।

লছমনদাস। তোরা দুই পুষি রে হয়েছিস খুশি রে
বকশিশ রূপে তাই একটুকু কামড়াই।

হুলো। ও কী।

লছমনদাস। কামড়ের পরেও তো আস্তই রয়েছে
এখনো তো হয়নিকো দু'খানা।

হুলো। আস্ত রইত যদি, গালদুটো ফুলত না
হাসিতেও ভরত না মু'খানা।

ভুলো। আস্ত না হোক তাতে আমার কী আসে যায়
আমাকে দেবে তো ঠিক আদ্ধেক।

লছমনদাস। আরেক কামড় দিয়ে বাকী যা রইল তার
নিশ্চয় দেব ঠিক আদ্ধেক।

হুলো। বেশ বেশ এই চাই আমি যদি কম পাই
নাই কোনো দুঃখ
পিঠে তো হলো না ভাগ, সেইটেই মুখ্য।

ভুলো। বেশ বেশ এই চাই আমি যদি নাও পাই
নাই কোনো দুঃখ
হুলো তো পেলো না পুরো, সেইটেই মুখ্য।

লছমনদাস। আরেক কামড় দিলে হবে আরো সূক্ষ্ম!
হুলো। পিঠে হলো নিঃশেষ তবু করি বিশ্বেস
হবে না হবে না ভাগ, সেইটেই মুখ্য।
ভুলো। পিঠে হলো নিঃশেষ তবু করি বিশ্বেস
সবটা পাবে না হুলো, সেইটেই মুখ্য।
লছমনদাস। বাকীটুকু পেটে গেলে হবে অতি সূক্ষ্ম।
হুলো। ভুলো রে ভুলো রে অখণ্ড গেলো রে!
ভুলো। হুলো রে হুলো রে দ্বিখণ্ড গেলো রে!
হুলো। খিদে কেন পায় রে!
ভুলো। পেট জ্বলে যায় রে!
হুলো। হায় রে! প্রাণ বাহিরায় রে!
ভুলো। ভাই রে! প্রাণ বুঝি নাই রে!

১৯৪৬

পিঠে ভাগের পর

হুলোর হাতে ভুলোর কান
ভুলোর হাতে হুলোর কান
লছমনদাস ধরিয়ে দিয়ে
করল যেদিন লম্ফদান
সেদিন ওরা দুই বেড়ালে
নাচল তা ধিন্ তা ধিন্ রে
হাঁকল মুখে শিঙ্গা ফুঁকে
আমরা এখন স্বাধীন রে।
তা ধিন্‌তা
স্বাধীনতা
তা ধিন্‌তা
স্বাধীনতা।
কিন্তু যখন লাগল এসে
হুলোর কানে ভুলোর টান
ভুলোর কানে হুলোর টান
তখন ওরা দাঁত খিঁচিয়ে
পিঠ উঁচিয়ে
ল্যাজ ফুলিয়ে
খুব চেঁচিয়ে
আঁচড় কামড় চাপড় দিয়ে
করল দু'ভাই রক্তস্নান।
ওদের যেসব বাচ্চা ছিল
তাদের পেটে নেই দানা
খিদের জ্বালায় কাঁদে যখন
তখন তাদের তাও মানা।
কে যেন সে বুদ্ধি দিল,
ভাবছ কেন খাদ্য নেই?
একটা খাবে আরেকটাকে
বেড়াল খাবে বেড়ালকেই
তখন তারা হাঁ করে
ধাঁ করে
ছুটে যায়
রাস্তায়
খপাখপ্

টপাটপ্
যাকে পায়
তাকে খায়।
এমন সময় ব্যাপার দেখে

হুলোর প্রাণে লাগল টান
ভুলোর প্রাণে লাগল টান
দুই বেড়ালে সন্ধি করে
বাচ্চাগুলোর রাখল জান।

১৯৫০

জনরব

প্রথম দৃশ্য। রেলস্টেশন

সত্যচরণ মুস্তফী মাল গুনতি করছেন, এমন সময় শম্ভুচরণ দে এলেন।

শম্ভু। ইস্টিশনে করছ কী
সত্যচরণ মুস্তফী?

সত্য। আরে, কে?
শম্ভু দে?
যাচ্ছি ভাই
বেগুসরাই।

শম্ভু। বেগুসরাই!
বেগুসরাই!
হঠাৎ কেন
ইচ্ছা হেন?

সত্য। লোকের মুখে শুনছি, ওমা
কলকাতায় পড়ছে বোমা।
পড়ল যদি কলকেতায়
পড়বে না কি গড়বেতায়?

শম্ভু। তাই নাকি হে তাই নাকি
আমিও কেন রই বাকী?
পড়ল যদি গড়বেতায়
পড়বে না কি বাঁকুড়ায়?

সত্য। সেই কথাটাই বলল কালু মিস্তিরি
তাই না শুনে কাঁদল আমার ইস্তিরি।
পালিয়ে এলুম কাচ্চাবাচ্চা সব নিয়ে
কোনোমতে কাছাকোঁছা সামলিয়ে।

শম্ভু। আমিও তবে সরে পড়ি
জোগাড় করি টাকাকড়ি।
যেতে হবে জামতাড়া
সাথে নেই রেলভাড়া। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাস্তা

শম্ভুচরণ দে ছুটছে। কুঞ্জ পাল উ   ল্টা দিক থেকে আসছে।

কুঞ্জ। হন্‌হনিয়ে যাচ্ছে কে?
শম্ভু দে?
ছুটছ কেন ল্যাজ তুলে
বলো আমায় মন খুলে।

শম্ভু। বলব কী, ভাই কুঞ্জ পাল
দেখবে চোখে আপনি কাল!
বাঁকুড়াতে পৌষ মাস
গড়বেতায় সর্বনাশ।

কুঞ্জ। গড়বেতায়! গড়বেতায়!
কী হয়েছে গড়বেতায়!

শম্ভু। কী হয়েছে দেখো গে
ইস্টিশনে থেকো গে।
আসছি আমি এক ছুটে
ভাই ভাইপো সব জুটে।
পথ ছেড়ে দাও, ছাড়বে না?
শোন তবে...বোম্...বোমা। (প্রস্থান)

কুঞ্জ। বাপ রে বাপ! দিলুম লাফ।
বাসায় গিয়ে পোঁটলা নিয়ে
ভাগব দূরে ভাগলপুরে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। মাঠ

রাখাল গোরু চরাচ্ছে। কুঞ্জ পাল দৌড়াচ্ছে।

রাখাল। অমন করে লাফায় কেটা?
পালের বেটা?

কুঞ্জ। দেখেছিস কী? ওরে ও
ঘোষের পো।
আনতে হবে মস্ত মোট
আয় রে, ওঠ!
ইস্টিশনে পৌঁছে দে
পয়সা নে।

রাখাল। কী হয়েছে, বল না?
করছ কেন ছলনা?

কুঞ্জ। মাথায় তোর গোবর
শুনিস্ নি সে খবর?
গড়বেতায় বোমা...

রাখাল। ওমা... (মূর্ছা গেল)

পুলিশ। (প্রবেশ করল)
ক্যা কিয়া তোম, খুন কিয়া?
মৎ যাও তোম, জান লিয়া!

কুঞ্জ। দোহাই হুজুর! পুলিশম্যান!
আমার ওপর চটেন ক্যান?
গড়বেতায় পড়ল বোম্...

পুলিশ। ক্যায়সা বাত বোলতা তোম!

কুঞ্জ। সত্য কথা বলছি, জী
ইস্টিশনে চলছি, জী

পুলিশ। আরে বাপ রে, চাচ্চা রে
এ বাত তব সাচ্চা রে।
হাম যাতেহেঁ দেশ। (বিদায়)

কুঞ্জ। বেশ, সিপাহী, বেশ।
ইস্টিশনে থামিও। (প্রস্থান)

রাখাল। (উঠে বলছে) পালাই তবে আমিও। (দৌড়)

চতুর্থ দৃশ্য। রাস্তা

রাখাল গোরু-বাছুর ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। ভূতনাথ বাগ্দী দেখে বলছে—

ভূতনাথ। গোরু বাছুর ছাগল নিয়ে
চলল কোথায়? পাগল কি এ!

রাখাল। পাগল নয় গো ঘোষের পুত
বুঝবি কী তুই, বাগ্দী ভূত!

ভূতনাথ। ভূতনাথ বাগ্দী সাক্ষাৎ বাঘ
ছাগল দেখলে তার জাগে অনুরাগ।
(ছাগল ধরে টান)

রাখাল। ও কী রে! ও কী রে! তুই ও কী করছিস!
ছাগলটা মিছিমিছি কেন ধরছিস্!
মরি আর বাঁচি আমি যাবই যে রাঁচি
মাল্গাড়ী চড়ে এরা রবে কাছাকাছি।

ভূতনাথ। রাঁচিতে পাগলে যায়, যায় ছাগলে কি?
ছেড়ে দে, আমার পেটে যায় কি না দেখি।

রাখাল। ওরে ভাই ভূতনাথ তোরে করি প্রণিপাত
সময় যে নাই আর সময় যে নাই রে।
রেলগাড়ী দাঁড়াবে না, হবে না টিকিট কেনা
বোমা খেয়ে মারা যাব ভূতনাথ ভাই রে।
ভূতনাথ। বোমা!...
রাখাল। শুনিসনি...
ভূতনাথ। ...বোমা!
রাখাল। ...পালা।
ভূতনাথ। ওরে ভাই ঘোষ রে।
ধরিস্‌নে দোষ রে।
আগে যদি যাস্‌ তুই করিস্‌ টিকিট
ট্রেনটাকে আটকাস পাঁচটি মিনিট।

পঞ্চম দৃশ্য। স্টেশন। টিকিটঘর

টিকিটবাবু ঘুম দিচ্ছেন। লোকজন ডাকাডাকি করছে।

—বাবু মশাই, টিকিট।
—বাবু সাহেব, টিকিট।
—এ বাবুজী, টিকিট।
—বড় বাবু, টিকিট।
—বড় সাহেব, টিকিট।
—বড় হাকিম্‌, টিকিট।
—জং বাহাদুর, টিকিট।
—নবাব বাহাদুর, টিকিট।
—রাজা বাহাদুর, টিকিট।
—হুজুর বাদশা, টিকিট।
—কিং এমপেরর্‌, টিকিট।
—গড অলমাইটি, টিকিট।
টিকিটবাবু। (দাঁত খিঁচিয়ে)
কেন এত গোলমাল!
যত সব বোলচাল!
সাড়ে চার ঘণ্টা
লেট আজ ট্রেনটা।
(আবার ঘুম)

১৯৪২

ডালিম গাছে মৌ

বই নং
তারিখ
ফোন

অন্নদাশঙ্কর রায়

Book No.
Date

ছবি আঁকা

চকখড়ি চকখড়ি চক
এই বার আঁকছি বক।
বকমামা বকমামা—খপ
খপ করে মাছ খায়—ঝপ
ঝপ করে উড়ে যায় বক
চকখড়ি চকখড়ি চক।

চকখড়ি চকখড়ি চাক
এইবার আঁকব কাক।
কাক নয় শাদা, তাই হাঁস
হাঁস হলো হাঁস হলো—বাস।
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক করে ডাক
চকখড়ি চকখড়ি চাক।

১৯৫০

ভেল্‌কি

চণ্ডীচরণ দাস ছিল
পড়তে পড়তে হাসছিল।
হাসতে হাসতে হাঁস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো!

বিশ্বমোহন বল ছিল
ঘাসের উপর চলছিল।
চলতে চলতে ঘাস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো!

নন্দগোপাল কর ছিল
ডুব দিয়ে মাছ ধরছিল।
ধরতে ধরতে মাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো!

বন্দে আলি খান্ ছিল
গাছের ডাল ভাঙ্ছিল।
ভাঙ্তে ভাঙ্তে গাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো!

১৯৫০

এই যে কুকুর

এই যে খুকু
        এতটুকু—
এই যে কুকুর
এটা খুকুর।
এমন কুকুর দেখিনি
নয়কো এটা পেকিনী
এমনটি না হেরি আর
নয়কো এটা টেরিয়ার
নয়কো য়্যাল্‌সেশিয়ান
নয়কো ড্যাল্‌মেশিয়ান
চুপি চুপি বলছি শোনো
আস্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান।
শান্তিনিকেতনের দেশে
কলকেতিয়া কুত্তা এসে
দিলো এমন তাড়াটা
কাঁপিয়ে দিলো পাড়াটা।
লড়তে গিয়ে অকস্মাৎ
কুয়োর ভিতর কুপোকাৎ।

কুয়োয় নেমে এক জোয়ান
রশি ধরে মারলো টান।
পাটের ছালায় বাঁধল কান।
ঘটির মতন উঠল কুকুর
কুয়োর পাড়ে এক জোয়ান
জলজ্যান্ত মূর্তিমান।

১৯৫১

কেউ জানে কি

হা হা,
সত্যভূষণ রাহা,
যে কথাটা বললে তুমি
সত্য বটে তাহা!
চামচিকেরা ফুলকপি খায়
কেউ জানে না, আহা!

হো হো,
ইন্দুমাধব গোহো,
এই কথাটি জানলে পরে
ভাঙবে তোমার মোহ।
গাংচিলেরা নাসপাতি খায়
কেউ জানে না, ওহো!

১৯৫১

পুতুল

পুতুল আমার পুতুল
পুতুলের নাম তুতুল
পুতুলকে যে মন্দ বলে
তার নাম ভুতুল।
পুতুল আমার রাজা
খেতে দেব খাজা
পুতুল আমার রাণী
কেমন মুখখানি!
পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
পায়ে দিয়ে জুতুল।

পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে?
সঙ্গে যাবে টাবি কুকুর
কোমর বেঁধেছে।
আয় রে আয় টাবি
কুটুমবাড়ী যাবি
দুধভাত খাবি
সোনার শিকল পাবি।
পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কুতুল।

১৯৫১

ব্যাঙের ছড়া

ব্যাঙ বললেন, ব্যাঙাচ্চি,
দাঁড়া তোদের ঠ্যাঙাচ্ছি।
তা শুনে কয় ব্যাঙাচ্চি,
আমরা কি, সার, ভ্যাঙাচ্ছি?

১৯৫১

কাতুকুতু

বাঘকে করি না ভয়
সাপকে করি না ভয়
ভয় করি নাকো ভূতুকে
আর কোনো ভয় নাইকো আমার
ভয় শুধু কাতুকুতুকে।

জ্যাঠামশায়ের বাড়ী
জন্মের মত আড়ি
ভুলছি না কোনো হুজুকে
দেখলেই খালি কাতুকুতু দেয়
ভয় করি কাতুকুতুকে।

১৯৫১

এই ঘড়িটা

ঘড়ি নয় তো, ঘোড়া!
ফী ঘণ্টায় পাঁচটি মিনিট
এগিয়ে থেকে ওড়া।
পক্ষীরাজ এ যে!
কাল সকালে উঠে দেখি
সাতটা গেছে বেজে।

সত্যি বাজে ক'টা?
ঘরে ঘরে খবর করি
তখন বাজে ছ'টা।
ঘোড়দৌড়ের মতো
ঘড়ির দৌড় হতো যদি
এটা প্রথম হতো।

১৯৫২

বগলানন্দ

বগলে কী ওটা, বগলানন্দ?
দেখি এক বার ভালো না মন্দ
কালো না হল্‌দে হিম না গরম
হাল্‌কা না ভারী কড়া না নরম
পাতলা না পুরু শস্তা না দামী
কাঁচা না পোক্ত নামী না বেনামী
মিষ্টি না তেতো খাসা না বিশ্রী
চাল না ময়দা মুড়ি না মিছরি!

কী মহাবস্তু দেখি দেখি, বাবা
লুকিয়ে করেছ যে বগলদাবা।
পোঁটলাটি যদি খোল এক বার
দেখব যা ওতে আছে দেখবার।
কাঁচুমাচু মুখ বগলানন্দ
পোঁটলা খুলতে ঘুচল ধন্দ
কাঁক-কাঁক-কাঁক— কাঁকড়া কি ওটা?
ছাতা জুতো ফেলে প্রাণপণে ছোটা!
ওরে ব্বাবা রে!

১৯৫২

পিঁপড়ে

পিঁপড়েরা কেন এত ভালবাসে
আমাকে আমাকে আমাকে!
ভালবাসে নাকো মাসীকে মামীকে মামাকে!
মানুষটা আমি এতই কি বলো
মিষ্টি, এত কি মিষ্টি!
আমারি ওপরে কেন যে ওদের দৃষ্টি!
ঘুম ভেঙে যায় ছটফট করি
রাত্রে, দুপুর রাত্রে।
কুটকুট করে আদর জানায় গাত্রে।
আমি কি রাবড়ি মালাই পায়েস
সন্দেশ, আমি সন্দেশ!
মালপো জিলিপি রসগোল্লা কি দরবেশ!
যে সব মিষ্টি খেয়েছি জীবনে
এই বুঝি তার প্রতিশোধ!
কামড় দিয়েছি, কামড়েই তার শোধবোধ!
নিশুত রাত্রে উঠতেই হলো
বসতেই হলো বিছানায়।
টিপবাতি জ্বেলে খুঁজতেই হলো সারা গায়।
বালিশ উলটে চাদর পালটে
দূর করে দিই দুশমনে
ফের শুয়ে পড়ি স্বপ্নও দেখি খুশ মনে।
আবার কখন কুট কুট করে
আদর জানায় গাত্রে
মিছরি পেয়েছে মজা করে খাবে রাত্রে।

১৯৫২

পার্বতীর ছড়া

এক যে ছিল পার্বতী
ফার্বতী
মার্বতী
ধার্বতী

তার যে ছিল বেড়ালটা
ফেড়ালটা
ভেড়ালটা
মেড়ালটা

বেড়ালটাকে ধরতে যাই
একটু আদর করতে চাই।

ওমা তখন পার্বতী
পার্বতী না ফার্বতী
ফার্বতী না মার্বতী
কেড়ে নিল বেড়ালটা

বেড়ালটা না ফেড়ালটা
ফেড়ালটা না ভেড়ালটা।
অমন বেড়াল চাইনে
ওদের বাড়ী যাইনে।

পার্বতী, ও পার্বতী
দেখি না ভাই বেড়ালটা।

১৯৫২

পার্বত্য মূষিক

কাশীধামের গুণ্ডা যেমন
পুরীর যেমন পাণ্ডা
কলকাতার বোমা যেমন
ঢাকার যেমন ডাণ্ডা
মুসলমানের নূর যেমন
টিকি যেমন হিঁদুর
দার্জিলিঙের কী তেমন?
দার্জিলিঙের ইঁদুর!

দার্জিলিঙের ইঁদুর ওরে
সাবান খাবার অরি
সাবান খেয়ে উধাও হলে
সাধ্য নেই যে ধরি।
তোমার জন্যে সাবান আমি
কোথায় এত পাবো!
সাবান খেলে ফরসা হবে
এই কি তুমি ভাবো!

গিন্নী বলেন, বরমপুরের
ইঁদুর কিসে কম!
রেডিয়োগ্রাম নিয়ে গেল
কাগজ খাবার যম!
আমি বলি, বহরমপুর
বহরশূন্য শহর
সেখানকার ইঁদুরের কি
এমনতরো বহর!

দার্জিলিঙের ইঁদুর ওরে
বহরমপুরের দাদু
আমার ঘরে আছে রে ভাই
সাবানের চে' স্বাদু!
খবরদার খাস্‌নে আমার
পশমের ঐ সুট!
তার বদলে দেব খেতে
পাঁউরুটি বিস্‌কুট।

১৯৫২

বেড়ালছানার হিমালয় ভ্রমণ

ঘণ্টি পড়ে ঠং ঠং
বেড়াল যাবেন কালিম্পং।
ঝকর ঝকর ফোঁস্ ফাঁস
বেড়াল চড়েন সেকেণ্ড ক্লাস।
ঝকর ঝকর দুড় দুড়
ট্রেন ছেড়েছে বোলপুর।
থামি থামি চলি চলি
ট্রেন এসেছে সক্‌রি গলি।
ওই দাঁড়িয়ে ইস্টিমার
বেড়াল হবেন গঙ্গা পার।
ইস্টিমার ভোঁ ভোঁ
মণিহারির ঘাটে থো।
মণিহারির মেজো ট্রেন
বেড়াল তাতে নিদ্রা দেন।
ট্রেন যেন দেয় হামাগুড়ি
বেলা হলো, শিলিগুড়ি।
শিলিগুড়ির ইস্টিশান
বেড়াল করেন লম্ফ দান।
ওঠেন গিয়ে মোটরে
সঙ্গে তাঁর ছোটো রে।
মোটর ওঠে পাহাড়ে
তরুলতার বাহারে।
তিস্তা নদীর পাশটা
তারই ওপর রাস্তা।
মোটর ছোটে ভটর ভটর
বেড়াল করে ছটর ফটর।
শিরশিরানি লাগে গায়
গা ঘুলিয়ে বমি পায়।
থামাও থামাও গাড়ী হে
কিসের তাড়াতাড়ি হে!

মোটর থেকে নেমে খোড়া
বেড়াল ভাঙেন আড়ামোড়া।
চাঙ্গা হলেন চার পা হেঁটে
গরম হলেন পোশাক এঁটে।
চলল গাড়ী চুলবুল
পেরিয়ে গেল তিস্তা পুল।
চলল গাড়ী উচ্চে
বেড়াল যেন উড়ছে।
চলল গাড়ী জোর কদম
থামল এসে কালিম্পং।
বেরিয়ে এলেন জ্যান্ত
বেড়ালছানা শান্ত।
ভয় লেগে তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ
ভয়ে চলৎশক্তি হীন।
কিন্তু ক'দিন না যেতেই
আবার হলো যে কে সেই।
তেমনি খেলে তেমনি হাসে
সবাই তাকে ভালবাসে।
দিদিরা যায় বেড়াতে
বেড়ালকে নেয় দু' হাতে।
দিদিরা যায় দোকানে
বেড়ালকে নেয় ওখানে।
দিদিরা খায় নেমন্তন
বেড়াল তাদের সঙ্গী হন
পশম দিয়ে গা মোড়া
বেরিয়ে থাকে চোখ জোড়া।
চোখ দিয়ে সে সব দেখে
গরম জামার ফাঁক থেকে।
বরফ ঢাকা দূর পাহাড়
এড়ায় নাকো দৃষ্টি তার।

১৯৫৩

বমন বারণ মন্ত্র

দার্জিলিং থেকে কালিম্পং ফেরার পথে বমির ভয়ে সকলে ওষুধ খায়। আমি খাইনে। আমি বলি, সঙ্গে বেড়াল আছে। আমি বেড়াল মন্ত্র জপ করব। তা হলে বমি হবে না। সত্যি তাই। এমন প্রত্যক্ষফলপ্রদ মন্ত্র তোমরাও পরখ করে দেখো। তবে সঙ্গে একটি বেড়াল থাকা চাই। কালিম্পং থেকে যেদিন শান্তিনিকেতন ফিরি সেদিন "পিন" হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে খবর পাই তাকে পাওয়া গেছে। তাকে আনাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় শোক সংবাদ আসে।

বেড়াল বেড়াল
কেমন বেড়াল
কেউ দেখেনি
এমন বেড়াল

আয় রে বেড়াল
হায় রে বেড়াল
কোথায় চলে
যায় রে বেড়াল।

এই যে বেড়াল
সেই যে বেড়াল
এমনটি আর
নেই যে বেড়াল।

বেড়াল বেড়াল
যেমন বেড়াল
তেমন বেড়াল
নয় এ বেড়াল

কেউ দেখেনি
এমন বেড়াল।

১৯৫৩

কুকুরপাগল

১

লোকটা ছিল কুকুরপাগল।
কুকুরবাবু খাবেন বলে
গণ্ডাকয়েক পুষলো ছাগল।
ছাগলগুলোয় চরতে দিতে
করতে হলো ঘাসের বাহার।
ঘাসের গোড়ায় না দিলে নয়
চিলি দেশের আমদানি সার।
সারের জন্যে গাড়ী লাগে
গাড়ীর জন্যে বলদ বাহন।
বলদজোড়ার জন্যে আবার
খড় কেনা হয় কাহন কাহন।
খড়ের গাদায় লাগলে আগুন
জলদি জলদি জল যে চাই।
জলের জন্য পুকুর কাটাও
মুনিষ খাটাও শ' আড়াই।

২

তারপরে কী হলো, জানো?
কুক্কুরাবাদ গাঁয়ের লোক
মুশকিলেতে পড়ল সবাই
কুকুর যেদিন বুজল চোখ।

আড়াই শ' জন বেকার নিয়ে
জমি বহুৎ একার নিয়ে
খড়ের গাদায় আগুন নিয়ে
ছাগলছানা ছ'গুণ নিয়ে
গাড়ী নিয়ে বলদ নিয়ে
গোঁজামিল ও গলদ নিয়ে
লোকটা হলো আস্ত পাগল।
সব কিছু তার হাতিয়ে নিল
আগরওয়ালা গণ্ডেরীমল।

মানুষ হলো ছাঁটাই
ঘাস হলো কাটাই
ওজন দরে বিক্রী হলো
সকল ক'টা পাঁঠাই।
বলদ গেল পিঁজরাপোলে
রইল নাকো ল্যাঠাই।
মনের সুখে রাজ্য করে
পরমপুরুষ গণ্ডেরীমল
কেউ জানে না কোথায় গেল
সেই আমাদের কুকুরপাগল।

১৯৫৩

ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী

ব্যাঙ্গমী সুধালো ব্যাঙ্গমাকে,
গাছতলে শুয়ে আছে মানুষটা কে?
মনে হয় কোনো রাজপুত্র হবে
তেপান্তরের মাঠ পেরোবে কবে?
ব্যাঙ্গমা বলল ব্যাঙ্গমীকে,
সামনে বিপদ যদি যায় ওদিকে।
দস্যুর দল আছে, আসবে তেড়ে
একটি নিমেষে নেবে প্রাণটি কেড়ে।
ব্যাঙ্গমা, ব্যথা লাগে দশা ভেবে এর
কাটান কি নেই কিছু এই বিপদের?
একটি উপায় আছে, যদি সে ঘোড়ায়
পক্ষিরাজের মতো আকাশে ওড়ায়।
কিন্তু বিপদ, যেই দম ফুরাবে
ঘোড়াপ্লেন উলটিয়ে অক্কা পাবে।
ব্যাঙ্গমা, বলো, বলো, কী হবে উপায়
মনটা আমার কেন করে হায় হায়!
উপায় নেই তা নয়, কিন্তু কঠিন
লাফ দিয়ে ডিগবাজি খাবে গোটা তিন।
কিন্তু পেরোবে যেই চার পোয়া মাঠ
অমনি দেখবে খাড়া লৌহ কপাট।

তা হলে কেমন করে যাবে ওধারে
কপাট কি খুলবে না কোনো প্রকারে?
কপাটের তলে আছে গুপ্ত সুড়ং
তিন বার বলবে অং বং চং।
তখন চিচিং ফাঁক। কিন্তু ফাঁড়া!
ওধারেতে রাক্ষস আছে পাহারা।
রাক্ষস! ব্যাঙ্গমা, তরাসে মরি!
উপায় কি আছে এর? প্রশ্ন করি।
নেই যে তা নয়, তবে চাই বাহুবল
এবার খাটবে নাকো কলাকৌশল।
মারতে হবে আর মরতে হবে
রাজকন্যাকে পাবে বাঁচলে তবে।
তবে আর কাজ নেই তেপান্তরে
ঘরের ছেলেকে বলি ফিরতে ঘরে।
কুক কুক কুক্কুরু কুক্ কুর কুর
ঘরে ফিরে যা রে, রাজপুত্তুর।

১৯৫৪
Book No
Date

ঘোড়দৌড়

খুকু। মোড়ার ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার থেকে গড়িয়ে পড়ি
টগবগ টগবগ।
আঁখি। গোল তাকিয়া ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি
টগবগ টগবগ।
মুনিয়া। ভুঁড়ির ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
দাদু নড়লে আমিও নড়ি
টগবগ টগবগ।
খুকু। যা রে ঘোড়া ছুটে যা
খেতে দেব গরম চা।

আঁখি। চল রে ঘোড়া ছুটে চল
খেতে দেব ঠাণ্ডা জল।
মুনিয়া। নাচ রে ঘোড়া জোরে নাচ
খেতে দেব নরম ঘাস।
তিন জনে। টগবগ টগবগ ছোটে ঘোড়া
নামে ঘোড়া ওঠে ঘোড়া।
বেড়া দেখে লাফায় ঘোড়া
গর্ত দেখে ঝাঁপায় ঘোড়া।
নাচে ঘোড়া খেলে ঘোড়া
শেষ কালে দেয় ফেলে ঘোড়া।
হুড়মুড়িয়ে পড়ি রে
আর কি ঘোড়ায় চড়ি রে!

১৯৫৪

পড়ার ছড়া

এমন পড়া পড়ল সে
মঞ্জরিণী বকুল দে
দেখল সবাই অবাক হয়ে
মঞ্জরিণী বকুলকে
পড়া!
পড়া!
উঠতে বসতে চলতে চলতে
পড়া!
খেতে খেতে নাইতে নাইতে
পড়া!
নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে
পড়া!
এত বার যে পড়ছে বকুল
ভাঙছে না পা, ছিঁড়ছে না চুল!
পড়া!
চৌপর দিন, আবার সাঁঝে
পড়া!
রাত দুপুরে তিনটে বাজে
পড়া!
এত বার যে পড়ছে বকুল
ভাঙছে না হাত, খুলছে না দুল!
কেন বলো তো?
এ পড়া
গাছ থেকে নয়, ছাদ থেকে নয়
লাইব্রেরী থেকে
বই চেয়ে নিয়ে পড়া।

১৯৫৪

বাদুড় ঝোলা

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
  বাদুড় দেখ'সে
ট্রামগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড়
  রাত্রিদিবসে।
বাসগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড়
  টিকিট না কেটে
রেলগাড়ীতে ঝুলছে বাদুড়
  প্রাণটি পকেটে।

১৯৫৫

পার্সেল

খোলার আগে

দিদি লো দিদি
এ কী নিধি
তোর কপালে
মেলায় বিধি!
ছাপ মেরেছে
মার্কিনের
পার্সেলটা
বড় দিনের।
দাঁড়িয়ে আছে
ডাক পিয়ন
ছাড়িয়ে নিতে
লাগবে পণ।

খোলার পরে

ও দিদি তুই
বেশ মেয়ে!
সাগরপারের
কেক পেয়ে
কোথায় রে তোর
মুখে জল?
দেখছি যে তোর
চোখে জল!
পড়ছে মনে
ওখানকার
বন্ধুজনের
স্নেহের ধার?

দিদির উক্তি

এইটুকু এই
কেক এলো
চোখের মাথা
কে খেলো!
মুখপোড়াদের
কার্য
পাঁচটি টাকা
ধার্য!
পাঁচটা টাকার
মাল না
তিলকে করে
তাল না!
কেকটাকে কর
ন' কুচি
মাশুলঘরের
নিকুচি।
কুচিকে কর
ফ্যাকড়া
মাশুলবাবু
ড্যাকরা।
পাড়াতে দে
হরির লুট
ভগ্নীপতের
পকেট লুট।

১৯৫৫

পূরণ করো

খেলেও বলে, খাইনি
পেলেও বলে, পাইনি
গেলেও বলে, যাইনি
এমন মেয়ে দেখি যদি
তাকেই বলি—

রেখেও বলে, রাখিনি
ঢেকেও বলে, ঢাকিনি
থেকেও বলে, থাকিনি
এমন মেয়ে দেখি যদি
তাকেই বলি—

১৯৫৫

পটল

পটল নামে লোক ভালো
পটল চেরা চোখ ভালো।
পটল খেতে ভালো যে—
কিন্তু পটল তুলবে কে?

১৯৫৫

সুকুমারী

ও আমার সুকুমা
ছিলি কতটুকু, মা।
পা পা চলি চলি
কবে রে তুই বড় হলি।
বড় হওয়া কী যে দায়

বর এসে নিয়ে যায়।
সুকুমারী দুধের সর
কেমনে করবি পরের ঘর।
এই মেয়েটা হলে বেটা
একে নিয়ে যেত কেটা!

১৯৫৫

যেখানে বাঘের ভয়

এই ব্যালাড জাতীয় কবিতাটি ঠিকমতো পড়তে হলে কোনখানে কোনখানে থামতে হবে ও কোনখানে কোনখানে ছুটতে হবে তার একটা ইঙ্গিত নিচে দিচ্ছি।

এক যে...ছিল রাজা দেয় না সাজা...লোকটি...ভালো বেজায়
একদা...ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে...বলে সে যায়।

এক যে ছিল রাজা
এক যে ছিল রাজা দেয় না সাজা লোকটি ভালো বেজায়

একদা ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে বলে সে যায়।
তার পর খবর নেই
তার পর খবর নেই ব্যাপার এই রাণীকে ভাবিয়ে তোলে
তা শুনে উজীর বুড়ো নাজীর খুড়ো পড়ল গণ্ডগোলে।
রাজাদের অশ্বশালায়
রাজাদের অশ্বশালায় সন্ধানে যায় আছে কি তাজী ঘোড়া?
সে ঘোড়া চড়তে জোয়ান কে আগুয়ান পাবে তোড়া!
একটা ছিল বাজী
একটা ছিল বাজী আরবী তাজী চেহারা বেবাক শাদা
সে ঘোড়ার লায়েক সোয়ার মেলা যে ভার। চড়লে পড়বে, দাদা।
তা ছাড়া বাঘের ডরে
তা ছাড়া বাঘের ডরে দিন দুপুরে সে পথে চলতে মানা
তাই তো হয় না জোয়ান কেউ আগুয়ান, করে সব টালবাহানা!
ছিল এক বিশ্বাসী জন
ছিল এক বিশ্বাসী জন রাজার আপন, সে বলে, আচ্ছা, রাজী
বাঁচি বা পড়ি মরি ঘোড়ায় চড়ি কেয়াবাৎ আরবী তাজী।
সেকালে হয়নি বাইক
সেকালে হয়নি বাইক ছুটল পাইক ঘোড়াতে টগবগিয়ে
দু'ধারে রইল খাড়া দেখল যারা নীরবে হকচকিয়ে।
চলল বায়ুরথে
চলল বায়ুরথে বনের পথে চলল জোর কদমে
সন্ধ্যা হবার আগে এড়িয়ে বাঘে থামবে একটি দমে।
ঘোড়াটি সত্যি খাসা
ঘোড়াটি সত্যি খাসা মুখের ভাষা শুনলে সমঝ করে
ছোটে সে রাজার কাজে বনের মাঝে ভাগে না বাঘের ডরে।
তখনো হয়নি বিকাল
তখনো হয়নি বিকাল হেন কাল পিছনে ডাকল কেটা!
আঁশটে গন্ধ ও কার! কেবা আর! সাক্ষাৎ যমের বেটা!
এক বার পিছন ফিরে
এক বার পিছন ফিরে সে মূর্তিরে অদূরে দেখতে পেয়ে
সোয়ারি প্রাণের দায়ে ঘোড়ার গায়ে চাবকায়, চলে ধেয়ে।
দৌড়ে বাঘের সাথে

দৌড়ে বাঘের সাথে কম তফাতে ঘোড়া সে পারবে কত!
ছুটতে বনবাদাড়ে কাঁটার মারে পায়ে তার হাজার ক্ষত।
পাছাতে বসল কামড়
পাছাতে বসল কামড় এর পর ঘোড়া কি চলতে পারে!
সোয়ারি হাত নাগালে গাছের ডালে সবেগে লম্ফ মারে।
হায় হায় ঘোড়া গেল!
হায় হায় ঘোড়া গেল বাঘে খেলো কামড়ে একটা কিনার
বাকীটা রইল পড়ে খাবে পরে রাত্রেই বাঘের ডিনার।
বাঘটা ধীরে ধীরে
বাঘটা ধীরে ধীরে চলল ফিরে কোথা যে গভীর বনে
ক্রমে তার গন্ধটাও হয় উধাও ভয় আর নাইকো মনে।
মাটিতে নামল পাইক
মাটিতে নামল পাইক চার দিক যতনে রাখল দেখে
তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে রাজার পাশে ছুটল এঁকে বেঁকে।
কাছেই বানর পাহাড়
কাছেই বানর পাহাড় উপরে তার উঠল হামা দিয়ে
দেখল রাজা মশায় ধ্যানধারণায় মশগুল ঠাকুর নিয়ে।
পড়ল চরণ ধরে
পড়ল চরণ ধরে নিরুত্তরে রইল একুশ মিনিট
রাজা তো প্রশ্ন করে ভেবে মরে লোকটা হলো কি ফিট!
শেষটা গেল জানা
শেষটা গেল জানা বাঘের হানা আহাহা ঘোড়ার মরণ!
মহারাজ ভীষণ ক্ষেপে রাগে কেঁপে ছাড়িয়ে নিলেন চরণ।
বন্দুক তৈরি ছিল
বন্দুক তৈরি ছিল কাঁধে নিল বলল, বাঘটা কোথায়?
বাঘ কি ফলে গাছে ধারে কাছে চাইলে বাঘ দেখা যায়!
সামনে চলল পাইক
সামনে চলল পাইক ঠিক ঠিক চলল বনের দেশে
সেই যে গাছের গোড়া যেথায় ঘোড়া সেখানে থামল এসে।
আহাহা আরবী তাজী!
আহাহা আরবী তাজী খোশমেজাজী একে যে ধরল বাঘা
সে বাঘে দেখতে পেলে অবহেলে হবে আজ গুলি দাগা।

বুনোরা এলো ছুটে
বুনোরা এলো ছুটে সবাই জুটে বাঁধল বাঁশের মাচান
চার দিক রইল ছিপে টিপে টিপে চুপচাপ রাজা যা চান।
চাঁদনী অর্ধ রাতে
চাঁদনী অর্ধ রাতে গন্ধে মাতে নিঃঝুম অর্ধ যোজন
বাঘটা ঘোড়ার খোঁজে ওই এলো যে সারতে নৈশ ভোজন।
তাক করে ছুটল গুলি
তাক করে ছুটল গুলি মাথার খুলি বাঘটা গর্জে ওঠে
হৈ চৈ করে সবাই বুনো ক'ভাই বাঘটা বন্দী গোঠে।
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম
বার দুই বাজল আওয়াজ
বাঘ বীর পড়ল ভূঁয়ে মাথা নুয়ে থামলেন রাজাধিরাজ।

১৯৫৪

পক্ষিরাজ

পক্ষিরাজের খেয়াল হলো ঘাস খাবে
স্বর্গে কোথায় ঘাস পাবে!
একদিন সে ইন্দ্ররাজার সুখের দেশ
শূন্য করে নিরুদ্দেশ।
উড়তে উড়তে নেমে এলো এইখানে
চরতে গাঁয়ের ময়দানে।
ভোরে উঠে দেখতে পেলো নন্দুভাই
সঙ্গে ছিল বন্ধুভাই।
ঘোড়ার মতন গড়ন কিন্তু পক্ষধর
ধরতে গেলে করবে ফর্‌র্‌।
নন্দুরা তাই গাছে উঠে লাফ দিয়ে
পড়ল পিঠে ঝাঁপ দিয়ে।
পক্ষিরাজ তো ঘাসের স্বাদে তন্ময়
উড়তে কি তার মন হয়।
দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে নন্দুভাই
টানল তাকে বন্ধুভাই।

পক্ষিরাজের জায়গা হলো গোহালে
থাকল সেথা গো হালে।
বার্তা গেল রটতে রটতে রাজধানী
মন্ত্রী এলেন সন্ধানী।
চিনতে পেরে বলেন, এ যে পক্ষিরাজ!
নন্দু, তোমার কিবা কাজ!
রাজার ঘোড়া রাজার জন্যে দাও ছেড়ে।
নয়তো আমি নিই কেড়ে।
নন্দু ও তার বন্ধু মিলে বলল, সার,
যে ধরেছে পক্ষী তার।
কাড়াকাড়ি করতে গেলে আমরা বেশ
উড়ে যাব অন্য দেশ।
ঘোড়ার পিঠে উঠল দু'ভাই, ধরল রাশ
উড়ল ঘোড়া। ভুলল ঘাস।
মন্ত্রী ছোটেন, রাজা ছোটেন, প্রজা সব
ছুটতে ছুটতে করে রব।

পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে অন্য দেশ
বন্য দেশ
কত দেশ
শত দেশ
উড়ল ওরা ঘুরল ওরা দেখল ওরা
নির্নিমেষ।
কিন্তু যখন পক্ষিরাজের হলো মন
স্বর্গে যাবার এলো ক্ষণ
তখন ওরা ঘরের ছেলে ফিরল ঘর
দিল ছেড়ে পক্ষধর।
উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল হলো
তার পরে সে নীল হলো।
স্বর্গে তখন খোঁজাখুঁজির অন্ত না
ইন্দ্র করেন মন্ত্রণা।
দৈত্যরাই দস্যু বলে কন্ সবে
তাদের সঙ্গে রণ হবে।
এমন সময় পৌঁছে গেল পক্ষিরাজ
থেমে গেল যুদ্ধসাজ।

১৯৫৫

তিন হাতী

বাপা!
তখন আমার কর্ম ছিল হাতীর পিঠে চাপা!
তিনটি হাতীর কথা আমার আজো পড়ে মনে
হায়রে সে সব হাতী কোথায়! আছে কি জীবনে!

১

দুবলহাটির হাতী রে দুবলহাটির হাতী
বপুখানা দেখতে যেন ঐরাবতের নাতি।
রাজার হাতী, হাতীর রাজা, চতুর্দিকে রব
আমারে সেলাম করো নিখুঁত আদব।
গদাই লস্করী চাল ভারিক্কি ধরন
দেমাকে আমার ভূঁয়ে পড়ে না চরণ।
কী যে তোমার মর্জি, বাপু, পাঁকে কিসের কাজ
নামবে কোন্ পাতালে মরা বিলের মাঝ!
পিঠে আমি বসে আছি ভুলে গেলে কি
অমনি করে দেবে আমায় কাদায় ফেলে কি!
শুকনো ডাঙা নয় যে আমি পিঠ থেকে দি' লাফ
প্রাণে বাঁচার পন্থা কোথায়! কিসে থাকি সাফ!
মাহুত ছিল পাকা লোক অঙ্কুশ চালায়
হাতী তখন পঙ্ক হতে উঠিয়ে পালায়।

২

রাতোয়ালের হাতী রে রাতোয়ালের হাতী
আকারে মাঝারি তুমি ঐরাবতের জ্ঞাতি।
মেজাজ শরিফ বেশ চলাটিও খাসা
কত বার পিঠে নিয়ে কত যাওয়া আসা।
কী যে হলো খেয়াল, আমায় উঠতে দেবে না
হাঁটু পেতে বসে তুমি সোয়ারি নেবে না!
হাতী চড়ার জন্যে আমি কোথায় পাব মই
টেবিল পাতি চেয়ার রাখি তাতে খাড়া হই।
আবার যখন নামতে হবে সে বড় ভাবনা
গ্রামে গ্রামে চেয়ার টেবিল পাব কি পাব না।
হাতীতে চড়ি তো হাতী নামাতে না চায়
কাজের জায়গা এলে আমি অসহায়।
মাহুতটা হদ্দ হয় অঙ্কুশ তাড়িয়ে
হাতী বসবে না, খালি থাকবে দাঁড়িয়ে।

৩

নেমৎপুরের হাতী রে নেমৎপুরের হাতী
আকারে বামন তবু ঐরাবতের জাতি।
অদ্ভুত দৌড়তে পারে কদাচিৎ হাঁটে
আমি তো লজ্জায় পড়ি পথে আর ঘাটে।
লোকজন ভাবে আমার এমন কী তাড়া
আমার ধরন দেখে ভেঙে পড়ে পাড়া।
"ঘোড়েকা পর হাওদা হাতীকা পর জিন
জলদি যাও জলদি যাও ওয়ারেন হেস্টিন।"
যদিও লোকটি নই ওয়ারেন হেস্টিন
তবুও আমার ইনি হাওদাবিহীন।
গদিটি আঁকড়ে ধরে মনে মনে কম্প
প্রবল প্রতাপ বলে যত করি ঝম্প।
তার পর মজা দেখ, নামার সময়
পিছনের দিকটাই হাঁটু মুড়ে রয়।
আমি তো ডিগ্‌বাজি খাই পা দুটো উঠিয়ে
গদির বাঁধনটাকে দু'হাতে মুঠিয়ে।
ছুটে আসে চৌকিদার ধরে আমায় চেপে
নইলে কেউ ছবি দিত পত্রিকায় ছেপে।

১৯৫৫

কুত্তার কেরামতি

এদিকে আয় রে পাজি—
এদিকে আয় রে পাজি ডগ্ বাবাজী
দেখি তোর কান দুটো রে।
সারা রাত ঘেউ ঘেউ—
সারা রাত ঘেউ ঘেউ আর তো কেউ
ঘুমোয় না তোর গলার জোরে।
খালি তোর গলাবাজি—
খালি তোর গলাবাজি ডগ্ বাবাজী
কী যে আর বলি তোরে।
তোরা সব ঘরে থাকিস—
তোরা সব ঘরে থাকিস পাহারা দিস
ঘড়িটা নিল চোরে।

১৯৫৬

কেমন কল

ও বড়মানুষের ঝি
ইঁদুরে খেয়েছে ঘি।
তাইতো কেমন ইঁদুর ধরা
কল এনেছি।
দেখি! দেখি!
এ কী!
এ কল যে লাফায়!
ওমা এ যে ঝাঁপায়!
আঁচড়ায় কামড়ায়
হাঁপায়!
ওমা এ যে ডাকে
মিআঁউ মিআঁও মিউ!
অ ভালোমানুষের পুত
বেড়ালে খেয়েছে দুধ।
এবার একটা বেড়াল ধরা
কল এনে দিউ।

১৯৫৫

বীণাদির দুঃখু

ছাগল নিয়ে পাগল হলেম
ওরে শিবু আয় রে
আমার বাগান যে ছারখার।

দুটো ধাড়ী একটা ছানা
কে জোগাবে এদের খানা
অষ্ট প্রহর চলছে চোয়াল
যেমন বুলডোজার।
ওরে শিবু আয় রে
আমার বাগান যে ছারখার।

এমন চলা চললে পরে
থাকতে হবে তেপান্তরে
বাড়ীঘরও হবে শেষে
ওদের জলখাবার।
ওরে শিবু আয় রে
আমার বাগান যে ছারখার

১৯৫৫

লিমেরিক

এক যে ছিল হনুমান
এটা আমার অনুমান।
তার যে ছিল ছানা
এটা আমার জানা।
লঙ্কাকাণ্ড দিনমান।

এক যে আছে পেয়ারা গাছ
পাড়ার শিশু তারই কাছ।
পাড়া যখন শুতে যায়
বাদুড় এসে পেয়ারা খায়।
গাছ রে তুই ফুরিয়ে বাঁচ।

বাঙালীই বটে টমবাবু
ছেলেটি কি তাঁর কম বাবু!
এই বয়সেই বৎস
সারাবেলা ধরে মৎস্য।
বলিহারি তার দম, বাবু!

১৯৫৫

বড়দি বড়দা

বড়দি বড়দি
বড়দির কেন হয় না সরদি!
ডাক্তার কেন আসে না দেখতে
তেতো জল কেন খায় না বড়দি!

বড়দা বড়দা
বড়দা খায় না পান ও জরদা।
বড়দার খালি সিগারেট চাই
সুপরি মৌরী খায় না বড়দা।

১৯৫৫

হাভাতে

শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত
শুদ্ধোদন দাশগুপ্
ঘরের কোণে বসে আছো
কেন অমন চাপচুপ!
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্!

হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গণ্ডা কয়েক মাটন চপ।
বেড়াল এসে খেয়ে গেল
খপাখপ গপাগপ।
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্!

১৯৫৫

আদর কর বাঁদরকে

আদর কর বাঁদরকে
বাঁদর যদি কামড়ায় তো
করবে তোমায় আদর কে।

আদর করবে দাদা।
দাদার সঙ্গে আড়ি তোমার—
কাঁচকলা আর আদা।

আদর করবে দিদি।
দিদির দিকে তাকাও না তো—
দিদি কেমন নিধি।

আদর করবে মা।
মায়ের কথা কোনো দিন যে
একটি শুনবে না।

আদর করবে বাবা।
বাবাকে তো করতে আদর
উচিত ছিল ভাবা।

তাই তো বলি, খুকু,
সবার সঙ্গে ভাব কর গো
নইলে পাবে দুখু।

১৯৫৬

বাতাসিয়া লুপ

ছ'টা কুড়ি
ট্রেন ছেড়েছে শিলিগুড়ি।
ডিং ডং
ছাড়িয়ে গেল কার্সিয়ং।
ঝুম ঝুম
এবার বুঝি এলো ঘুম।
টিং টিং
ঘুম থেকে যায় দার্জিলিং।
ইয়া ইয়া
এই কি সেই বাতাসিয়া?
চুপ চুপ
সামনে বাতাসিয়া লুপ।
নমো নমো
বিশ্ব মাঝে উচ্চতম।

বেঁকে বেঁকে
ট্রেন চলেছে বৃত্ত এঁকে।
ঘুরে ঘুরে
ট্রেন চলেছে ঘূর্ণি জুড়ে।
ওগো কাকী
ট্রেন কি ঘুমে ফিরল নাকি!
মজা খুব
ট্রেন যে হঠাৎ দিল ডুব।
লাইন তলে
নামতে থাকা লাইন চলে।
ও পারেতে
ট্রেনকে দেখি দৌড়ে যেতে।
ঢিং ঢিং
ঐ যে আসে দার্জিলিং ।।

১৯৫৭

আতা গাছে তোতা
ফোন

হোঁদল

মেয়ে আমার খুঁৎখুঁতে
খুঁজে খুঁজে নাম পেলো না,
রাখল—হোঁদলকুৎকুতে।
আমার কিন্তু অন্য মত
পাড়ায় যত বেড়াল আছে
কেই বা এমন খুবসুরৎ!
যায় না দেখা রং হেন
শুকনো চাঁপা ফুল দেখেছ
তেমনি গায়ের রং যেন।

হরেক রকম ভঙ্গীতে
বসবে শোবে খানা খাবে
পারি কি সব অঙ্কিতে!
ডাকবে সুরে পাঁচ রকম
হরবোলাও হার মেনে যায়
হোঁদল মিঞা নয় জখম।
একটিমাত্র দোষ দেখি
এমনতর হাঁদা বেড়াল
আর কোথাও মিলবে কি!

বোকার মতো মুখখানি
বিশ্বাস তাই হয় না আমার
বেড়াল করেন শয়তানী।
মেয়ের কিন্তু অন্য মত
সাক্ষী নেই, বলবে তবু
হোঁদল খেলো পারাবত!
তখন আমি করি কী!
হোঁদলাটাকে ছালায় পুরে
সাঁকোর পারে চালান দি'।

মেয়ের করে মন কেমন
আর কি হোঁদল আসবে ফিরে
বাঁচবে সে আর কতক্ষণ!
হোঁদল পরে এলো ফের
মনখানা তার গেছে ভেঙে
মুখখানা তার কী দুঃখের!
একেক সময় মালুম হয়
বিড়ালবেশী মানুষ ও যে
হোঁদল আমার বেড়াল নয়।

১৯৫৮

কলম কিনি কেন?

কলম কিনি চোরকে দিতে
চোর যে আমার প্রাণের মিতে।
বুক পকেটে পাঞ্জাবিতে
কলম রাখি চোরকে দিতে।
কতক্ষণ বা লাগে নিতে
চোর যে আমার প্রাণের মিতে!

কলম কিনি মাসে মাসে
বিলিয়ে আসি ট্রামে বাসে।
খাইনে তাতে কী যায় আসে
কলম কিনি মাসে মাসে।
লোকের ভিড়ে বদ্ধ শ্বাসে
বিলিয়ে আসি ট্রামে বাসে।

বন্ধুরা সব বলছে তেতে,
এবার লেখ পেন্সিলেতে।
প্রেরণা কি আসবে এতে?
আমিও তাদের বলছি তেতে।
কলম গেলে দেব যেতে
লিখব নাকো পেন্সিলেতে।

১৯৫৮

চিড়িয়াখানার খবর

পায়রা ছিল চড়ুই ছিল জুটল এবার শালিক
আমি কেবল ভাড়া জোগাই ওরাই বাড়ীর মালিক।
ওরা থাকে ঘুলঘুলিতে বেঁধে ওদের বাসা
জানলা দিয়ে বেপরোয়া ওদের যাওয়া আসা।
কেউ বা করে বকম বকম কেউ বা কিচিমিচি
হৈ চৈ করছে কারা? করছে মিছিমিছি।
দিনের বেলায় চেঁচামেচি রাত্রে কিছু কম
রাত দুপুরেই শুনতে পাই বকম বকম।
কখন ওদের ফোটে ডিম কখন গজায় ডানা
ঘরের মেজেয় হঠাৎ দেখি নতুন পাখীর ছানা।
উড়তে সবে শিখছে কিনা, ফড়ফড়ানি সার
কেমন করে ফিরে যাবে ঘুলঘুলিতে আর?
ওদিকে যে বেড়াল আছে চার চার শিকারী
আমার খাট আমার গদি ওরাই অধিকারী।
ওরা আমার পোষ্য নয়, আমিই ওদের পুষ্যি
চিড়িয়া তো ওদের খানা, নয়কো সেটা দুষ্যি।
কেমন করে বাঁচাই পাখী এ এক সমস্যা
দোর জানালা বন্ধ করে চালাই তপস্যা।
টেবিলের 'পর চেয়ার পাতি, চেয়ারের 'পর মোড়া
আমিই যেন ঘোড়সওয়ার ওরাই যেন ঘোড়া।
ঘুলঘুলিতে বাড়াই হাত পাখীর কাছাকাছি
তখন ওদের মায়ে ছায়ে কেমন নাচানাচি।
টলমলে সেই পিরামিডের চূড়ায় খাড়া আমি
পা হড়কে পড়ার ভয়ে ইচ্ছা নয় যে নামি।
আমি তো যাই বাঁচাতে আমায় কে বাঁচায়
বন্ধ দুয়ার, তাই তো আমার বন্ধু পাওয়া দায়।
টাল সামলে কোনো মতে বসি মোড়ার 'পরে
বাকীটুকুন সোজা, তখন ফিরি পড়ার ঘরে।
ওদিকেতে হুলো বেড়াল দিচ্ছে কেবল হানা
চিড়িয়া তো গেল এখন কোথায় পাবে খানা।

১৯৫৯

ঘোড়া

নাতি আমার সাদা
দেখতে পেলে গাধা
চেঁচিয়ে ওঠে—
“দাদা।”
দৌড়ে আমি যাই
ডাকছে আমায় ভাই
দেখি, ওমা—
গাধা!
চাকরটিও খাসা
বুদ্ধি দিয়ে ঠাসা
বলে, “ওই যে
ঘোড়া।”
ঘোড়ায় চড়ার সাধ
গাধায় মেটে আধ
বেশী নয় তো
থোড়া।

সত্যি ঘোড়সোয়ার
এলো যেদিন দ্বার
বাপ্‌পা দেখে
থ।
জড়িয়ে ধরে মা'কে
যতই বলি তাকে
“চড়তে রাজী
হ।”
মুগ্ধ হয়ে তাকায়
চোখদুটিকে পাকায়
হর্ষে বলে,
“গোয়া।”
ঘোড়া গেল চলে
বাপ্‌পু কাঁদে কোলে
ভোলে খাওয়া
শোয়া।

১৯৬০

নাম করতে নেই

ফিরছি সেদিন আঁধার রাতে
টিপবাতিটা জ্বলছে হাতে
হঠাৎ দেখি পায়ের কাছে—
নাম করতে নেই।
এঁকে বেঁকে ডাইনে বামে
খানিক ছোটে খানিক থামে
পথটি আমার জুড়ে থাকে
বেবাক সম্মুখেই।

চিকন কালা ছিপছিপে তার
অঙ্গে দেখি সাদার বাহার
দীঘল তনু লতার মতন
ঘাসের উপর টানা।

আমার বাতির আলোর তীরে
চমকে ওঠে, তাকায় ফিরে
দেখিনে তার ফণা তোলা—
হয়তো আলোয় কানা।

হাতে আমার ছিল ছাতা
মারতে আমি তুলি না তা'
ডাকি নাকো পাড়ার লোকে
তবুও তারা আসে।
চাচারা সব থাকে তফাৎ
মারতে তাদের ওঠে না হাত
“অনিষ্ট তো করেনি ও”
বিজ্ঞসম ভাষে।

তখন আমি হেসে বলি,
"সেও চলুক আমিও চলি
কাজ কী মেরে? কাজ কী মরে?
যে যার ঘরে যাই।"

মিশকালো তার অঙ্গটারে
মিশতে দিই অন্ধকারে
মাঠের পথে বাতি জ্বেলে
জোরে পা চালাই।

১৯৬০

ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী

যে ছেলেটি কান্না জোড়ে ট্রামে বাসে ট্রেনে
সেই ছেলে কি উড়তে পারে দুরন্ত জেট প্লেনে!
সেই ছেলেকে নিয়ে যাবে মার্কিন মুলুকে
এতখানি জোর আছে কি মা-বেচারির বুকে!
দাদু বলেন, না।
বাপ্‌পু যাবে না।
মাও যাবে না।
তিন বছরের শিশু, কিন্তু এইটুকু সে জানে
বাবার কাছে যেতে হলে উড়তে হয় বিমানে।
কেমন করে যাবে খোকন তোমরা যতই ভাবো
বাপ্‌পু বলে, গো-প্লেনেতে বাবার কাছে যাব।
দাদু বলেন, তাই তো।
চাইছে যেতে ভাই তো।
টিকিট কাটতে যাই তো।
যাবে যেদিন সেদিন বাছার সারাবেলা ধুম
কোথায় গেল কান্নাকাটি কোথায় গেল ঘুম।
বাড়ী থেকে বিদায় নিতে কোথায় চোখে জল।
গো-প্লেনেতে চড়বে বলে চরণ চঞ্চল।
দাদু বলেন, এ কী!
নতুন মূর্তি দেখি।
সত্যি যাবে! সে কী!
এয়ার লাইন আপিসে ওর সঙ্গী জোটে আচ্ছা
যাচ্ছে সেও আকাশপারে ইংরেজকা বাচ্চা।
খেলার পুতুল জিরাফটা তার মজা লাগে ভারি
দুইজনাতে বেধে গেল খুশির কাড়াকাড়ি।
বাপ্‌পু বলে, হেঁইও।
বাচ্চা বলে, হেঁইও।
নাচে ধেই ধেই ও।

দমদমেতে হাজির হলো এয়ার লাইন বাস
এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনে দাদুর মনে ত্রাস।
একটা নামে একটা ওঠে একটা চলে হেঁটে
বিরাট শাদা পাখীর মতো যাত্রী নিয়ে পেটে।
কেমন বুকের পাটা!
বাপ্‌পু বলে, টা টা।
আমরা বলি, টা টা।
বিমান ছিল নোঙর ফেলে, সিঁড়িতে চট্‌পট্
মাকে নিয়ে উঠল বীর "শ্রীমন্ত পাইলট্"।
সন্ধ্যা আকাশ কাঁপিয়ে তুলে প্লেন চলল উড়ে
একটি ছোট আলোর রেখা মিলিয়ে গেল দূরে।
দাদু বলেন, তাই তো।
অবাক করলে ভাই তো।
একটুও ভয় নাই তো।
রাত পোহালো জার্মানীতে, লণ্ডনে চা পান
কাকুর সঙ্গে দেখা হলো, বাপ্‌পু ধরে গান।
আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিনদের দেশে
দুপুরবেলা দেখা হলো বাবার সঙ্গে শেষে।

১৯৬১

ভুট্টা বিলকুল খট্টা

গেল রে! দাঁত গেল রে!
দাঁত গেল রে!
ভুট্টায় কামড় দিয়ে!
কেন যে এই বয়সে ·
লোভের বশে
কামড়াই ভুট্টা নিয়ে!

ভাবলুম ছেলেবেলায়
হেলাফেলায়
খেয়েছি, ভুট্টা যত
খেয়েছি কামড় দিয়ে
কড়মড়িয়ে
তাইতে মজা কত।

মজা নয় সাজা এখন
দাঁত কন্ কন্
টানলে দিব্যি নড়ে
হায় হায় কী হবে গো
বলবে কে গো
দাঁত কি যাবে পড়ে!

ভুট্টা কেউ খেয়ো না
কেউ চেয়ো না
ভুট্টা খেতে টক!
এসো ভাই আওয়াজ তুলি
গরম বুলি—
ভুট্টা হো বয়কট!

১৯৬১

ককার

সুরজিৎ দাশগুপ্-
তের ছিল সাধ খুব
পুষবে বিলিতী কুৎ-
তার যদি পায় পুত।

কপালে জুটল হিস্-
পানী বংশের মিশ-
মিশে সোনালী ককার
কার যেন উপহার।

বয়েস দেড়টি মাস
তেড়ে আসে ফোঁসফাঁস।
বড় বড় কুত্তারা
ভয়ে ফিট হয় তারা।

এই এতটুকু মুখ
দুধ খায় চুক্ চুক্।
লম্বা লম্বা কান
বাটিতেই ডুবে যান।

অসহায় জীব বলে
সুরজিৎ নেয় কোলে।
নরম বিছানা পাতে
শোয়ায় নিজের সাথে।

কিন্তু গরম জল
করে তোলে চঞ্চল।
ঘুম ভাঙে মাঝ রাতে
সুরজিৎ কাঁথা পাতে।

পারে না সইতে আর
এক রাতে বার বার।
টেবিলে শোয়ায় তাকে
আপনিও মাথা রাখে।

এমনি সে শয়তান
উঠে বসে ধরে তান।
সুরজিৎ সাবধান
কখন গড়িয়ে যান।

হয়েছে আদুরে জেদী
আওয়াজ মর্মভেদী।
তা হলেও খুব তেজী
নয়কো সে হেঁজিপেঁজি।

শোনা যায় ডাকখানা
বাড়ী থেকে ডাকখানা।
পাড়া করে গম্‌গম্
ভিখিরীও আসে কম।

লেগেছে আজব হাওয়া
থেমে গেছে চাঁদা চাওয়া।
মনে হয় ক্রেমে ক্রেমে
ট্রাফিক যাবেও থেমে।

চোর ডাকু আছে চুপ
সুরজিৎ দাশগুপ্-
তের তাই মনে দুখ-
খের নেই লেশটুক।

১৯৬১

মহনা হাতীর কাহিনী

রাজার হাতী মোহনলাল
মহনা কয় কৌতুকে
রাজাসাহেব পেয়েছিলেন
বিয়ের সময় যৌতুকে।

শ্বশুরবাড়ীর হস্তী অসুর
হাতীশালে রয় বাঁধা।
মাইল খানেক দূর থেকে তার
শুনতে পাই স্বর সাধা।

"মাইল, হাতী, মাইল" বলে
মাহুত নিয়ে যায় ওকে
ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে
আমরা দেখি অলক্ষ্যে।

দীঘিতে যায় জল খেতে আর
পাঁকের তলায় ডুব দিতে
দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো
উঠবে নাকো এমনিতে।

অঙ্কুশেরি প্রহার খেয়ে
আকাশ কাঁপায় গর্জনে
ঝড়ের বেগে ধায় রে হাতী
মাটি কাঁপায় স্পন্দনে।

একদিন সে পাগল হলো
হয়তো মাথার ঘায়ে বা
দাঁতাল হাতী পাগল হলে
ধারে কাছে রয় কেবা।

মাহুতটাকে ফেলল মেরে
লাথ দিয়ে কি দাঁত দিয়ে
দোসরা মাহুত ভাগল ভয়ে
ধরবে কে আর হাত দিয়ে।

যত্র তত্র ঘুরে বেড়ায়
ভাঙে লোকের ঘরবাড়ী
সামনেতে ওর পড়বে যে-ই
অমনি যাবে প্রাণ তারি।

মরাই মরাই ধান লুটে খায়
গ্রামে গ্রামে দেয় হানা
প্রজারা সব ফতুর হলো
রোজ যোগাতে ওর খানা।

নালিশ শুনে রাজা বলেন,
"বদ্ধ পাগল জন্তুকে
গুলি করে মারতে হবে
মারতে যাবে কিন্তু কে?"

পশু ডাক্তার হাত জুড়ে কন,
"প্রভু যদি দেন অভয়
শ্বশুরবাড়ীর যৌতুককে
বধ করা কি উচিত হয়!"

"তুমি দেখছি পশুর উকিল",
রাজা বলেন নিতাইকে
"যাও তা হলে আনো ধরে,
নয়তো মরো আপনি গে।"

নিতাই গেলেন কামারবাড়ী
গড়িয়ে নিলেন ফরমাসে
গণ্ডা দশেক কাঁকড়া কাঁটা
দেখতে যেন কাঁকড়া সে।

হাতী যখন বউলপুরে
পেটটি ভরে খাচ্ছে ধান
নিতাইবাবু ঘোড়ায় চড়ে
কাছাকাছি এগিয়ে যান।

বলেন, "বাছা মোহনলাল
  আয় রে আমার সঙ্গে বাপ।"
হাতী তখন শুঁড় বাড়িয়ে
  ধরতে তাঁকে মারল লাফ।

ঘুরিয়ে ঘোড়া নিতাইবাবু
  বলেন, "ওরে মহনা রে
ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে কি তুই
  পারবি? মনে হয় না রে।"

বুনতে বুনতে চলেন বাবু
  কাঁকড়া কাঁটা রাস্তাময়
মাড়িয়ে কাঁটা গর্জে হাতী
  ক্রোধে যেন অন্ধ হয়।

অন্ধ হয়ে ছুটল হাতী
  ঘোড়ার সঙ্গে রেস দিয়ে
হঠাৎ বসে পড়ল হাতী
  পড়ল ধসে হুমড়িয়ে।

নিতাই তারে বাঁধেন চেনে
  কাঁটা তোলেন পা ধরে
হাতিনীদের সঙ্গে তাকে
  হাঁটিয়ে নিয়ে যান ঘরে।

১৯৬১

চন্দনা

এক যে ছিল চন্দনা সে থাকত ঝোলা খাঁচায়
খাঁচা খোলা দেখলেও সে পালিয়ে যেতে না চায়।
    পাখী চন্দনা রে!
চুপি চুপি বেরিয়ে আসে টিপে টিপে হাঁটে
আলনাটাকে দাঁড় ভাবে সে, জামার বোতাম কাটে।
    পাখী চন্দনা রে!
দাঁড় ভেবে সে বসবে গিয়ে গিন্নী মায়ের কাঁধে
তিনিও ঘোরেন সেও ঘোরে পরম আহ্লাদে।
    পাখী চন্দনা রে!
উড়ে গিয়ে বসার ঠাঁই বারান্দারি থাম
খাবার নিয়ে সাধতে হবে, নাম রে বাছা, নাম।
    পাখী চন্দনা রে!
একদিন সে গেল উড়ে দৃষ্টির আড়ালে
ডাক শুনে তার ঠাহর করি কদম গাছের ডালে।
    পাখী চন্দনা রে!

ভেবেছিলুম ফিরবে না সে, এলো ফিরে সাঁঝে
খাঁচাটিতেই শোবার আরাম চেনা লোকের মাঝে।
পাখী চন্দনা রে!
ভোরে উঠেই যায় সে উড়ে, লাফায় গাছে গাছে
আঁধার হলে আসে ফিরে ধীরে খাঁচার কাছে।
পাখী চন্দনা রে!
হঠাৎ এলো ঝড় ঘনিয়ে, বৃষ্টি এলো চেপে
গাছগুলো সব মাতাল হয়ে দুলতে থাকে ক্ষেপে
আহা, চন্দনা রে!
কোথায় পাখী! কোথায় পাখী! মিথ্যেই ডাক ছাড়া
পাখী কিন্তু একটি বারও দিল নাকো সাড়া।
আহা, চন্দনা রে!
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি ধরে, রাত্রি হলো কাবার
খাঁচার ভিতর রইল পড়ে সাঁঝের বেলার খাবার।
আহা, চন্দনা রে!
বুল্লা আমার প্রাচীন ভৃত্য নিত্য ওঠে ভোরে
তার মশারির চারিধারে কে যেন আজ ঘোরে।
আরে, চন্দনা রে!
বুল্লা ধরে চন্দনাকে আদর করে খাওয়ায়
খাবে কী সে ক্রমেই যেন নেতিয়ে পড়ে দাওয়ায়।
আহা, চন্দনা রে!
গিন্নী মায়ের পরশ পেয়ে নয়ন দুটি খোলে
শেষবার সে ঘুমিয়ে পড়ে জয়া দিদির কোলে।
আহা, চন্দনা রে!

১৯৬২

সন্ধি

সুস্থ মানুষ ছিলেন কবি নিত্যধন
খেয়াল গেল লিখতে হবে ব্যাকরণ।
থাকবে তাতে আর কোথাও নাইকো যা
ব্যাংলাভাষার নিত্য নতুন এ ও তা।
ব্যস্ত মানুষ হলেন কবি নিত্যধন।

বন্ধুজনার উপর চলে পরীক্ষণ
দেখা হলেই বিপদ মানে বন্ধুগণ।
ঠাকুর চাকর জবাব দিয়ে বর্তে যায়
গিন্নী বলেন, "আমায় তবে দাও বিদায়।"
নিত্যবাবুর নিত্য চলে পরীক্ষণ।

হঠাৎ সেদিন পেলুম ভায়ার নিমন্ত্রণ
বাড়ী গেলুম, ভীষণ খুশি নিত্যধন।
"কে আছে রে! জলদি করে চাস্তে বল।"
হুকুম শুনে জাগল আমার কৌতূহল।
তাই তো? ভাবি, এ কী রকম নিমন্ত্রণ!

ব্যাকরণের তর্ক ওঠে বিলক্ষণ
দুই জনাতে ক্ষেপে উঠি সারাক্ষণ।
খানিক বাদে দেখি কারা হাসছে
নিত্য বলে ফুর্তি করে, "চাসছে।"
"চাস্তে করুন", দুহাত জোড়েন নিত্যধন।

যথাকালে পর্ব হলো সমাপন
চা খাওয়ালেন ঘটা করে নিত্যধন।
সন্ধি হলো ব্যাকরণের দ্বন্দ্বে, ভাই!
ভোজন হলো ওজন বুঝে যাচ্ছেতাই।
"আস্তাস্তে হোক আবার", বলেন নিত্যধন।

১৯৬২

নাগরদোলা

ঘোড়ায় চড়া যায় না ভোলা
নাগরদোলা।
চার পা তুলে শূন্যে ঝোলা
নাগরদোলা।
সাজ! সাজ!
পক্ষিরাজ!
ওড়! ওড়!
আরো জোর!
আকাশপানে
ঊর্ধ্বে চল!

মাটির টানে
নিম্নে চল!
ঘুরে ঘুরে
ডাইনে চল!
ঘোড়া আমার নয়কো খোঁড়া
নাগরদোলা।
হোক না কাঠের ঘোড়া তো ঘোড়া
নাগরদোলা।

১৯৬২

বাঘের রাগ

বাংলাদেশের রাজার বাঘ
করলে রাগ
বললে, "ভাগ!
ভাগ রে তোরা, সাদা বাঘ
রেওয়া রাজের হাঁদা বাঘ।
হালুম! হালুম! হালুম!
হয় রে আমার মালুম
করবি তোরা বংশ শুরু
তোরাই হবি সংখ্যাগুরু
তোরাই হবি রাজার জাত্
করবি শেষে কেল্লা মাৎ।
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ।
রেওয়া রাজের
আধা বাঘ!
রংটা যাদের হলদে নয়
বাঘ যে কেন তাদের কয়!

দেশের লোক কি এতই মূঢ়
বোঝে না এর অর্থ গূঢ়!
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ!
বিন্ধ্যাচলের
গাধা বাঘ।
হালুম! হালুম! হালুম!
হয় রে আমার মালুম
তোদের যারা দেখতে যায়
চিড়িয়াখানার টিকিট চায়
বাঘ চিনতে নেই জানা
চিনবে কী? সব রং কানা।
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ!
বিন্ধ্যাচলের
সাদা ছাগ।"

১৯৬৩

পায়রা

জয়া আর অমিত রায়রা
পুষেছিল লক্কা পায়রা
একদিন পায়রা মহলে
দেখা গেল পড়েছে ভূতলে
ছোট্ট সে এতটুকু ছানা
জখম রয়েছে গায়ে নানা।
জয়া তাকে নিয়ে যায় ঘরে
সযতনে সেবা তার করে।
ভেবেছিল ফিরে নেবে মা
মা-ও তাকে ফিরে নিল না।

আর কোনো গতি নেই তার
জয়া নিল পাখীটির ভার।
সারা দিন পাখী নিয়ে থাকে
সারা রাত বিছানায় রাখে।
আর সব পায়রার দল
ভোগ করে পায়রা মহল।
একদিন নিশুতি আঁধারে
কুকুর ঢুকল চুপিসারে।
ভোর হলে দেখা গেল লক্কা
সব ক'টা একদম অক্কা।

সে সময় ছিল না পাহারা
জয়া সে তো কেঁদে হয় সারা।
মন্দের এইটুকু আচ্ছা
বেঁচে গেল শুধু সেই বাচ্চা।
ভাগ্যিস্ হলো সে জখম
নয়তো তাকেও নিত যম।

শোক মাঝে সান্ত্বনা এই
যে মরত বেঁচে গেল সে-ই।
জয়া আর অমিত রায়রা
পুষবে না কখনো পায়রা।
কিন্তু বলো তো প্রাণ ধরে
এর মায়া কাটাবে কী করে?

১৯৬৩

হনুমান

ওই দেখেছ হনুমান
আম নিয়ে যায়
লাফ দিয়ে গাছে ওঠে
ডালে বসে খায়।

আর একটা হনুমান
আমওয়ালার কাছে
আম কেড়ে নেবে বলে
চেয়ে বসে আছে।

আমওয়ালা বুড়ো হে
আম ভরা ঝাঁকা
পথের ধারে নামিয়ে
হবে কি সব ফাঁকা?

১৯৬৪

টেনিস

বয়স হলো ষাট
তাবলে কি ছাড়তে পারি
টেনিস খেলার মাঠ!

বিকেল হলেই জুটি
কমবয়সী খেলার সাথী
দেয় না আমায় ছুটি।

আধ ঘণ্টা ব্যাপী
বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
আমার লাফালাফি।

হয় না যে বিশ্বাস
এমনি করে কেটে গেল
বছর পঞ্চাশ।

১৯৬৪

অলিম্পিক

টোকিওতে দিচ্ছি লিখে
নামব আমি অলিম্পিকে।
বুঝলে, দাদু—
নামব আমি অলিম্পিকে।

নানান্ দেশের বড়ো বড়ো
খেলোয়াড়রা হবেন জড়ো।
শুনছ, দাদু—
খেলার মাঠে আমিও বড়ো।

দেব এমন লম্বা লম্ফ
ঘটবে সেথায় ভূমিকম্প।
পড়বে লোকে—
"জাপানে ফের ভূমিকম্প।"

বান আসে তো সাগর থেকে
সাঁতার দেব বাজি রেখে।
ভয় কী, দাদু—
থাকব ভেসে বাজি রেখে।

মাঠ শুকোলে জমবে খেলা
বল পিটোব সারা বেলা।
আমার কাছে
সেন্চুরি তো ছেলেখেলা।

সাজ বদলে এক নিমিষে
জুটব আমি লন টেনিসে
ছয়-শূন্য, ছয়-শূন্য
জিতব আমি লন টেনিসে।

অনেক রকম ট্রোফী হাতে
ফিরব আমি তোমার সাথে।
হেঁ হেঁ দাদু—
তুমিও চল আমার সাথে।

১৯৬৪

বৃষ্টিপাত

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এলো বান
পথের মাঝে অথই জল
দাঁড়িয়ে গেল যান।

মোটর মোটর করেন যে
মোটর এখন ফটর
এখন, দাদা, সবাই মিলে
ভাজুন হরিমটর।

বৃষ্টিপাত! বৃষ্টিপাত!
রাত্রে আজ নেইকো ভাত!

এমন সময় পেতেম যদি
নৌকো আর মাঝি
বাড়ীর পানে পাড়ি দিতে
আমি তো, ভাই রাজী।

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এলো বান
কে আছো হে, নিয়ে এসো
হাল্‌কা সাম্পান।

বৃষ্টিপাত! বৃষ্টিপাত!
কিস্তি চড়েই কিস্তিমাৎ!

১৯৬৪

ফলার

কী খেয়েছ? কী খেয়েছ?
বল আমায় সত্য।

খেলে কিসে? খেলে কিসে?
বল আমায় খাঁটি।

আর তো কিছুই যায় না পাওয়া
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া
মা ঠাকুমার রেখে যাওয়া
কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজ়ন দরে
বন্ধ ছিল সাত পুরুষের
সোনার পাথরবাটি।

১৯৬৫

নিশুত রাতের রোমাঞ্চ

রাত দুপুরে কুকুর যদি
ডাকে, কেবল ডাকে
ঘুম ভেঙে যায়, ইচ্ছে করে
পিটিয়ে দিতে তাকে।
বিছানাতে পাশ ফিরে শুই
চেঁচিয়ে বলি, "চুপ"
কুকুর কিন্তু গর্জে ওঠে
সাহস পেয়ে খুব।
ব্যাপারটা কী? দেখতে ওঠে
বড়ো গণেশ হরি।
হল্লা শুনে আর পারিনে
আমিও উঠে পড়ি।
ভয়ে কাঁটা বড়ো গণেশ
বলে শুধু, "চো—"
বাকীটুকুন পূরণ করে
হরি বাধায় সোর।

বেরিয়ে দেখি সাথে আছে
ছোট গণেশ বীর।
চোরটা নাকি ঝোপের মাঝে
লুকিয়ে আছে স্থির।
আস্তে আস্তে বাতি হাতে
দু'দিক থেকে যাওয়া।
ঝোপ ঘেরাও করে দেখি
চোর হয়েছে হাওয়া।
রুদ্ধ ছিল, এবার খোলে
গণেশ বুড়োর স্বর
'ইয়া ইয়া হাত দুটো তার
তাগড়া সে জবর।"
রোমাঞ্চিত হয়ে সবাই
বলি যেতে যেতে,
"ভাগ্যে লালু ডেকেছিল!
লালুকে দাও খেতে।"

১৯৬৫

লতা কাহিনী

সাপটা ছিল জাতকেউটে
সাইকেলটার সামনে পড়ে
উঠল ফুঁসে, চলল ছুটে।.

গণেশ তখন দেখে হাঁ।
সাইকেলটার থেকে নেমে
রইল চেয়ে, নাইকো রা।

ঝোপ ছিল এক মাঠের মাঝে।
সাপ পালালো এঁকে বেঁকে
লুকিয়ে গেল ভরা সাঁঝে।

কাউকে তখন ডাকা মিছে।
লাঠি হাতে বাতি হাতে
কে বেরোবে সাপের পিছে?

খোঁচা দেবে গর্তে কেবা?
কেউটে সাপের ছোবল খেয়ে
রাজী হবে মরতে কেবা?

বার্তা শুনে স্তব্ধ থাকি
কাজ কী ওকে খুঁজতে গিয়ে
মারতে গেলে কাটবে না কি?

আমি বলি আর কী হবে?
গণেশ কিন্তু ভাবে কেবল
দেখা হবে আবার কবে।

স্বপন দেখে রাত্রিশেষে
জাতকেউটে আসছে তেড়ে
ভাগ্যে তখন সাইকেলে সে।

১৯৬৫

Book No——
Date ——

যুদ্ধযাত্রা

দাদু বলছে, যুদ্ধে যাব
দাদু কি তা পারে?
দাদু যে, মা, লুডো খেলতে
আমার কাছে হারে।

দাদু বলছে, যুদ্ধে যাব
লড়াই করতে নয়
দেখব ওরা কী করছে
আমি যে সঞ্জয়।

দাদু বলছে, যুদ্ধে যাব
অসি হাতে নয়
মসী দিয়ে লিখব আমি
জয় পরাজয়।

১৯৬৫

হাঁউ মাঁউ খাঁউ

বেড়াল আসেন রাত বারোটায়
বলেন, খেতে দাও।
মিয়াও মিয়াও মাও।

আর জন্মের মহাজন
বলেন, সুদ লাও।
মিয়াও মিয়াও মাও।

কী যে করি! নিদ্রা ছেড়ে
শয্যা থেকে উঠি।
রান্নাঘরে ছুটি।

কী যে আছে ওর জন্যে
দুধ ভাত না রুটি।
রান্নাঘরে জুটি।

বেড়াল চলেন ওসব ফেলে
হাঁউ মাঁউ খাঁউ।
মাছ কেন না পাঁউ।

বাজারে যে মাছ মেলে না
বুঝবে না মিয়াউ।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ।

১৯৬৬

কালো

এক যে ছিল কালো কুকুর ভালো কুকুর
নামটিও তার কালো।
কেউ কখনো ধরে না দোষ করে না রোষ
পাহারা দেয় ভালো।

একদা এক ময়ূর পেলুম নিয়ে এলুম
অপূর্ব তার রূপ।
বাগানেতে দিলুম ছেড়ে বেড়ায় সে রে
আপন মনে চুপ।

দিনের বেলা পেখম তুলে দুলে দুলে
ধ্বনি করে কেকা
সন্ধ্যা হলে গাছের ডালে গ্রীষ্মকালে
ঘুমিয়ে থাকে একা।

একদিন কে লম্ফ দিয়ে দাঁত বসিয়ে
ময়ূর করে জখম।
ওইটুকুতেই যায় সে মরে কী দুঃখ রে!
এমন কোমল রকম!

সবাই বলে, আর কে! কালো! ভারী ভালো!
তাড়াও মেরে আজই।
নয়তো ওকে ছালায় ভরো বিদায় করো
আর না ফেরে পাজী।

মালগাড়ীতে বন্ধ করে দিলুম ওরে
ছাতনা গাঁয়ে চালান।
ঢাকনা খুলে ছাড়বে ওকে রেলের লোকে
পালান, মশায়, পালান!

দুদিন বাদে চিত্ত দহে কন্যা কহে
খেতে কি আর পায় রে!
শেষটা ও কি পথের 'পরে পড়বে মরে
কী যন্ত্রণা! হায় রে!

পুত্ররাও বলেন, কালো ছিল ভালো
থাকত যদি বেঁচে!
আমি বলি, ময়ূর মেরে বাঁচবে কে রে
গেছে, আপদ গেছে!

এমন সময় বাইরে শুনি কী কাঁদুনি
আলো, জ্বালাও আলো
গিন্নীমায়ের পায়ের ধূলি মাথায় তুলি
লুটিয়ে পড়ে কালো।

দশটি মাইল এলো চলে কিসের বলে
কোথায় পেলো চিহ্ন!
গিন্নী বলেন, খাওয়াও ওকে ভুখে শোকে
বাছা আমার শীর্ণ।

১৯৬৭

বাদলা

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপ
বসে আছি চুপুর চাপ।
বাইরে যাব উপায় কী
সাঁতার দেব দু'পায় কি?
বান ডেকে যায় রাস্তাতে
কে ভাস্‌বি ভাস্‌ তাতে।
কে ভাসাবি নৌকা রে?

এই তো কেমন মওকা রে!
গাড়ী ঘোড়া গেল তল,
বাইক বলে, কত জল!
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
বাইরে গিয়ে মজা খুব।
খালি পায়েই জমাই পাড়ি
ঘুরে বেড়াই বাড়ী বাড়ী।

লেকের কোণায় হাঁটু জল
মাছ ধরছে ছেলের দল।
মাছ পড়েছে সরপুঁটি
এক কিলো না, এক মুঠি।
জল যদি না হয় পাতলা
ধরবে ওরা রুই কাতলা!

১৯৬৭

চমৎকার ও চমৎকার

ভিণ্টেজ কার বেড়ে মজা!
ভিণ্টেজ কার ক্যা বাহার!
ঘোড়ার গাড়ীর মতন ছিল
সেকালের সেই মোটরকার।
দু'হাত তুলে দিচ্ছি তালি
চমৎকার ও চমৎকার!
ওদিকে যে পকেট খালি
হাত সাফাই কখন কার!
অন্ধকার ও অন্ধকার!
দিনের আলো অন্ধকার।
ভিণ্টেজ ব্যাগ নিয়ে গেছে
গড়ের মাঠের পকেটমার।

১৯৬৮

খিচুড়ি

বর্ষার দিনে যদি খেতে পাই খিচুড়ি
তবে আর দরকার নেই কোনো কিছুরি।
খিচুড়ি!
খিচুড়ি!
নিয়ে এসো, দিয়ে যাও একথালা খিচুড়ি!

বলি বটে, কে না জানে আজকের হালচাল!
কোথা পাই গাওয়া ঘি, কোথা পাই ডালচাল!
খিচুড়ি!
খিচুড়ি!
চাইলে কি খেতে পাই একথালা খিচুড়ি!

১৯৬৮

হবুচন্দ্র রাজার

হবুচন্দ্র রাজার ছিল
হাতী হাজার হাজার, ছিল
ঘোড়া হাজার হাজার, ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
হবুগঞ্জ বাজার ছিল
দোকান হাজার হাজার ছিল
পসার হাজার হাজার ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

গবুচন্দ্র ওয়াজির ছিল
নবুচন্দ্র নাজির ছিল
অবুচন্দ্র কাজী ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
মোটা লোকের সাজা ছিল
রোগা লোকের খাজা ছিল
প্রজারা সব তাজা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
পাই পয়সা খাজনা ছিল
দুধভাত মাগ্‌না ছিল
ঘাম ঝরানো মানা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

১৯৬৮

মন কেমন করে

দিদু গেছে বাপের বাড়ী
অনেক যোজন আকাশ পাড়ি
মন কেমন করে।
আসতে বল তাড়াতাড়ি
মুনমুনি তান ধরে।

মুনমুনি সে ছোট্ট মেয়ে
বসে থাকে শূন্যে চেয়ে
মন কেমন করে।
আসবে উড়োজাহাজ বেয়ে
দিদু কখন ঘরে!

স্বপন দেখে দিদুকে সে
দিদু দাঁড়ায় সামনে এসে
মন কেমন করে।
খেলনা দিয়ে মিষ্টি হেসে
হাতদুটি দেয় ভরে।

১৯৬৯

কাঁকড়া

গাড়ী ঘোড়া গেল তল
পথে এখন অথই জল।
জাল ফেলছে মাছ ধরছে
জেলের মতো ছেলের দল!
ঘরের মাঝে থাকি বসে
বৃষ্টি পড়ে অবিরল।
হঠাৎ দেখি মেজের পরে
ঘুরে বেড়ান এ কোন্ জীব?
গুব্‌রে পোকা ভেবেছিলেম
হলেম পরে অপ্রতিভ।
আড়াআড়ি দশটি পায়ে
তাড়াতাড়ি চলেন জীব।
অবশেষে ঠাহর হলো
ইনিই কি সেই দশরথ?
রাজ্যহারা এ কোন্ রাজা
ঘরে ঘরে খোঁজেন পথ?
আহা, এঁকে দাও না ছেড়ে
কাদায় বসে গেছে রথ।

১৯৬৯

মাঞ্জা

ক্ষুদে নবাব খাঞ্জা খান্
সুতোয় মাখান মাঞ্জা
ঘুড়ির সঙ্গে ঘুড়ির লড়াই
কষতে হবে পাঞ্জা।

গেল রাজ্য গেল মান
ভেবে আকুল খাঞ্জা
মাথা যে তাঁর কাটা যাবে
বিফল হলে মাঞ্জা।

১৯৭০

ছাতা

কে বাঁচাবে আমার মাথা!
ছাতা আমাব। আমার ছাতা।
ও ছাতা, তোর হাতে ধরি
খরাতে তুই আমার ভ্রাতা
ও ছাতা, তোর পায়ে পড়ি
বর্ষাতে তুই আমার ত্রাতা।

ছাতা থাকতে ভাবনাটা কী
ছাতা আমার বাঁচায় মাথা!
(কিন্তু) হাওয়া দিলেই ছত্রভঙ্গ
সামলাবে কে আমার ছাতা?

১৯৭০

বেড়ালের স্বপ্ন

আবার যেন ফিরে গেছি শান্তিনিকেতন
আহা, শান্তিনিকেতন!
মাটির উপর শুয়ে আছি আধো অচেতন
আহা, আধো জাগরণ!
কখন এসে মাথার ধারে বসল আমার পুষি
আমার কবেকার সেই পুষি!
কোথায় ছিল নিরুদ্দেশ, দেখে হলেম খুশি
আহা, হলেম কত খুশি!
একটির পর আর একটি বসল কানের পাশে
আহা, বসল কানের পাশে!
সোনা আমার হারিয়েছিল, আপনি ফিরে আসে
আহা, আপনি ফিরে আসে!
দুটির পর একটি আরো, বসল গালের কাছে
আহা, বসল গালের কাছে!

টুঙ্কু আমার যায়নি মারা, আছে বেঁচে আছে
আহা, আজও বেঁচে আছে!
তিন বেড়ালে ভালোবেসে আদর করে কত
আমায় আদর করে কত!
চোখগুলি কী করুণ, যেন অনাথ শিশুর মতো
আহা, অনাথ শিশুর মতো!
এমন সময় কেমন করে স্বপন গেল কেটে
আমার স্বপ্ন গেল কেটে!
জেগে দেখি বুক যে আমার কান্নাতে যায় ফেটে
আহা, কান্নাতে যায় ফেটে!
হায় রে ওরা এসেছিল আমার তিনটি বেড়াল
আমার ভালোবাসার বেড়াল!
কেমন করে গেল সরে কতকালের আড়াল
আহা, কতকালের আড়াল।

১৯৭০

টিপু

এক যে ছিল টিপু, তার
কেউ ছিল না রিপু, তার
কেউ ছিল না রিপু
শ্বেত ভালুকের মতন লোম
নরম যেন শ্বেত পশম
এমনি ছিল টিপু।
জন্ম হিমাচলের মূলে
তিব্বতী সে জাতি কুলে
গয়লার দুলাল
বদনখানি কী রাশভারী
গড়নটিও তেমনি ভারী
সুলতানী তার চাল।
ভালোবাসে রাবড়ি ছানা
দই সন্দেশ মিহিদানা
নিরামিষেই রুচি।
সন্ন্যাসী কি সাধু যেমন
স্বভাবটিও ছিল তেমন
সাত্ত্বিক ও শুচি।
মাংস দিলে খায় না তা নয়
মাংসাশী জীব, জানে না ভয়
চোর ডাকাতের যম।
পাহাড়ী জীব কলকাতায়
থেকে থেকে ভড়কে যায়
ফাটলে পরে বম্।
ছিল না তার মোটরজ্ঞান
চলে পথের মধ্যিখান
বাঁচায় তার প্রভু।
ধীরে ধীরে চলন বন্ধ
থেকে থেকে শরীর মন্দ
ঘরেই জবুথবু!
হায়রে সাধের সারমেয়
তোর ক্ষতি কি পরিমেয়
ভোলা কি যায়, টিপু!
এক যে ছিল টিপু, তার
কেউ ছিল না রিপু, তার
কেউ ছিল না রিপু।

১৯৭১

কাটা কুটি খেলা

লেখো দেখি বাঘ।
বাঘ।
ব কেটে ছ করো
ঘ কেটে গ করো
হয়ে যাক ছাগ।
বাঘ, তুই ভাগ।
লিখেছ তো ছাগ।
ছাগ।
ছ কেটে ব করো
গ কেটে ঘ করো
হোক ফিরে বাঘ।
ছাগ, তুই ভাগ।

লেখো তো বানর।
বানর।
ব কেটে বাদ দাও
আ কেটে বাদ দাও
হয়ে যাক নর।
ভাগ রে, বানর!
লিখেছ তো নর।
নর।
ব ফের জুড়ে দাও
আ ফের পুরে দাও
ফিরুক বানর।
ভাগ ভাগ, নর।

১৯৭২

গুলফিকার

জুলফি রাখে জুলফিকার
কুলফি হাঁকে কুলফিকার
আমি ভাবি কোথায় আমার
ছেলেবেলার গুলফিকার।

শুনবে তবে এ সংবাদ?
বাল্যকালে ছিল আমার
কুলফি খাবার নিত্য সাধ।
বিত্ত কিছু ছিল না, হায়!
একটি দুটি পয়সা বাদ।

কুলফিওয়ালা আসত রোজ
চেঁছে চেঁছে যা দিত তা
নয়কো মোটেই মস্ত ভোজ!
মুখে দিতেই মিলিয়ে যেত
দুঃখ আমার কে নেয় খোঁজ!

জীবনে সে একটা দিন
কুলফিওয়ালা দিলদরিয়া
বলছে, "বাবু, নিন, নিন।"
পয়সা দিলে নেবে না সে
হাসবে শুধু একটু ক্ষীণ।

ঠাকুমার তো গালে হাত
"কুলফি এত পেলি কোথা!
দুই পয়সায় কিস্তিমাৎ।"
পাইপয়সাও নেয়নি শুনে
ঠাকুমা তো ভয়ে কাৎ!

উপরতলায় থাকেন তাঁর
এক যে দাদা, দেন না দেখা
কাউপুরের সেই জমিদার।
খট খট খট শব্দ ওঠে
শুনি ওটা গুলীর মার।

ছিল না তাঁর নেশার ঘোর
কুলফিখোরের দুঃখ বোঝেন
মহাশয় সেই গুলীখোর।
"আমিই ওটা দিয়েছি, বোন,
দোষ করেনি নাতি তোর।"
জুলফি রাখে জুলফিকার
কুলফি হাঁকে কুলফিকার
আমি ভাবি কোথায় আমার
সেদিনকার সেই গুলফিকার!
১৯৭২

বাঘের সঙ্গে দেখা

নাম তার চৈতন
ও পাড়ার একজন
চা খায় আমাদের বাড়ী সে।
গেজেট সে রোজ এসে
সেই জঙ্গল দেশে
খবর শোনায় রকমারি যে।
"রাতে যেতে যেতে একা
বাঘের সঙ্গে দেখা
বাঘ কিছু না বলেই চলে যায়।"
আমরা সবাই হাসি
"বাঘ না বাঘের মাসী
দেখেছিস কি না ঠিক বল, ভাই।"
"দেখিনি, মানছি তবে
রাতটা আঁধার হবে
কিন্তু শুনেছি আমি ডাক তার।
হালুম হালুম ডাকে
মালুম হয়েছে তাকে
দেখিনি যদিও রূপ বাঘটার।"
হেসে যাই গড়াগড়ি
বলি, "ভাই, পায়ে পড়ি
শুনেছিস শুনে লাগে সন্দ।"
"শুনিনি, মানছি তবে
সব মনে থাকে কবে
পেয়েছি আঁশটে তার গন্ধ।"
হেসে খাই লুটোপুটি
বলি, "পায়ে মাথা কুটি,
বল না কী হয়েছিল, ভাই রে।"
"শুঁকিনি, মানছি তবে
বোঝা যায় অনুভবে
বাঘ চলাফেরা করে বাইরে।"
১৯৭২

স্কাউট

এক যে ছিল স্কাউট!
খেলতে গেলে ফুটবল সে
করত খালি শাউট!
খেলতে গেলে ক্রিকেট সে
প্রথম বলেই আউট!
খেলতে গেলে হকী তার
প্রাণে বাঁচাই ডাউট!
১৯৪১

No.
১০৫

কলাভবন

রাঁচীধামে করলে গমন
দেখতে যাব তূর্ণ
নগেন দাদার কলাভবন
ষোলো কলায় পূর্ণ।
কোন্ কলাটা সিঙ্গাপুরী
কোন্‌টা যে মাদ্রাসী

চিনব বলেই মুখে পুরি
কোন্‌টা কানাইবাঁশি।
ষোলো রকম কলার তিনি
পরম অনুরক্ত
তাঁরই কথায় টিকিট কিনি
আমি কলার ভক্ত।

১৯৫৩

জন্মদিন

এই যে আমার ছোট্ট মেয়ে
থাকবে নাকো ছোট্ট আর
জন্মদিনে এই কথাটি
পড়বে মনে বারংবার।

বড় হবে লক্ষ্মী হবে,
দীর্ঘ জীবন হবে তার
দুষ্টুমি যে কোথায় যাবে
পড়বে মনে বারংবার।

হৈরে বাবুই হৈ

অন্নদাশংকর রায়

লাল টুক টুক

Book No.

লাল টুক টুক ছাতাটি
কালো কুচ কুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
সোনা রায়।

১৯৭৩

জলসা

ওই দ্যাখ, আসছেন রুরু
এইবার নাচ হোক শুরু।
রুরুবাবু নাচছেন
ঘুরে ঘুরে নাচছেন
সুরে সুরে নাচছেন
তালে তালে নাচছেন
তাক তাক ধিন ধিন
ধিন ধিন তাক
রুরুবাবু খান ঘুরপাক।
তারপর পড়ে যান ধপাস্।
সাবাস্! সাবাস্!

ওই দ্যাখ, আসছেন বিবি
তোরা সব গান জুড়ে দিবি।

হাম্পটি ডাম্পটি
স্যাট অন এ ওয়াল
লে আও ঢাল আর
লাও তরোয়াল
হাম্পটি ডাম্পটি
হ্যাড এ গ্রেট ফল
পড়েছে রে মরেছে রে
চল চল চল।
হাট্টি মাটিম টিম
ওরা মাঠে পাড়ে ডিম।
কান হলো ঝালাপালা
শেষ কর এই পালা
ভঙ্গ হোক সভা
বাহবা! বাহবা!

১৯৭৪

আদি যখন বড়ো হবে

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন হাতী।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
ওরাও হবে সাথী।
ওরা সাবই কী বলবে জানো?
"হাতী!
তোর গোদা পায়ের লাথি।
হাতী!
তোর পায়ে কুলের আঁটি।"

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন ঘোড়া।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
সঙ্গ নেবে ওরা।
ওরা সবাই কী বলবে জানো?
"ঘোড়া!
কেন চার পা তুলে ওড়া?
ঘোড়া!
চল দুলকি চালে থোড়া।"

১৯৭৬

ধিক্ ধিক্ ধিকারী

মুনু মুনু মুনিয়া
শিকারী নয় গো ওরা
ওই সব খুনিয়া।
মেরে মেরে করবেই
বাঘহারা দুনিয়া।

বাঘ ছিল ক্ষত্রিয়
বাঘ ছিল শ্রেষ্ঠ
বীরদের মধ্যে
বাঘ ছিল জ্যেষ্ঠ
মনে ভেবে ব্যথা পাই
বাঘের অদেষ্ট।

চিড়িয়াখানায় গেলে
বাঘ তুমি পাবে না
সুন্দরবনে আর
বাঘ দেখা যাবে না।
বাঘ শেষ হলে কি গো
কেউ পশতাবে না!

ধিক্ ধিক্ ধিকারী!
খুনিয়া ওদের বলে
ওরা নয় শিকারী!

১৯৭৩

ঝড়খালির বাঘ

বাঘা ঘুমোল পাড়া জুড়োল
শান্তি এলো দেশে

ঝড়খালীতে ঝড় থেমেছে
আটাশ দিনের শেষে।

১৯৭৪

বাঘকে বাঁচাও

বাঘের বংশ হচ্ছে ধ্বংস
বাঘের জন্যে ভাবি
বাঘকে হবে বাঁচাতে আজ
এই আমাদের দাবী।

বাঘের দেখা আর পাব কি?
বাঘের জন্যে ভাবি।
বাঘের শিকার চলবে না
এই আমাদের দাবী।

বাঘবন্দী খেল

ঘুমপাড়ানী গুলি মেরে
বাঘকে দিল ঘুম পাড়িয়ে
খাঁচায় পুরে রাত দুপুরে
বাঘকে দিল গাঁও ছাড়িয়ে।
খালে খালে নাও ভাসিয়ে
অনেকদূরে গেল নিয়ে
বনের মাঝে খাঁচা খুলে
বাঘকে দিল ফের জাগিয়ে।
বাঘ কি বোঝে ব্যাপারখানা
কোথা থেকে কোথায় আনা?
হায় বেচারা বাঘের ছানা
ফ্যালফেলিয়ে রয় তাকিয়ে।

বন্দী যদি করলে ওকে
লাভ কী হলো মুক্তি দিয়ে
শক লেগে আর নেশার ঘোরে
খাঁচায় গিয়ে রয় ঝিমিয়ে।
ওটা আরেক বাঘের থানা
সে বাঘ এসে দিল হানা
হায় রে বিকল বাঘের ছানা
মারা গেল জখম নিয়ে।
কত দিন সে পায়নি খেতে
রাখত তারে কে বাঁচিয়ে?
ধরলে কেন ছাড়লে কেন
বাঁচার খোরাক না জুগিয়ে?

১৯৭৪

টোগো

বাপের নাম বাচ্চা
মায়ের নাম মেরী আর
কান দুটি তার আচ্ছা
ভালো জাতের বাচ্চা
কালা ধলা টেরিয়ার।

নাম রাখা হয় টোগো
জাপানের সেই হীরো
ডাকে কেমন ঘো ঘো
মহাবীর টোগো
থাকে কেমন ধীর ও।

শেখাই ওকে সার্কাস
মুখে ধরাই লাঠি
খেলাঘরের চার পাশ
দেখাই কেমন সার্কাস
সঙ্গে নিয়ে হাঁটি।

সেদিন বেলা সাতটায়
লাঠি দিলেম মুখে
লাঠি ছেড়ে হাতটায়
সকাল বেলা সাতটায়
কামড় দিল ঠুকে।

হায় রে সে কী ঝকমারি
জলাতঙ্ক রোগ ও
আমার হলো ডাক্তারি
হায় রে সে কী ঝকমারি
মারা গেলো টোগো।

সবাই বলে, বিষেই
তোমার কী হয় দেখো
টোগোর সঙ্গে মিশেই
তোমায় ধরবে বিষেই
তুমিও এবার শেখো।

ভয়ে ভয়ে দিন যায়
পাগল না হই শেষটা
কসৌলী না পাঠায়
ভয়ে ভয়ে মাস যায়
সেকালে শেষ চেষ্টা।

বয়স ছিল বছর আট
টোগো ছিল সাথে
বেঁচে আছি বছর ষাট
চুকে গেছে খেলার পাট
দাগ রয়েছে হাতে।

১৯৭৪

সানী

বল যদি ছুঁড়ে দাও পুকুরে
সাঁতরিয়ে নিয়ে আসে কুকুরে
তেমন কুকুর ছিল জানি
নাম তার সানী।

খেলোয়াড় খেলা ভালোবাসত
দৌড়িয়ে লুফে নিয়ে আসত
খুব দূরে ছুঁড়ে দিলে ঢেলা
এ বেলা ও বেলা।

অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা
যদিও সে নয় পুরো সাচ্চা
হাঁক ডাক শুনে লাগে কম্প
চোর দেয় ঝম্প।

ছিল তার দেহে যত শক্তি
মনে ছিল তত প্রভুভক্তি
বিরাট, ভীষণ, তবু পোষা
বিপদে ভরোসা।

ভাব ছিল ছোটোদের সঙ্গে
লাফালাফি করে কত রঙ্গে
জানে না সে কোনো দুষ্টুমি
যাই বলো তুমি।

সেই সানী নেই আজ ভুবনে
দেখা আর হবে নাকো জীবনে
আহা, কত বিশ্বাসী প্রাণী
আদরের সানী!

১৯৭৫

বাহিনীর কাহিনী

শোন তবে কাহিনী
ঘেউ ঘেউ বাহিনী
আশে পাশে থাকে ওরা
বাড়ীতে বা রাস্তায়।

কারণ জানে না কেউ
একটা ডাকলে ঘেউ
সব ক'টা ডেকে ওঠে
মাঝ রাতে শোনা যায়।

মাটি হয় কাঁচা ঘুম
ভাবি এ কিসের ধুম
ডাকাত পড়েছে নাকি
আমাদের পাড়াটায়?

মনে হয় আমি উঠি
লাঠি নিয়ে ছুটোছুটি
করে দেখি ডাকাত কি
চোর যাতে না পালায়।

"চোর! চোর!" রব কোথা?
চার দিকে নীরবতা
জনমানবের সাড়া
কান পেতে মেলা দায়।
তা হলে কি সব ফাঁকি
অকারণ ডাকাডাকি
ডাকাত বা চোর নয়
ডেকে ওরা সুখ পায়?
১৯৭৩

বিন্দি

আমার কুকুর নয়
কুকুরের আমি
ও টানলে চলি, আর
ও থামলে থামি।

বাধ্য আমার নয়
তবু ও বিশ্বাসী
ভালোবাসে আমাকে ও,
আমি ভালোবাসি।

জবাব

শুনে হলেম খুশি
কুকুরের নাম পুষি।
আমার ভাই জগু
বেড়ালকে কয় ডগু।

বেঁজি ছিল ঘরমণি

শুনবে কেমন কেরামত?
সাপকে কেটে দু'খান করে
আবার করে মেরামত।
কত যে নামডাক তার
জন্তুকুলের বৈদ্য সে যে
সার্জন কি ডাক্তার।

লোকে বলে বেঁজি
বেঁজির গুণে মুগ্ধ আমি
নয় সে হেঁজিপেঁজি।
বেঁজি ছিল ঘরমণি
ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়
কী খোঁজে সে? সর ননী?

সারাটা ক্ষণ ছটফট
ধরে এনে আদর করি
পালিয়ে যাবে চটপট।
বেশী ঘাঁটাই, কামড়ায়
দাঁতের ধার কী সর্বনেশে
রক্ত বেরয়, হায় হায়!

বেঁজি তো নয়, পাজী।
ইচ্ছে করে শেকল দিয়ে
বাঁধি তারে আজই।
সবাই বলে, না। না।
অমন করে বেঁজি পোষা
শাস্ত্রে আছে মানা।

বেঁজি পোষা কী দায়!
অবশেষে বাইরে নিয়ে
দিতেই হলো বিদায়।

১৯৭৩

পিপীলিকার ভ্রমণকাহিনী

পিঁপড়ে গেলেন বৃন্দাবন
পিঁপড়ে গেলেন কাশী
পিপঁড়ে গেলেন হরিদ্বার
প্রয়াগ আর ঝাঁসী।
ঘরের ছেলে এলেন ঘরে
হলেন গৃহবাসী।

তখন তাঁকে ঘিরে ধরে
পিপীলা বাহিনী
ঘরকুনোরা শুনতে চায়
ভ্রমণকাহিনী।
বলেন তিনি, "যেখানে যাই
চিনি কেবল চিনি!"

একমাত্র ঠাকুরমা-ই
বুঝলেন এর মানে
পিঁপড়ে ছিল বন্দী হয়ে
কৌটোর মাঝখানে।
কৌটো ছিল পেড়ীর মধ্যে
একান্ত সাবধানে।

চায়ের সময় খোলা হতো
চায়ের পরেই বন্ধ
চিনির তলায় কে যে আছে
কেউ করে না সন্দ।
পিঁপড়ে থাকে সমস্তক্ষণ
চিনির রসে অন্ধ।

১৯৭৫

ধাঁধা

কে যেন বলেছিল, "ঠিক ঠিকই?"
টিকটিকি! টিকটিকি! টিকটিকি!
কার যেন কে ছিল বাবর শা?
মাকড়সা! মাকড়সা! মাকড়সা!

কে যেন চুষে খায় কার খোকা?
ছারপোকা! ছারপোকা! ছারপোকা!
সাবাড় করে কে খেয়ে চাল চুলা?
আরসুলা! আরসুলা! আরসুলা!

ব্যাঙ্ কাকে বলেছিল, "ঘর নিকা?"
চামচিকা! চামচিকা! চামচিকা!
বর্ষায় কে করে ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্?
কোলাব্যাঙ্! কোলাব্যাঙ্! কোলাব্যাঙ্!

প্যাঁক প্যাঁক করে কে হাঁসফাঁস?
পাতিহাঁস! পাতিহাঁস! পাতিহাঁস!
ওত পেতে কে রয়েছে, ওরে বাপ!
সাআআপ! সাআআপ! সাআআপ!

১৯৭৩

অবাক চা পান

এক যে ছিল হাবু।
তার যে ছিল ভাইটি, ওর
নামটি ছিল লাবু।
বাবার যিনি বাবা, তাঁকে
ডাকত বাবাবাবু।

বিকেলবেলা নিত্য
চায়ের আসর জাঁকিয়ে বসা
বাবাবাবুর কৃত্য।
জুটত পাড়ার ছেলেবুড়ো
মনিব আর ভৃত্য।

গণতন্ত্র খাঁটি।
কারো হাতে মাটির খুরি
কারো পাথরবাটি।
কারো হাতে পেয়ালা আর
পিরিচ পরিপাটি।

কেই বা থাকে বাকী?
কুত্তাও খায় চেটেপুটে
বিল্লীও চা-খাকী।
দাঁড়ে বাঁধা বুড়ো তোতা
সেও চা-খোর পাখী।

হাবু আর লাবু
জ্বর হলেও খাবে নাকো
বার্লি আর সাবু।
তাদের জন্যে চা বানাবেন
বাবার যিনি বাবু।

বিদ্যে তো লাস্ট কেলাস
চায়ের জন্যে তাদের কিনা
এনামেলের গেলাস।
বন্ধু যারা আসত তারা
গেলাস দেখেই জেলাস।

পাশের বাড়ীর খুড়ো
আফিং খেয়ে নেশার ঘোরে
আসতেন সেই বুড়ো।
তাঁর হাতে এক কাঁচের গেলাস
আধসেরটাক পুরো।

ক'রে, তোরা ক'!
সুধান তিনি, বর্ণমালায়
ক'টা আছে স?
তিনটে আছে, দু'ভাই বলে,
শ, ষ, স।

উঁহু! উঁহু! উঁহু!
তাকান তিনি মিটিমিটি
হাসেন মুহু মুহু।
বিদ্যেসাগর পড়িস্ বুঝি?
হা হা! হি হি! হু হু!

ক'রে, তোরা ক'
বানান করে গোটা গোটা
গে...লা...স...।
ইংরিজীটা শিখলে পরে
চারটে হবে স!

১৯৭৫

আধমণী কৈলাস

আধমণ চাল তার
  এক থালা ভাত
কে খায়? কে খায়?
  কৈলাসনাথ।
আধমণী কৈলাস
  খায় আর কী?
একসের আন্দাজ
  ভঁয়সা ঘি।
ঘি দিয়ে ভাত খায়
  সঙ্গে কী এর?
অড়হর ডাল খায়
  চার পাঁচ সের।
এতেই কি পেটুকের
  পেট ভরে যায়?
ঝোল ঝাল অম্বল
  মিষ্টিও খায়।
নিরামিষভোজী ছিল
  ডাইনোসর
তেমনি এ যুগে এই
  কৈলাসর।
আজকাল এই জীব
  বাঁচবে কেমনে?
এ বাজারে খাবে কী এ?
  কী পাবে রেশনে?
এরই খোরাকে বাঁচে
  ত্রিশজন লোক
তাই আমি এর তরে
  করব না শোক।

১৯৭৪

হিংসুটে

পিসী, তুমি মাসী কেন হবে!
  তোমায় ওরা ডাকছে কেন মাসী?
পিসী, তুমি ওদের মাসী হলে
  কেমন করে তোমায় ভালোবাসি!
হিংসুটে!
  সবাই ওরা হিংসুটে
  আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
  পিসী তুমি, নও মাসী।

পিসী, তুমি মামী কেন হবে!
  তোমায় ওরা ডাকছে কেন মামী?
পিসী, তুমি ওদের মামী হলে
  কেমন করে ভালোবাসি আমি!
হিংসুটে!
  সবাই ওরা হিংসুটে
  আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
  পিসী তুমি, নও মামী।

পিসী, তুমি কাকী কেন হবে!
  তোমায় ওরা ডাকছে কেন কাকী?
পিসী, তুমি ওদের কাকী হলে
  কেমন করে পিসী বলে ডাকি!
হিংসুটে!
  সবাই ওরা হিংসুটে
  আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
  পিসী তুমি, নও কাকী।

১৯৭৪

নাও ভাসান

প্রথম যেদিন নামে ঢল
নয়ানজুলিতে আসে জল।
বাড়ীর সামনে দেখি ·
বাঃ ভোজবাজি এ কি!
নদী বয়ে চলে কলকল
বাড়ীর সামনে হাঁটুজল।

কাগজকে কেটে করি চৌকা
বানাই সাধের যত নৌকা।
তারপর কৌশলে
ভাসাই নদীর জলে
ছেলেবেলা সে কেমন মওকা
লাল নীল কাগজের নৌকা।

কিছুদূর গিয়ে নাও টোল খায়
আরো দূরে আরেকটা ওলটায়!
নয়ানজুলির জলে
সপ্ত ডিঙা চলে
একটি কি পৌছবে লঙ্কায়?
বুক করে দুরু দুরু শঙ্কায়।

আমিও যেতুম চলে সঙ্গে
বাইতে বাইতে তরী রঙ্গে।
তখন ছোট্ট আমি
দোরগোড়াতেই থামি।
জল কাদা মাখি সারা অঙ্গে।
বড়ো হলে চলতুম সঙ্গে।

১৯৭৫

সাঁতার

ধন্যি তোমার বুকের পাটা
সন্ধে সকাল সাঁতার কাটা!
দাদা,
রাত্তিরে দেয় গায়ে কাঁটা।

ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
তোমার সঙ্গে কেউ কি পারে।
চাচা,
আপনা বাঁচাই দীঘির ধারে।

স্রোত নেই যার সে তো ডোবা
কাপড় কাচে ঝণ্টু ধোবা
সেথায়
সাঁতার কাটা পায় কি শোভা!

দূরে আছে বহতা নদী
দাদা যাবেন সেই অবধি
সাথে
আমরাও যাই, ডোবেন যদি!

ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
দাদা গেলেন চোখের আড়ে।
"দাআ-দাআ"
সাড়া না পাই সে চিৎকারে।

বুদ্ধি খেলে যায়·রে মাথায়
দেখতে হবে দাদা কোথায়।
হঠাৎ
উঠে বসি বিদেশী নায়।

দাদা ভাসেন আমরা ভাসি
কাছাকাছি যখন আসি
তখন
দাদার মুখে ফোটে হাসি।

দাদা বলেন, বাঁচালি ভাই
ভবনদীর কিনারা নাই।
ভাবি
পরলোকে হবে কি ঠাঁই!

মাঝিরা দেয় পৌঁছে ডাঙায়
দাদা তখন দু'চোখ রাঙায়।
হাঁ রে!
এরই জন্যে টাকা কে চায়!

ফিরে চল দীঘির টানে
দাদা বলেন কানে কানে।
বাব্বা!
আমারও ধড় ফিরল প্রাণে।

১৯৭৬

চুপ চাপ হাপ

এই খেলাটার নিয়ম এই
তুই আমাকে ধরবি যেই
মারব আমি লাফ
চুপ চাপ হাপ।

তুইও আমার সঙ্গ নিবি
তেমনি জোরে লম্ফ দিবি
দুপ দাপ দাপ
চুপ চাপ হাপ।

তখন আমি ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাব অনেক দূরে
ধাপের পর ধাপ
চুপ চাপ হাপ।

তুইও তখন ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাবি অনেক দূরে
ঝাঁপের পর ঝাঁপ
চুপ চাপ হাপ।

এবার আমি ঘুরব বাঁয়ে
লাফিয়ে যাব এক এক পায়ে
লাগবে পায়ে কাঁপ
চুপ চাপ হাপ।

তুইও তখন ঘুরবি বাঁয়ে
লাফিয়ে যাবি এক এক পায়ে
ছাড়বি শেষে হাঁফ
চুপ চাপ হাপ।

১৯৭৩

পিং পং

পিং পং
কালিমপং।
ডিং ডং
কালিমপং।

কিং কং
কালিমপং।
সিং সং
কালিমপং।

টিং লিং
দার্জিলিং।
মিং লিং
দার্জিলিং।
শিং লিং
দার্জিলিং।
জিং লিং
দার্জিলিং।

অং বং
কার্শিয়ং।
টং ঠং
কার্শিয়ং।
ডং ঢং
কার্শিয়ং।
রং চং
কার্শিয়ং।

Book No——
Date ——

তাসের আড্ডা

খেলব না তো গোলামচোর,
সবাই তোরা চালাক ঘোর
গোলাম ধরাস্ হাতে।
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
থাকে আমার সাথে।

খেলব না তো গাধার ব্রে
ভুলেও তোরা টানিস্ নে
পেলে আমায় দিবি
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
ইস্কাবনের বিবি।

১৯৭৩

হাসির বাহার

হো হো হাসি কখন হাসে?
বলটা যখন পায়ে আসে।
হা হা হাসি কখন হাসে?
বল ছুটে যায় গোলের পাশে।

হি হি হাসি কখন হাসে?
বলটা যখন ফিরে আসে।
হে হে হাসি কখন হাসে?
চোখটা যখন জলে ভাসে।

১৯৭৪

শতরঞ্জ

কী নাম হে?
হরি ভঞ্জ।
বাড়ী কোথা?
হবিগঞ্জ।

খেলাটা কী?
শতরঞ্জ।
কেন এ খেল্?
আমি খঞ্জ।

১৯৭৫

ব্যাকরণ

গোঁয়ার আমি, গোঁয়ার তুমি
করছি, দাদা, গোঁয়ার্তুমি।
বাঁদর তুমি, বাঁদর আমি
করছি, ভায়া, বাঁদরামি।

ভাগ্য

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধম্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে বিখ্যাত।
জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।
বৃহস্পতিবারে জাত
বিদ্বান বলে জ্ঞাত।
জন্ম শুক্কুরবার
আলো করে রূপে তার।
শনিবারে জন্মায়
ধনী হয়ে মান পায়।

১৯৭৩

নাই মামা ও কানা মামা

নাই মামা বললেন
কানা মামাকে,
"ভাগনে ভাগনী নাই
তাই আমাকে
সংসারে মামা বলে
কেউ না ডাকে।"

কানা মামা বললেন
নাই মামাকে,
"চোখ যার নাই তার
কী হবে ডাকে!
মামা হওয়া মিছে, যদি
চোখ না থাকে!"

১৯৭৫

কখনো না

ভবী কখনো ভোলে?
না।
হাতী কখনো ঢোলে?
না।
তিমি কখনো ঝোলে?
না।

বট কখনো দোলে?
না।
জট কখনো খোলে?
না।

১৯৭৩

হুকুম

এই ছোকরা!
আলুবোখরা
আখরোট কিসমিস .
চার পয়সায়
যা নিয়ে আয়
না আনলে—ডিসমিস।

১৯৭৩

দু' চক্ষের বিষ

ভালো লাগে কী কী
শুনবি তো শোন তা
ভালো লাগে টক ঝাল
ভালো লাগে নোনতা।
দুই চক্ষের বিষ
যত সব মিষ্টি
দুই চোখ বুজে তাই
খাই ওই বিষটি।

১৯৭৩

চুকলি

বুঁচকি, ও বুঁচকি!
তোর ওই পুতুলটা
কেন এত পুঁচকি!
টুকলি, ও টুকলি!
পুতুলের নামে কেন
করছিস চুকলি।

১৯৭৩

জাপানেতে যাও যদি

হাসিহাসি তাকাহাসি
বাড়ী তাঁর কিয়োতো।
জাপানেতে যাও যদি
খোঁজ তাঁর নিয়ো তো।
হয়তো বা ভুলে গেছি
বাড়ী তাঁর তোকিয়ো
তোকিয়োতে গেলে তুমি
গাড়ীটাকে রোকিয়ো।

১৯৭৩

আলাদীন

বিজলীর ধারা এই
এই আছে এই নেই
এর চেয়ে মোমবাতি ভালো
জ্বালো জ্বালো হারিকেন জ্বালো।
করুক না টিমটিম
তেলে ভরা পিদ্দিম
রাতভর সেও দেয় আলো।
জ্বালো জ্বালো পিদ্দিম জ্বালো।

পেতলের দীপ বেচে
আলাদীন ঠকে গেছে
যাদুকর দিয়ে গেছে ফাঁকি
ভোগার কী আর আছে বাকী!

কাঁদে বসে আলাদীন
ডাকলে না আসে জিন
সুইচ টিপলে কই আলো
সোনার প্রদীপ কিসে ভালো!

সুইচ টিপলে হাওয়া
আর তো যায় না পাওয়া
গরমে যে তিষ্ঠানো দায়
আলাদীন করে হায় হায়!

কিনে আনে হাতপাখা
দাম দেয় এক টাকা
হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খায়
হাড়ে তার বাতাস লাগায়।

১৯৭৪

আর একটি তারা

পাঁজিতে এক সুদিন দেখে
মহাশূন্যে চলছ কে কে
রকেট চেপে দিচ্ছ কবে পাড়ি!
আমাকে, ভাই, সঙ্গে নিয়ো
ইচ্ছে করে যাই আমিও
বানাই গিয়ে আসমানে এক বাড়ী।

এখানে আর যায় না থাকা
কোথাও নেই জায়গা ফাঁকা
গা মেলবার পা ফেলবার ঠাঁই।
রাস্তা ছিল, তাও খোঁড়া
তলিয়ে যাবে গাড়ী ঘোড়া
মাঠ ছিল, তা দালানে বোঝাই।

মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
বাইরে করে হাঁটাহাঁটি
মাটি বিনাই মহাকাশচারী।
তাই যদি হয় চল না, ভাই,
ফুটবলটাও নিয়ে যাই
বিনা মাঠেই ছুটব পিছে তারই।

মহাশূন্য খোলামেলা
মহানন্দে করব খেলা
পদে পদে বাধা দেবে কারা?
এখান থেকে হবে মনে
রাতের বেলা দূর গগনে
বাড়ী যেন আর একটি তারা।

১৯৭৩

ইন্দ্রলুপ্ত

তাঁর গোঁফজোড়াটি পাকা
তাঁর মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত।
তিনি শম্ভুনাথের কাকা
তিনি অম্বুনিধি গুপ্ত।
ছিল বয়সকালে বাবরি
পরে সাবেককালের পাগড়ি
এখন পরচুলাতে ঢাকা
তাই বাসনা সব সুপ্ত।
তবু টাক থাকলে ঢাকা
হোক হিংসুকেরা চুপ তো!

১৯৭৬

Book No.
Date

রাঙা মাথায় চিরুনি

কিস্‌সা কাঠবিড়ালীকা

নাতনী এলেন কটক থেকে
সঙ্গে হলো আনা
ক্ষীরী? পিঠে? নাড়ু? খাজা?
না না না না না না।
ছোট্ট বাঁশের টুকরিতে ওই
কী আছে অজানা?
চমকে উঠি ঢাকা খুলে—
কাঠবিড়ালীর ছানা।
গাছের ডালে বাসা ওদের
ছিল সেথায় খাসা
কেমন করে ঘটল যে তার
নালার জলে ভাসা।
কারো চোখে পড়েনি, কাক
পায়নি নিশানা
আহা! ও কি বাঁচত! ওই
কাঠবিড়ালীর ছানা।
নাতনী ওকে কুড়িয়ে নিয়ে
ফিরিয়ে দিল ডালে
ডাল থেকে সে আবার পড়ে
কী ছিল কপালে!
ঘরের ভিতর পাতা হলো
মশারি বিছানা
বেড়াল যাতে তুলে না নেয়
কাঠবিড়ালীর ছানা।
নাতনী এলেন কলকাতায়
দেখবে ওকে আর কে?
তাই তো ওকে আনতে হলো
যোধপুর পার্কে।
চোখে চোখে রাখেন ওকে
গোপন ঠিকানা
বিন্দি কুকুর যেন না পায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

দুধ দিলে ও খাবে নাকো
যদি না দাও চিনি
ফীডিং বটল চুষে চুষে
দুধু খাবেন তিনি।
পাঁউরুটির নরম শাঁস
হয়েছে ওঁর খানা
শুনছি এখন খই দিলে খান
কাঠবিড়ালীর ছানা।
হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেল
খুঁজে খুঁজে সারা
ঘরে তখন লোডশেডিং
কে দেবে পাহারা!
আলো জ্বলতে পাওয়া গেল
লুকানো আস্তানা
ট্রাঙ্কের পেছনে ছিল
কাঠবিড়ালীর ছানা।
ক'দিন বাদে নাতনী আবার
কটক ফিরে যাবে
কেমন করে পুষবে ওকে
এই কথা সে ভাবে।
এমন কিছু শক্ত নয়
পোষ মানালে মানা
কিন্তু ও যে দুষ্টু বেজায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।
কুট করে দেয় কামড়, যেন
আঙুলটা বিস্কুট
একটুখানি ফাঁক যদি পায়
তক্ষুনি দেয় ছুট।
চঞ্চল সে উড়ে যেত
থাকত যদি ডানা
খাঁচায় ভরে যায় কি পোষা
কাঠবিড়ালীর ছানা?

গাছের ডালেই বাসা ওদের
সেইখানে ও যাবে
ফিরে গেলেই ফিরিয়ে দেবে
নাতনী আমার ভাবে।
ছড়িয়ে রাখা হবে রোজ
চাল ডাল দানা
আপনি খাবে খুঁটে খুঁটে
কাঠবিড়ালীর ছানা।

বড়ো হয়ে থাকবে তখন
কী করবে কাকে?
চুলবুলিয়ে পালিয়ে যাবে
ফাঁকিবাজ এক ফাঁকে।
পাড়ার কুকুর আসবে তেড়ে
বেড়াল দেবে হানা
ল্যাজটি তুলে লাফিয়ে ফেরার
কাঠবিড়ালীর ছানা!

১৯৭৮

ছোট্ট ঘোড়সওয়ার

টাট্টু ঘোড়া! টাট্টু ঘোড়া!
তা ধিন তা ধিন!
কোথায় তোমার লাগাম, ঘোড়া
কোথায় তোমার জীন!
রেকাব তোমার কোথায়, ঘোড়া
চেহারা মলিন!

টাট্টু ঘোড়া! টাট্টু ঘোড়া!
নাকে পরাই দড়ি
রুমাল পেতে রাখি পিঠে
লাফ দিয়ে চড়ি!
কদম চালে চলো, ঘোড়া
গড়িয়ে না পড়ি!

খোকাবাবু! খোকাবাবু!
দুঃখ শোন, দাদা
মালিক আমার বলে কিনা
ঘোড়া তো নয়, গাধা।
দেয় না দানা দেয় না চানা
গতর হলো আধা।

খোকাবাবু! খোকাবাবু!
তা ধিন তা ধিন!
খাসা তোমার লাগাম, খোকা
খাসা তোমার জীন।
দানাপানি পেলেই, খোকা
চলব সারাদিন।

১৯৭৭

বাঘের গন্ধ পাঁউ

শোন, শোন, দাদা
গোরুকে যে গোরু বলে তার নাম গাধা।
শোন, শোন, ভাই।
সেবার কেমন করে প্রাণে বেঁচে যাই।
গোরুর গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি তখন
পথের দু'ধারে দেখি বন আর বন।

আধো ঘুমে আধো জেগে রাত্রি আঁধার
দূর থেকে ভেসে আসে গন্ধটা কার?
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান, কিসের এ গন্ধ?
নাম করবা না, খোকা, নাক করো বন্ধ।
দূর থেকে শোনা যায়, হয় যে মালুম
ওটা কি মনের ভ্রম, হালুম হালুম।
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান, কাকে করো সন্দ?
নাম করব না, খোকা, কান করো বন্ধ।
গোরু দুটো বোঝে সবই, দুদ্দাড় দৌড়
কে যেন করেছে তাড়া ডাকাত কি চৌর।
ঝাঁকুনির চোটে আমি যাই গড়াগড়ি
এই আসে, এই ধরে, সেই ভয়ে মরি।
দশটি মিনিটে পার দু'মাইল পাকা
ও দুটি মাইল ছিল বাঘের এলাকা।
খোকাবাবু, খোকাবাবু, কেটে গেছে মন্দ
আওয়াজ মিলিয়ে গেছে, মিলিয়েছে গন্ধ।
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান. খুলে দাও পাক
জল দাও, জাব দাও, ওরাও জুড়াক।

Book No---
Date ---
2887

১৯৭৭

আমের দিনে আমভোজন

আমের দিনে আমভোজন
জামের দিনে জামভোজন
গাছের ডালে গা ঢাকা দাও
খাও টপাটপ সাত ডজন।
সাত ডজন কি আট ডজন
আট ডজন কি দশ ডজন।
সঙ্গে রেখো নুন লঙ্কা
চালাও সুখে রামভোজন।
খোকা কোথায় খোকা কোথায়
পাড়ায় পড়ুক খোঁজখোঁজন।
কেউ জানে না কেউ ভাবে না
গাছে গাছেই রয় ও-জন।

দিনের শেষে পড়ায় বসে
ঢুল ঢুল ঢুলুনি
কানমলাটা দিলে কষে
দোল দোল দুলুনি!
খাবার ডাক আসার আগে
নাকের ডাক কানে লাগে
খাবার যত কেমন যেন
সব কিছুই আলুনি।
কেউ জানে না কেউ ভাবে না
পেট ভরেছে আমভোজন
আমভোজন না জামভোজন
জামভোজন না রামভোজন।

১৯৭৬

আমার ঘরে আমি রাজা

আমার ঘরে আমি রাজা
তোদের তাতে কী?
খাচ্ছি কেমন তিলে খাজা
তোদের তাতে কী?
ফুলুরি আর বাদাম ভাজা
তোদের তাতে কী?

চৌকি আমার সিংহাসন
তোদের তাতে কী?
হাবলু গাবলু সভাজন
তোদের তাতে কী?
পুষি বাঘা প্রজাগণ
তোদের তাতে কী?

দিগ্‌বিজয়ে যাবেন রাজা
তোদের তাতে কী?
দুশমনদের দেবেন সাজা
তোদের তাতে কী?
বাজা, বাজা, বাদ্যি বাজা
জয় মহারাজকী।

১৯৭৮

রাজার বিচার

দাদা,
টোকাটুকি করো কেন
উপায় তো শাদা।
শুনবে কী করেছিল
সাঁউটিয়ার গাধা।

বাল্যে প্রতাপগড়ে
ছিল কত সুখ
বিজয়ার দিন কতো
ক্রীড়াকৌতুক।
রাজাপ্রজা সব্বাই
সম উৎসুক।

ঘোড়াদৌড়ের মজা
হেথায় হোথায়
গাধার দৌড় কেউ
দেখবে কোথায়?
গাধা ধরে নিয়ে আসে
পিঠে চড়ে ধায়।

সাঁউটিয়া ঝাড়ুদার
রুক্ষ মেজাজ
গাধার সওয়ার হওয়া
নয় তার কাজ।
পুরস্কারের লোভে
করে সেটা আজ।

গাধারা এগিয়ে যায়
কদম কদম
সকলেই গাধা তবু
কেউ বেশী কম!
সাঁউটের গাধাটাই
অন্যরকম!

নড়বে না চড়বে না
খাড়া থাকে ঠায়
সাঁউটিয়া রেগে মেগে
ধমক লাগায়
তাতেও হয় না ফল
জোরে চাবকায়।

পুরস্কারের বেলা
উল্টো বিচার
সাঁউটিয়াকেই রাজা
দেন উপহার!
গাধাতম গাধা সে-ই
ও যার সওয়ার।

১৯৭৮

আগুন! আগুন!

রাত বারোটা
কাঁচা ঘুমটা হয়নি পাকা
পালং থেকে
লম্ফ দিলেন নাগরা কাকা।
পাশেই গোয়াল
শোর তুললেন, আগুন! আগুন!
তন্দ্রাঘোরে
বাবা শুনলেন, জাগুন! জাগুন!
ঘুম ছুটে যায়
চেয়ে দেখি চালের কোণে
সিঁদুর ফোঁটা
বাড়ছে যেন ক্ষণে ক্ষণে।
আঁধার ঘরে
আলোর লহর দেখতে খাসা
কিন্তু ও যে
এক নিমেষেই পোড়ায় বাসা।
এক দৌড়ে
এক কাপড়ে পালাই দূরে
লেপ কম্বল
সব সম্বল যায় রে পুড়ে।
টিলার উপর
দেখি বসে শীতে কাতর।
আগুন কেমন
লাফ দিয়ে যায় ঘর থেকে ঘর।
বাঁশ ফটাফট
হাম্বা হাম্বা গোরুর কাঁদন
ক্ষিপ্র হাতে
কাকা কাটেন গলার বাঁধন।
কেউ বা ছোটে
জল আনতে কুয়োর কাছে
কেউ বা হানে
ডালসুদ্ধ কলাগাছে।
পাড়ার লোকের
উপায় কত চেষ্টা কত
আগুন তবু
হয় না তাতে পরাহত।
পৌষমাসেই
ঘটে কারো সর্বনাশ
মানুষ বাঁচে
বাঁচে না তার বসন বাস
বাবা আমার
লড়তে লড়তে কী হায়রান।
কাকা আমার
পাগল হয়ে বুক চাপড়ান।
ছাড়া পেয়ে
বর্তে গেছে অন্য সবাই
কিন্তু আহা!
বাঁচেনিকো কয়েকটি গাই।
ভস্ম গোয়াল
আছে শুয়ে জ্যান্ত ধরন
ছায়া ধেনু
ছাই দিয়ে তার কায়ার গড়ন।

১৯৭৭

পিণ্ডারী না ঠগী

খেলার মাঠে সন্ধ্যা নামে
থামে ছেলের দল
ভগী তাদের ক্যাপটেন, তার
বগলে ফুটবল
বাড়ীর পথে মার্চ করে—
"চল রে চল রে চল।"

চলতে চলতে শ্যাওড়াতলায়
শুনতে পেলো হাবু
মনিষ্যি না ভূত কে যেন
বলছে "ইয়ে বাবু।"
আঁধারে মুখ যায় না দেখা
হাবু ভয়ে কাবু।

দৌড়! দৌড়! হাবুর দৌড়!
তাকে থামায় যারা
"থামো! থামো!" বলেই ছোটে
হাবুর পিছে তারা।
"ইয়ে বাবু! শালাই হ্যায়!"
শুনছে তখন কারা?

বাড়ী ফিরেই তর্ক শুরু,
"মনিষ্যি না ভূত।"
সেটা কিন্তু বাতির আলোয়
শোনায় অদ্ভুত।
মনিষ্যি তা মানে সবাই
তবুও খুঁতখুঁত।

দাদা ছিলেন পুঁথিপোড়ো
বলেন, "ওরে ভগী,
প্রশ্ন হলো আসলে সে
পিণ্ডারী না ঠগী?
ছেলে ধরার জন্যে কি তার
ছিল বাঁশের লগী!"

আমরা সেবার তরাসে যার
বীরের মতো পালাই
রাত্তিরে সে বেচে বেড়ায়
কুলফিবরফ মালাই।
হাতের কুপী নিবে গেলে
চায় সে দিয়াশালাই।

১৯৭৭

সমুদ্রস্নান

কেষ্টবাবুর সাগরস্নান
সে যেন এক অভিযান।
কেষ্টবাবু!
জলের থেকে বহুৎ দূরে
বসেন তিনি হাত পা মুড়ে।
কেষ্টবাবু!
বালুর উপর ব্যারিকেড
তাঁরই সেটা রেডিমেড।
কেষ্টবাবু!

দলের সবাই ঝাঁপায় জলে
ঢেউ খায় আর সাঁতরে চলে।
আর কেষ্টবাবু!
ভিজে বালু মাথায় ছোঁয়ান
এই তো কেমন সমুদ্রস্নান!
কেষ্টবাবুর!
হঠাৎ আসে কূলছাপা ঢেউ
রুখতে তারে না পারে কেউ।
আহা কেষ্টবাবু!

যান বেচারি গড়াগড়ি
আমরা করি ধরাধরি।
হায় কেষ্টবাবু!
"ভেসে গেলুম! ডুবে গেলুম!
নাইতে এসে কী সুখ পেলুম!"
ক'ন কেষ্টবাবু!

পা ডোবে না, গা ডোবে না
ঢেউ ফিরে যায় মাখিয়ে ফেনা।
কেষ্টবাবু!
"জামা ভিজে! কাপড় ভিজে!
এখন আমি করি কী যে!"
বলেন কেষ্টবাবু।

১৯৭৭

চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রা

ঘোটকবাহন! ঘোটকবাহন!
কোথায় তোমার যাওন?
যমুনোত্রী দেখন আর
গঙ্গোত্রী পাওন।
বাঁয়ে তোমার পাহাড় খাড়া
ডাইনে তোমার খাদ
বাহন তোমার হড়কালে পা
ঘটবে যে প্রমাদ।

বাহন আমার খুব হুঁশিয়ার
টিপে টিপে যাওন
দিনের শেষে চটিঘরে
বিরিয়ানি খাওন।

ঘোটকবাহন! ঘোটকবাহন!
হায় কী হলো ওই!
ঝুলছ তুমি গাছের ডালে
বাহন তোমার কই!

বাহন আমার হঠাৎ কেন
চিঁহি করে ধাওন
মাথার উপর গাছের ডাল
ভাগ্যে হাতে পাওন!
ঘোটকবাহন! ঘোটকবিহীন
লাগছে কী রকম?
পাই কি না পাই রাতের খাওন
মোরগ মোসল্লম!

১৯৭৮

করিৎ কর্মা

করিৎ কর্মা
সরিৎ শর্মা
তাঁর যে সঙ্গী
হরিৎ বর্মা
তাঁর যে সেবক
লোলচর্মা
চললেন এঁরা

অ্যাডভেনচারে
সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে
বারবেলা এক বিষ্যুৎবারে।
চললেন এঁরা
পালতোলা নায়ে
কখনো ডাইনে
কখনো বা বাঁয়ে

কভু খালি পেটে
কভু খালি গায়ে।
এখনো মেলেনি
সঠিক খবর
জয় হয়েছে কি
হয়েছে কবর
ফিরে আসছেন
কি না নিজ ঘর।

১৯৭৭

কাকতালীয়

গাছ ছিল ডাল ছিল
কাক ছিল তাল ছিল
কাক বলে, কা কা
পড়ে যা। পড়ে যা।
ঢিপ করে তাল গেল পড়ে।

তাল ছিল লাল ছিল
ফোলা ফোলা গাল ছিল
তাল বলে, হা হা
উড়ে যা। উড়ে যা।
ফস্ করে কাক গেল উড়ে।

কাকের কী কেরামতি
সবাই অবাক অতি
ডাক ছেড়ে কাকটাই
তালটাকে ধরাশায়ী
করল কী মন্ত্রের জোরে।

তালের কী কুদরতি
সবাই অবাক অতি
তাক করে তালটাই
ডাল পানে তোলে হাই
তুক করে তাড়ায় শত্তুরে।

১৯৭৮

মণ্ডূক

এক যে ছিল ব্যাঙ্
সরু সরু ঠ্যাঙ্
হাতীর গায়ে লাথি মারে
লাথি তো নয়, ল্যাঙ্।

ভাবে কেমন মজা হবে
হাতী হলে কাত
হাতীর পিঠে নাচবে তখন
খেলা হবে মাত।

হাতী যদি কাত-ই হতো
মজা হতো একটা
হাতীর ভারে চাপা পড়ে
ব্যাঙ্ই হতো চ্যাপটা।

হাতী চলে আপন চালে
ফিরে তাকায় নাকো
ব্যাঙের লাথি ব্যাঙের হাসি
তাকে রাগায় নাকো।

আমার জ্বালায় হাতী পালায়,
ছাতি ফোলায় ব্যাঙ্
মকমকিয়ে টিটকারী দেয়,
কেমন আমার ল্যাঙ্।

আমার মারে হাতী হারে,
গর্জে কোলাব্যাঙ্
দু' গালফোলা ব্যাঙ্
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্!

১৯৭৬

বেড়াল মাসী

কী করছ, বেড়াল মাসী
কী করছ পুষি।
হাত চাটছ পা চাটছ
চেটে চেটেই খুশি।
পুষ! পুষ! লজেঞ্জুস!
পুষ! পুষ! লজেঞ্জুস!
আমরা যেমন লজেঞ্জুস
মনের সুখে চুষি।

পিঠে তোমার বুলোই হাত
করছ না তো ফোঁশ।
এমন করে তাকাও, যেন
মেজাজখানা খোশ।
হিম! হিম! আইসক্রীম!
হিম! হিম! আইসক্রীম!
আইসক্রীম চেটে যেমন
আমাদের তোষ।

১৯৭৮

ভূতের ছড়া

রাত দুপুরে ঠন্ ঠন্
কোথায় আমার লণ্ঠন?
ভাঙ্গল আমার ঘুমের ঘোর
রান্নাঘরে কই সে চোর?
রান্নাঘর নির্জন
বাসন বাজে ঝন্ ঝন্।
মেজের পরে উপুড় করে
কে ফেলেছে থালা, ওরে?
আপনি ওঠে আপনি পড়ে

ভূত আছে কি ওর ভিতরে?
বাজনা বাজায় ঝন্ ঝন্
নাচন নাচে কোন্ জন?
থালা দেখি উলটিয়ে
কেমন মজার ভুলটি এ!
ইঁদুর ভায়া যায় পালিয়ে
বিন্দি তাকায় ফ্যালফ্যালিয়ে।
বোকা বানায় কুকুরে
কালকে রাত দুপুরে।

১৯৭৬

কান্না হাসি

এই মেয়েটি দেখন হাসি
ওকেই আমি ভালোবাসি।
এই মেয়েটা কাঁদুনে
একে ভালোবাসিনে!
কান্না তোমার থামুক 'খন
তোমায় ভালোবাসব, ধন।

Book No
Date

১৯৭৮

ইঁদুরছানার কাণ্ড

ইঁদুরছানা দিচ্ছে হানা
পাণ্ডুলিপি ছিন্ন
এখন আমার উপায় কী আর
বেড়াল পোষা ভিন্ন?
বেড়াল যদি পুষি তাকে
কে জোগাবে মৎস্য

মাছের বাজার আগুন বলে
মাছ খাইনে, বৎস।
বিন্দি কুকুর বৃদ্ধ এখন
আর পারে না ধরতে
তোমরা কি চাও আমিই যাব
ইঁদুরছানার গর্তে?

১৯৭৮

মেয়ে কেমন শিখছেন

বা—বা!
কী মা!
বাআ বাআ ব্ল্যাক শীপ
হ্যাভ ইয়ু এনি উল?
না মা! না মা!
ওটা তোর ভুল।

কালো নই, ভেড়া নই,
গায়ে নেই চুল।
উল আমি কোথা পাব?
ওটা তোর ভুল।

১৯৭৭

আহা কী রান্না

ধন্য মেয়ের হাতের গুণ
রান্নাতে দেয় দু'বার নুন।
তাই তো বলি, মা মণি,
ডাকব নাকি লাবণী?

বৌমা আমার আদরিণী
যা রাঁধবেন তাতেই চিনি।
তাই তো বলি, বৌমা,
ডাকব নাকি মৌমা!

১৯৭৮

পায়েস

ওঃ কী আয়েস।
তালের পায়েস!
বেশ! বেশ! বেশ!
দুঃখ তো এই
মুখ লাগাতেই
হয়ে যায় শেষ।

একবাটি আরো?
হি হি হি
হা হা হা
দাও, যত পারো।

১৯৭৬

বিস্কুট

কুট কুট
বিস্কুট।
মুঠ মুঠ
বিস্কুট।
যেথা রাখি
লুকিয়ে
গন্ধটি
শুঁকিয়ে
সেথা করে
লুট! লুট!
কে খায় রে
কে যায় রে
শুনে দেয়
ছুট! ছুট!

১৯৭৬

হুড়ুম

যার নাম মুড়িভাজা
তারই নাম হুড়ুম
হুড়ুম খেয়ে কি হবে
আক্কেল গুড়ুম?
যার নাম আক্কেল
তারই নাম দন্ত
দন্ত যে ক'টি আছে
হবে তার অন্ত।
তাই বলি, দাদু!
গুঁড়ো করে গুড় দিয়ে
করো ওকে স্বাদু।

হরিণ

হরিণ গেলেন হরিণঘাটাল
দেখেন সেথা গোরুর খাটাল।
হরিণ গেলেন হরিণবাড়ী
দেখেন সেথা কারাগারই।
হরিণ গেলেন হরিংটন
দেখেন সেথা হো চি মন্।
হরিণ গেলেন হরিণাভি
সেথায় ওদের হরেক দাবি।
হরিণ যাবেন ডিয়ার পার্কে
সঙ্গে যাবেন আর কে! আর কে!

১৯৭৭

দাড়োয়ান

দারোয়ান! দারোয়ান!
কোথা গেল গাড়োয়ান।
হাঁক দেন যিনি তাঁর
দাড়িটির কী বাহার।
আমি তাঁর নাম রাখি
দাড়োয়ান।
গাড়ী আছে জুড়ি আছে
গাড়োয়ান সেও কাছে।

ময়দানে হাওয়া খেতে
বেরোবেন বিকেলেতে
আমি যাঁর নাম রাখি
দাড়োয়ান।

১৯৭৭

একহাতে বাজে না তালি

একহাতে বাজে না তালি
গালার সঙ্গে আছে গালি।
মারার সঙ্গে আছে মারি
কাড়ার সঙ্গে আছে কাড়ি।
কাটার সঙ্গে আছে কাটি
লাঠার সঙ্গে আছে লাঠি।
হাতার সঙ্গে আছে হাতি
লাথার সঙ্গে আছে লাথি।
হানার সঙ্গে আছে হানি
টানার সঙ্গে আছে টানি।
চালার সঙ্গে আছে চালি
একহাতে বাজে না তালি।

১৯৭৭

খেলার মাঠে

ভিড় দেখলে ভিড়ে যাবি
ঠোঙায় চীনে বাদাম খাবি।
শুনবি যখন 'গোল' 'গোল'
তুইও দিবি হরিবোল।
শুনিস যদি 'পুলিশ' 'পুলিশ'
তুইও তখন বাপ মা ভুলিস্।
দৌড় দৌড় দৌড় দৌড়
কোথায় গঙ্গা কোথায় গৌড়।

১৯৭৭

কুঁড়ের বাদশা

বাজল ক'টা
সাড়ে ছ'টা?
ঘুম ভাঙেনি,
ওরে জটা?
জলদি কর
জলদি কর
পরীক্ষা আজ
সাড়ে ন'টায়।
বাজল ক'টা
সাড়ে ন'টা?
এখন দেখি
খাওয়ার ঘটা।
কানটা ধরে
ওঠাও ওরে
পরীক্ষা আজ
সাড়ে ন'টায়।

১৯৭৭

ঘোড়া পিটিয়ে গাধা

দাদা,
ঘোড়াকে পিটিয়ে বানাতেও পারো গাধা।
কিন্তু
গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া কি বানাতে পারো?
সেইখানে তুমি হারো।
মেরে মেরে তুমি ভাঙবে ঘোড়ার পাঁজর
দাদা,
মার খেতে খেতে ঘোড়াও বনবে গাধা।
কিন্তু
গাধাকে সাদরে যতই খাওয়াও গাজর
ঘোড়া কি বানাতে পারো?
সেইখানে তুমি হারো।

বর্গী এল ঘরে

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে
সে কি পরে থেকে গেল
বর্গা চাষীর বেশে?
এই কি তার বংশধর
হাজির আমার ঘরে?

বর্গী শুনে শিউরে উঠি
খাজনা দেবার তরে।
বর্গী বলে, "ছড়া চাই,
ছাপব আমি ত্বরা।"
যাকে নিয়ে ঘুমপাড়ানী
সেই চেয়েছে ছড়া।

১৯৭৭

ট্রেন প্লেন কপ্‌টার

রেল গাড়ি রেল গাড়ি
আয় ভাই তাড়াতাড়ি
চল ফিরে যাই বাড়ী
আধ ঘণ্টার পাড়ি।

হেলিকপ্‌টার হেলিকপ্‌টার
ভয় করে না ঝড়ঝাপটার
রাস্তায় ভিড়, ভাবনা কি তার
ট্রাম বাস জ্যাম, তক্ষুনি পার।

এরোপ্লেন এরোপ্লেন
কোথায় লাগে মেল ট্রেন
হিল্লী দিল্লী কায়রো স্পেন
উড়ছেন তো উড়ছেন।

১৯৭৮

করমর্দন

ভালুকওয়ালা। ভালুকওয়ালা।
কোথায় তোমার দেশ?
দেশ আমার বিলাসপুর
মধ্যপ্রদেশ।
ভালুক নিয়ে ঘুরে বেড়াই
ভবঘুরের বেশ।

কালো ভালুক! বড়ো ভালুক!
ভালুকটি কী ভালো!
আমার দিকে এগিয়ে এসে
দু'পায়ে দাঁড়ালো।
ডান হাতটি তুলে ধরে
নীরবে বাড়ালো।

ভালুকওয়ালা! ভালুকওয়ালা!
কী চায় এ? কেক?
হুজুর, এ বনের প্রাণী
হয়েছে লায়েক।
হুজুর যদি হাতটি বাড়ান
করবে হ্যাণ্ডশেক।

ভয়ে মরি, তবু আমার
ভয় পেলে কি চলে?
লোক জমেছে, তাকিয়ে আছে
পরম কৌতূহলে।
হাউ ডু ইউ ডু, বেয়ার? আমি
সুধাই এই বলে।

ঢাকাই ছড়া

বলছি শোন কী ব্যাপার
ডাকল আমায় পদ্মাপার।
আধ ঘণ্টা আকাশ পাড়ি
তারই জন্যে কী ঝকমারি!

পাসপোর্ট রে ভিসা রে
এইসা রে ওইসা রে!
যাচ্ছি যেই প্লেনের কাছে
শুধায় সাথে অস্ত্র আছে?

অবশেষে পেলাম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

কলকাতা সব মিলিয়ে যায়
সকালবেলার স্বপ্নপ্রায়।
মেঘের চেয়ে ঊর্ধ্বে থেকে
দৃশ্য দেখি একে একে।

এই কি সেই পদ্মানদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন্ শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলেম ভিন্ন দেশে।

আরেক দফা ঝকমারি
এসব নাকি দরকারী।
জাপানী আর রুশীর সাথ
আমার নাকি নেই তফাৎ।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলাভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

ভাগ্যে এরা আছে বেঁচে
কতক তো প্রাণ হারিয়েছে!
প্রাণের জুয়াখেলার পণে
হার হয়নি বিষম রণে।

বাংলালিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান্ সেনা আর টিক্কা খান্।

লুপ্ত সেসব ডাইনোসর
মুক্ত এখন নারীনর!
স্বাধীন দেশের রাজধানী
ঢাকা এখন খানদানী।

কত অশ্রু কত রক্ত
মাটিতে তার রয় অব্যক্ত।
চার দশকের পরে, হায়
ফিরছি ঢাকায় পুনরায়।

কেই বা আমায় রাখবে মনে
চিনবে এমন পুরাতনে।
আমারই কি স্মরণ থাকে
দেখেছিলেম কখন কাকে!

এই ঢাকা নয় সেই ঢাকা আর
নয়কো প্রখর স্মৃতি আমার
নতুন যুগের নতুন রূপের
নতুন করে স্বাদ নিই ফের।

স্বাধীন ওরা, তবুও দুঃখী
অন্নচিন্তা থাকতে সুখ কী!
ভাঙার কাজ তো হলো কাবার
গড়ার কাজে নামবে আবার।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র
শক্ত, শক্ত এসব মন্ত্র।
ধর্মনিরপেক্ষতা
শক্ত, যদিও ঠিক কথা।

হোক সে কঠিন, নিক সময়
সেই তো আসল যুদ্ধজয়।
এলেম দেখে শহীদ মিনার
কবর ছাত্রাবাসের কিনার।

রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

বলার কথা এলেম বলে
তার পরে কী? এলেম চলে।
রাশি রাশি উপহার
বইতে হলো প্রীতির ভার।

১৯৭৩

মামার বাড়ী যাওয়া

গোরা কবর! ফাঁসি-দিয়া বর!
চহটার ঘাট! কটক নগর!

‘বর’ মানে বট, সেই গাছে জানো
গতযুগে হতো ফাঁসি লটকানো
গোরাদের ওই গোরস্থানেও
ভয় হানা দেয় কালার প্রাণেও।

পাশ দিয়ে যেতে খেয়া নৌকায়
বুক কাঁপে যদি আঁধার ঘনায়।
ভাবনা আমার লক্ষ্য আমার
সন্ধ্যার আগে মহানদী পার।

রাত কেটে যায় গোরুর গাড়ীতে
বেলা বয়ে যায় নদী পাড়ি দিতে।
কী বিশাল নদী! মাঝখানে চর
নাও থেকে নেমে হাঁটি বরাবর।

তরমুজ ছিল চরের ফসল
সেই তো জোগায় অন্ন ও জল।
চর কয় ক্রোশ? পথ কি ফুরায়?
ওপারের নায়ে চাপি পুনরায়।

ও মাঝি ভাই, জোরসে চালাও
বেলা পড়ে এল, চহটায় যাও।
আরে খোকাবাবু, কেন এত তাড়া
কম মেহনৎ লগি ঠেলে মারা?

সূয্যি ডোবেনি, নদী হয়ে পার
পাটাতন ভেড়ে ঘাটে চহটার।
নাও থেকে নেমে সুখে দিই শিস্
মাঝি হাত পাতে— বাবু, বকশিশ।

সহযাত্রীরা পায়ে হেঁটে যায়
আমি পড়ে থাকি গাড়ীর আশায়।
দেখতে দেখতে ঘনায় আঁধার
গা ছমছম নদীর কিনার।

কাছেই কবর ফাঁসি-দিয়া বর
বেশ কিছু দূরে কটক শহর।
অবশেষে শুনি গাড়ীর আওয়াজ
বুকের ভিতরে বাজে পাখোয়াজ।

ও মিঞা ভাই, জোরসে হাঁকাও
পালিতপাড়ায় পৌঁছিয়ে দাও।
আরে খোকাবাবু, কেন এত তাড়া
ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া যাবে মারা।

গা ছমছম গোরা কবর
গা ছমছম ফাঁসি-দিয়া বর।
দেখতে দেখতে পড়ে রয় পিছে
স্বপ্নের মতো হয়ে যায় মিছে।

এক যে ছিল বাঁদর

এক যে বাঁদর ছিল
কে তাকে আদর দিল
বাঁধল বারান্দাতে .
কোমরে সরু শিকল
তাতে সে নয়কো বিকল
ঘোরে ফেরে খেলায় মাতে।

ছুঁড়ে দাও পাকা কলা
নেবে সে বাড়িয়ে গলা
ফুলিয়ে গাল দুটারে
খাবে সে ছাড়িয়ে খোসা
কী মজা বাঁদর পোষা
হেসে যে বাঁচি না রে।

দেখে তার দাঁতের পাটি
আমরা ভেংচি কাটি
তাতে তার রগড় ভারি
আমরাও বাঁদর কিনা
স্বজাতি লাঙুল বিনা
এটা কি প্রমাণ তারই?

একদিন গেল রেগে
ছুটল এমন বেগে
ছিঁড়ল শিকলখানা
মনিয়ার তাড়া খেয়ে
আমরা পালাই ধেয়ে
ভুলেছি লাঠি আনা।

শুনেই কোন্ সাহসে
পেটটা ধরল কষে
নয়তো দিত কামড়
চিঁ চিঁ চিঁ চিঁ করে
কাঁদে সে ছাড়ার তরে
ছাড়তেই ভাগল পামর।

নেমন্তন্ন

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি?
না, বাবুজী।
কিসের তবে?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।

ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস!
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।

বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই?
না, মশাই।

ঢুলকিবাজি

"বাবাজী, ঢুলকিবাজি।"
"বাবাজী, ঢুলকিবাজি।"
শুনলে উঠত রেগে
বলত, 'দুষ্টু, পাজী।"
ঢোলক ছোট্ট হলে
তাকেই ঢুলকি বলে
খোকাও ছোট্ট কিনা
তাই তো কয়, "বাবাজী।"
ঢুলকি গলায় ঝোলে
দু'হাতে আওয়াজ তোলে
দিনরাত বাজিয়ে চলে
থামাতে হয় না রাজী।

বিন্নি ধানের খই

অন্নদাশঙ্কর রায়

চাঁদমামার দেশে

Book No

নীল আসমান পাড়ি দিলেন
নীল আর্মস্ট্রং
চাঁদের দেশে পা রাখলেন
পোশাক জবরজং।
সেই অবধি টিকিট কেটে
হাজার হাজার যাত্রী
চন্দ্রযানের প্রতীক্ষায়
কাটায় দিবস রাত্রি।
বিশ বৎসর অতীত হলো
বিংশ শতাব্দীর
আয়ু যে হায় ফুরিয়ে আসে
যাত্রীরা অস্থির।
জলদি বানাও চন্দ্রযান
রব উঠেছে তাই
চাঁদ আমাদের মামা, চলো
মামাবাড়ী যাই।
নীল আর্মস্ট্রং-এর মতো
আসব ফিরে ঠিক
তাই তো কাটা হয়ে গেছে
রিটার্ন টিকিট।

খৈরী

খৈরী ছিল বনের বাঘ
আনল তাকে ঘরে
আপন মেয়ের মতন তাকে
যত্ন আদর করে।
এক টেবিলে খাবে খানা
আদুরে সেই বাঘের ছানা
খাবার থাকে তৈরি।
একই খাটে হয় বিছানা
যেন সে এক বেড়ালছানা
পাশে শোবে খৈরী।
সবার সাথে করবে খেলা
মানুষ কিংবা হায়না
খেলার সাথী সবাই খুশি
বাঘ বলে ভয় পায় না।
হিংসা তো তার নাইকো জানা
যদিও সে বাঘের ছানা
খোলা-ই থাকে খৈরী
দর্শক যে আসত নানা
দেখতে আজব বাঘের ছানা
নয়কো কারো বৈরী।
একটু বড়ো হতেই তাকে
ছাড়া হতো বনে
সন্ধ্যে হলেই আসত ফিরে
এমনি আপন মনে।
বনের চেয়ে ঘরই ভালো
চাঁদের চেয়ে বাতির আলো
শোবার গদি তৈরি
ডানলোপিলোয় শোবেন তিনি
শোবেন নাকো একাকিনী
মাকে ছেড়ে খৈরী।
আসতে কারো নাইকো মানা
হরিণ কুকুর বাঁদর
সবাই করে আদর তাকে
সকলে পায় আদর।

পাখী এসে খেতো দানা
যখন তখন ওদের হানা
সইত সুখে খৈরী
গোরু এসে খেতো পানী
ভয় করে না কোনো প্রাণী
কেমন ভালো খৈরী।
অচেনা এক কুত্তা এসে
কামড়ে দিল তাকে
কিংবা কামড় নিজেই খেলো
খেলাধুলোর ফাঁকে।
লক্ষ করে কাণ্ড নানা
বোঝা গেল ব্যাপারখানা
ভুগছে কিসে খৈরী

বাঘের হলে জলাতঙ্ক
কেই বা তখন নিরাশঙ্ক?
সে যে তখন বৈরী।
কী করা যায়! আর কী উপায়!
সারিয়ে তোলা শক্ত
খৈরী হতো মানুষখেকো
স্বাদ করলে রক্ত।
বাগে তাকে যায় না আনা
ক্ষিপ্ত হলে বাঘের ছানা
আদেশ হলো তৈরি
ঘুমপাড়ানী ওষুধ দিয়ে
খৈরীকে দাও ঘুম পাড়িয়ে—
হায়, বেচারি খৈরী।

বীর হনুমান

রামকে উনি করেছিলেন
সাহায্য
তাই তো আমার বাগানটা ওঁর
আহার্য।

বলতে গেলে তেড়ে আসেন
দাঁত খিঁচিয়ে বিকট হাসেন
ভাবছি এখন কোথায় পাব
প্রহার্য।

এ্যালার্ম ঘড়ি

নাইকো আমার টাকাকড়ি
কোথায় পাব এ্যালার্ম ঘড়ি?
রাত পোহালে কাজের ধুম
কে ভাঙাবে আমার ঘুম?
উঠব আমি তড়িঘড়ি
কোথায় পাব এ্যালার্ম ঘড়ি?
আছে, আছে, ঘরের কাছে
বট গাছে আর অশথ গাছে।

সবার আগে একটা ডাকে
একটিবার পাতার ফাঁকে।
অমনি শুরু সবার ডাকা
কা কাআ কা, কা কাআ কা।
জেগে দেখি ভোরের আলো
আর যা দেখি কালো কালো।
নাইকো আমার কানাকড়ি
আছে তবু এ্যালার্ম ঘড়ি।

শঙ্খচিল

"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
মায়ে পোয়ে ডাকাডাকি
বাইরে গিয়ে হাঁকাহাঁকি
শুনতে থাকি, দেখতে থাকি,
ব্যাপারটা কী, স্যাপারটা কী?
আমি তো, ভাই, হাঁ!

"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
তাকায় ওরা আকাশ পানে
গড় করে আর ভুজ্যি আনে
কে বোঝাবে কী এর মানে
ওরাই বোঝে ওরাই জানে
আমি তো, ভাই, হাঁ!

"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
মাথার উপর এ কোন্ পাখী
শঙ্খচিল উড়ছে নাকি
ছোঁ মেরে খায় খাবারটাকে
প্রসাদ কিছু ছড়িয়ে রাখে
আমি তো কই, "যা"!

"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
"খোকা রে, মা।"
"মা রে, মা।"
আমায় বলে, "এই মূর্খা!
জানিস ও কে? মা দুর্গা।
শঙ্করী গো, চিল নও, মা!
মায়ারূপে চিল হও মা।"
আমি তো, ভাই, হাঁ!

কাঁকড়ার সঙ্গে হাতাহাতি

পথের ধারে মাটি কেটে
বানায় নতুন নহর
দেখতে গিয়ে পড়ল চোখে
মাটির তলায় শহর।

শত শত কাঁকড়া থাকে
শত শত গর্তে
বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়ায়
খানাপিনা করতে।

ধরতে গেলে দৌড়ে পালায়
গর্তে ঢোকে আবার
একটুখানি উঁকি মারে—
লোকটা কি নয় যাবার!

তেমনি নাছোড়বান্দা আমি
চুপটি করে থাকি
দেখি কখন বেরিয়ে আসে
ধরতে পারি না কি?

সব ক'টাই খুব সেয়ানা
কেমন করে ধরি?
চুপি চুপি হাত ঢুকিয়ে
হিঁচড়িয়ে বার করি।

ওঃ বাবা রে! সে কী কামড়!
দাঁড়া নয় তো খাঁড়া।
কাঁকড়া সেও নাছোড়বান্দা
করে না হাতছাড়া।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,
ককিয়ে বলি যত
কাঁকড়া আমায় আঁকড়ে ধরে
হাতে আমার ক্ষত।

যা রে, বাপু, গর্তে ফিরে,
শুনবে না কর্কট
পালাই যদি সঙ্গে যাবে
বিষম সঙ্কট।

মারতে ওকে চাইনি আমি
চেয়েছি হাত ছাড়াতে
তাই তো মোচড় দিতে হলো
ওর দু'খানা দাঁড়াতে।

খোকা, তুমি কী করেছ?
ও যে মরার বাড়া
শিকার করে খাবে কী ও
না থাকলে দাঁড়া?

কাঁকড়া গেল গর্তে ফিরে
বড়ো করুণ চোখে
আমিও যাই ঘরে ফিরে
যন্ত্রণায় শোকে।

খেলা না যুদ্ধ

খেলার সঙ্গে হামলা মেলাও যদি
তবে আর সেটা খেলা নয়, খেলা নয়
সে এক বিষম যুদ্ধ, দারুণ যুদ্ধ।
হার হলে তাতে মারামারি বেধে যায়
তখন সে আর খেলা নয়, খেলা নয়
লাঠিসোঁটা হাতে ছুটে আসে পাড়াসুদ্ধ।
রাস্তায় ঘাটে পথিকের চলা দায়
পদে পদে তার প্রাণে ভয়, প্রাণে ভয়
তারও ঘাড়ে পড়ে অচেনা অজানা ডাণ্ডা
পাগলা ষাঁড়ের গুঁতোর মতন সে যে
সামনে পড়লে প্রাণে ভয়, প্রাণে ভয়
ষণ্ডাকে তুমি করতে পারো কি ঠাণ্ডা?
সত্যিকারের খেলোয়াড় বলি তাকে
খেলাটাই যার পরিচয়, পরিচয়

খেলা ভালো হলে হেরেও সেজন ধন্য
খারাপ খেলায় জিৎ যদি হয় কারো
জয় নয়, সে তো পরাজয়, পরাজয়
খেলোয়াড় নয়, খেলুড়ে বলে সে গণ্য।

খেলোয়াড়ি

গোল দিতে ভালো লাগে,
গোল খেতে ভয়
খেলোয়াড়ি মনোভাব
এর নাম নয়।
খেলোয়াড় হাসিমুখে
দেয় আর খায়
বিপক্ষের কথা ভাবে
তাকেও জেতায়।
একাই করবে নাম,
একা সর্বময়
খেলোয়াড়ি মনোভাব
এর নাম নয়।

মিলেমিশে করে খেলা
পাস দেয়, পায়
টীমওয়ার্ক না থাকলে
সকলি বৃথায়।
হার নয়, জিৎ নয়
খেলাই আসল
নিখুঁত যে খেলা তার
কে ভাবে কী ফল?
খেলোয়াড় খেলে যায়,
খেলাটাই সব
নিখুঁত যে খেলা তার
বাড়তি গৌরব।

বিশ্বকাপ

উলু উলু মাদারের ফুল
বর এসেছে কত দূর?
বর নয় গো, বিশ্বকাপ
দিগ্বিজয়ের শেষের ধাপ।

বিশ্বকাপের ফাইনাল
জিতেছেন মদনলাল
মহীন্দর অমরনাথ
কপিলদেবের সাথ।

তাই এত উল্লাস
বোমা ফাটে চার পাশ।
মাঝরাতে রাস্তায়
কেউ নাচে কেউ গায়।

দুমদাম ধুমধাম
ভারত করেছে নাম।
উলু উলু মাদারের ফুল
বিয়ের মতো হুলস্থূল।

বর্ষার দিনে

শন শন হাওয়া বয়
এই আসে বিষ্টি
দরজা জানালা খোলা
ভেসে যায় ছিষ্টি।
তারপরে রোদ ওঠে
আহা, সে কী মিষ্টি!
আবার ঘনায় মেঘ
জোর আসে বিষ্টি

ঝাপসা দেখায় সব
যতদূর দৃষ্টি।
খিচুড়ির দিন এটা
চলো, করি ফীস্টি,
কী কী খেতে চাও, বলো
করি বসে লিস্টি।

রিক্‌শা

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
পথে এলো বান
ইস্টিশনে যাব আমি
কোথায় পাব যান?
বাস চলে না, ট্রাম চলে না
ট্যাক্‌সি সেও জব্দ
থেকে থেকে আসছে কানে
ইঞ্জিনের শব্দ।

নৌকো যদি থাকত, আহা!
থাকত যদি মাঝি
মওকা পেয়ে যা হাঁকত
তাতেই আমি রাজী।
বিদ্যাসাগর হতেম যদি
সাঁতরে হতেম পার
বিদ্যা তো নেই, সাগর আছে
সম্মুখে আমার।

এমন সময় কোথা থেকে
হাজির হলো এসে
রিক্‌শা টেনে রিক্‌শাওয়ালা
রক্ষাকারী বেশে।
রিক্‌শা তুলে দিচ্ছ, বাবু
শহর থেকে সদ্য
রিক্‌শা যদি না চড়ো তো
কী চড়বে অদ্য?

আচ্ছা, বাপু, চড়ছি আমি
গরজটা তো যাবার
রিক্‌শা তুলে দেবার আগে
ভাবতে হবে আবার।
কিসের ট্রাম! কিসের বাস!
কিসের উন্নয়ন!
আজ থেকে জানলেম
রিক্‌শা বড়ো ধন।

বিন্দি

চোদ্দ বছর ছিল বেঁচে
    মানুষকে কামড়ায়নিকো
ঘেউ ঘেউ করেছে যদিও
    মানুষকে আঁচড়ায়নিকো
এমনি কুকুর ছিল বিন্দি
    লিখো, লিখো, এপিটাফ লিখো।

কুকুর কেন যে বলে ওকে
    কুকুর কথাটা এত রূঢ়
মানুষ! মানুষ ছিল জানি
    বিশ্বাস করবে না মূঢ়।
কুকুরও মানুষ হতে পারে
    তত্ত্বটা অতিশয় গূঢ়।

আমি যদি বহু দূরে যাই
    খাওয়াদাওয়া করবে সে বন্ধ
ক'দিন উপোসী থেকে, হায়
    শরীরের হাল হয় মন্দ।
বাড়ী ফিরে আসি আমি যবে
    আহা, তার কত যে আনন্দ।

আমার শোবার ঘরটিতে
    তারও মেজেতে শোওয়া চাই
আমাকে পাহারা দেয় রাতে
    ওকে ছেড়ে যেন না পালাই।
চোখে চোখে রাখে সে আমাকে
    যখন-ই যেখানেই যাই।

পাহাড়ী কুকুর ছিল ও যে
    গায়ে ওর ঘন কালো লোম
কালো এক ভালুকের মতো
    ছিল ওর রকম সকম।
ল্যাজ ছিল চামরের মতো
    কী নরম সফেদ পশম।

চামর উঁচিয়ে চলে পথে
    ওই তার অঙ্গের শোভা
রূপ দেখে পথিকেরা তার
    বিস্ময়ে কৌতুকে বোবা।
কে কখন চুরি করে ওকে
    সুন্দরী এত মনোলোভা।

চোখ দুটি ভাবে ভরপুর
    গাঢ় স্নেহে ঘোর অভিমানে
আদর সোহাগ করি না তো
    চেয়ে থাকে তাই মুখপানে।
ভালোবাসা জানাতে ও পেতে
    কত শত রঙ্গ ও জানে।

যখনি বেড়াতে যাই আমি
    বন্ধুরা সকলে সুধায়
আজ কেন একা একা দেখি
    আপনার সাথীটি কোথায়?
ভাষা দিয়ে বোঝাব কেমনে
    বলতে যে বুক ফেটে যায়।

বেগানা এক বেড়াল

বেগানা এক বেড়াল এলো
হঠাৎ আমার ঘরে।
বেগানা এক বেড়াল।
এমন বেড়াল কেউ দেখেনি
কলকাতা শহরে।
বেগানা এক বেড়াল।
নাকখানা তার মিশ্‌কালো আর
বাকী সব ধূসর।
বেগানা এক বেড়াল।
গড়নটা তার আঁটোসাটো
নখ দাঁত প্রখর।
বেগানা এক বেড়াল।
আমরা তাকে পোষ মানিয়ে
আপন করে রাখি।
বেগানা এক বেড়াল।
শ্যামদেশী বেড়াল ভেবে
শ্যাম নামে ডাকি।
বেগানা এক বেড়াল।

ছ'সাত দিন থাকার পরে
হলো সে গায়েব।
বেগানা এক বেড়াল।
শোনা গেল মালিক তার
কে এক সাহেব।
বেগানা এক বেড়াল।
কুঠিতে শ্যামকে রেখে
ছুটিতে গেলেন।
বেগানা এক বেড়াল।
সেই ফাঁকে শ্যামচাঁদ
বেড়াতে এলেন।
বেগানা এক বেড়াল।
ফিরে গিয়ে একদিনও
আসে নাকো শ্যাম।
বেগানা এক বেড়াল।
পথ চেয়ে বসে থাকি
জপি শ্যাম নাম।
বেগানা এক বেড়াল।

হাতী বনাম ব্যাঙ্

হাতী দেখে ব্যাঙ্ বললে, "হাতী,
তোমার সঙ্গে করব হাতাহাতি।"
হাতীর সেদিন ছিল কাজের তাড়া
কান দিল না, হলো না সে খাড়া
রাজার কাজে যাচ্ছিল সে গৌড়।
ব্যাঙ্ তা দেখে শোনায় সকল পাড়া,
"আমার ভয়ে হাতী দিল দৌড়।"

ক্ষুদে পিঁপড়ে

ক্ষুদে পিঁপড়ের মনে বড় সাধ
শোবে সে আমার সঙ্গে।
সারা রাত জুড়ে চলবে ফিরবে
খেলবে আমার অঙ্গে।

ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পেরে সে
কুট করে দেবে কামড়।
ঘুম ছুটে যাবে আমিও তখন
চট করে দেব চাপড়।

যেখানে কামড় সেখানে চাপড়
দুটোই আমার অঙ্গে।
বাতি জ্বেলে দেখি একটা তো নয়
একশোটা আছে সঙ্গে।

বাঘার ডাক

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না
নয় তো ওটা বাঘের ডাক
পাশের বাড়ী বাঘা থাকে
হচ্ছে এটা বাঘার হাঁক।

বুঝতে হবে ন'টা বাজে
বাঘা যখন ডাক ছাড়ে
আওয়াজ শুনি সাইরেনেরও,
দুই আওয়াজই কান কাড়ে

বন্ধ হলো সাইরেন তো
বন্ধ হলো বাঘার হাঁক
ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না
নয়কো ওটা বাঘের ডাক।

বিয়ের ছড়া

ডায়ানামতী ভাগ্যবতী
আজ ডায়ানার বিয়ে
ডায়ানা যাবেন শ্বশুরবাড়ী
রাজপুত্তুর নিয়ে।

Book No
Date

রাজপুত্তুর রাজা হবেন
কোন্‌দিন কী জানি।
রাজপুত্তুর রাজা হলে
ডায়ানা হবেন রাণী।

উটের ছড়া

উষ্ট্রভাষায় বিলাপ করে উট,
সব জন্তুর লিখলে ছড়া
আমার বেলায় ছুট!

বাঘ ভাল্লুক বেড়াল কুকুর বেঁজি
কাঠবিড়ালী সেও ভালো
আমিই হেঁজিপেঁজি।

আমি বলি, রাগ কোরো না, উট।
সাচ্চা বাত শোনাই তোমায়
নয়কো এটা ঝুট।

অনেক আগে আমার ছেলেবেলায়
উটের গাড়ী চলত নাকি
দূর বাঁকুড়া জেলায়।

বড়ো হয়ে চাকরি পেলেম যেই
দেখি সেথায় মোটর চলে
উটের গাড়ী নেই।

আরো বড়ো হলেম যখন আবার
কথা ছিল বদলি হয়ে
রাজস্থানে যাবার।

গেলে আমার মিটত একটি সাধ
হাতী ঘোড়া সব চড়েছি
উট চড়াটাই বাদ।

ঘটে নাকো রাজস্থানে যাওয়া
উটের পিঠে সওয়ার হয়ে
মরুর খেজুর খাওয়া।

রাজস্থানের তুমিও তো এক রাজ
মরুভূমির বুকে তুমি
জীবন্ত জাহাজ।

পেট্রোল না মেলে যদি মহাযুদ্ধের বেলা
কলকাতার মরুভূমে
তুমিই তো ভেলা।

প্রিয় কুকুরের কাহিনী

বোঝে নাকো ইংরেজী
বোঝে নাকো হিন্দী
বাংলা শেখাই ওকে
তাই বোঝে বিন্দি।
ওর দুই বোন ছিল
ইন্দি ও সিন্দি।

ইন্দি ও সিন্দি
কোথায় কে জানে!
বিন্দিকে আনা হয়
আমার এখানে।
ভুটিয়া কুকুরছানা
বেশ পোষ মানে।

যখনি বেড়াতে নিই
যাবেই সে আগে
উৎসাহে চনমন
লাফ দিয়ে ভাগে।
পাড়ার কুকুরদের
সঙ্গে সে লাগে।

যোধপুর পার্কের
কে না চেনে তাকে
চোর ডাকু ভয় পায়
তার হাঁকে ডাকে।
ঘুমোবে না, ঘুমোতেও
দেবে না আমকে।

বেড়ালকে করে তাড়া
ইঁদুরের যম
ইঁদুরকে খায় নাকো
করে সে খতম।
মেজাজটি তবু তার
বেজায় নরম।

অতিথি বাড়িতে এলে
সেও পাবে ভাগ
মিষ্টি না দিলে খেতে
মানবে না বাগ
হ্যাংলামি দেখে ওর
আমি করি রাগ।

সবার আদর খায়
স্নেহের কাঙাল
কোল ঘেঁষে থাকে যেন
আদুরে দুলাল।
বিন্দি কুকুর নয়,
বিন্দি বেড়াল।

চোদ্দ বছর ছিল
সঙ্গে আমার
নিত্য বেড়াতে যেত
পুকুরের পাড়।
ওরই এক ঝোপঝাড়ে
কবরটি তার।

শীতকাতুরে

সেই বয়সে ছিল নাকো সম্বল যে
গায়ে দেবে কম্বল।
ছিল একটা কাঁথা, সেটাই
ঢাকত গা আর মাথা।

মাঘ মাসের শীতে, খোকার
ভয় ছিল না চিতে।
দোলাই গায়ে জড়িয়ে, তার
সকাল যেত গড়িয়ে।

সেই খোকাই বড়ো, এখন
শীতে জড়সড়।
হয়েছে বেশ সম্বল, তাই
রাতে চাপায় কম্বল।

একখানাতে জাড় না যায়,
আরেকখানা চায়।
জাড় যায় না, কী আক্ষেপ!
তাই আনা হয় লেপ।

লেপের চাপে কাবু হে
তবুও কাঁপেন বাবু।
তখন আসে রেজাই
বোঝার ভার বেজায়ই।

তার পরে কী আছে আর!
শোবার আগে পুলোভার।
পুলোভার অঙ্গে আঁটা
তবুও যেন বলির পাঁঠা।

আরেকখানা পুলোভারে
অবশেষেই কম্প ছাড়ে।
দেখতে, আহা, কী বাহার
যেমন কূর্ম অবতার।

কিস্‌সা ক্লে পিজন কা

তিন বার্থে তিন মূর্তি এক বার্থে আমি
দিল্লি থেকে ছুটছে বেগে মেল হাওড়াগামী।
তিন বাক্সয় তিন বন্দুক হয় তা বার করা
দেখতে পাই যত্ন করে গুলি হচ্ছে ভরা।
শুনতে পাই তিনজনের মুখে আজব বুলি
ক্লে পিজন লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হয় গুলি।
ক্লে পিজন কাকে বলে আমার অজানা,
কোথায় বসতি তার না জানি ঠিকানা।
অজ্ঞজনে জ্ঞান দেন তিন বিজ্ঞজন
অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এটাও তেমন।
টুর্নামেণ্ট বিকানিরে যেমন পাঞ্চালে
রাজকন্যা মেলে নাকো অবশ্য একালে।
পায়রা মাটির বটে, চতুর সে ভারী
চাতুরী যে জানে নাকো সে নয় শিকারি:
বাংলার এ তিন বীর টুর্নামেণ্টে গিয়ে
ঘরে ফিরে চলেছেন খেতাব না নিয়ে।
"হায় পায়রা!" "হায় পায়রা!" করেন শুধু শোক
বন্দুক বাগিয়ে ধরেন জানালাতে চোখ।
"ওই চিড়িয়া!" "ওই চিড়িয়া!" হঠাৎ ওঠে বুলি
জানালা ভেদ করে ছোটে বন্দুকের গুলি।
ব্যর্থ হয়ে বার্থে ফিরে শিকারি বলেন,
"ফস্কে গেল! ব্যাড লাক! দায়ী এই ট্রেন।"
বীরপুরুষের দলে আমি কাপুরুষ
গুলির আওয়াজ শুনে হারিয়েছি হুঁশ।
বাক্স খোলা বন্দুকেতে গুলি আবার ভর্তি
দুর্ঘটনা ঘটে যদি, মৃত্যু নিকটবর্তী।
কী এক অপয়া গাড়ী আমি তার যাত্রী
ইষ্টনাম জপ করে কাটে কালরাত্রি।
রাত পোহালে হাওড়া এসে প্রাণ ফিরে পাই
হ্যাণ্ডশেক করি আর বলি, "গুড বাই।"

দাদু এখন বন্দী

ধন্যি ওদের রাস্তা খোঁড়া
দিদুকে প্রায় করলে খোঁড়া
পা পড়ে না মাটিতে
ট্যাক্সি ডাকো, শুনবে নাকো
রাত দশটায় দাঁড়িয়ে থাকো
পারবে নাকো হাঁটিতে।

পথের ধারে আমরা দু'জন
দেখতে পেলেন পথিক সুজন
আনতে গেলেন ট্যাক্সি
রাজী হলেন রাজা, তবে
ভাড়ার উপর দিতে হবে
তিনটি টাকা ট্যাক্স-ই!

ডাক্তারে কয়, মচকে গেছে
হাড় ভাঙেনি, চোট লেগেছে
আস্তে আস্তে সারবে।
বন্ধ এখন নড়ন চড়ন
হপ্তা কয়েক বাঁধা চরণ
চলতে পরে পারবে।

সেরে উঠেই হুকুম জারী—
"রাস্তা হাঁটায় বিপদ ভারি
তুমিও হবে ল্যাংড়া।"
দাদু হলেন নজরবন্দী
খাটবে নাকো ফিকির ফন্দী।
হাসছিস্ যে চ্যাংড়া?

ঝড়িপোকা

আমরা বলি ঝড়িপোকা
নেইকো তাদের লেখাজোখা
উইঢিবিতে ঠাঁই।
ঝড়ের পরে গজায় পাখা
ঢিবিতে আর যায় না থাকা
বেরিয়ে পড়ে তাই।

সেই ঢিবিরই মাটির নিচে
হাজার খানেক কাঁকড়াবিছে
ওরাই আসে বাইরে
উড়তে গিয়ে লুটায় যারা
বিছের শিকার হয় যে তারা
কেবল খাই খাই রে।

ব্যাঙরা আসে থপথপিয়ে
মুখে পোরে খপখপিয়ে
অমনি করে গ্রাস
হায় রে আমার ঝড়িপোকা
নেইকো তোদের লেখাজোখা
তবুও সর্বনাশ!

ভোজবাজি না ভেলকি এ কি?
ঘণ্টাখানেক পরে দেখি
ঢিবির পাশটা শাদা।
কোথায় পোকা! কোথায় বিছে!
কোথায় ব্যাঙ্! সবই মিছে।
কেবল পাখার গাদা।

সোনার হরিণ

সোনার হরিণ পড়ল ধরা
    আনল যারা বনের থেকে
দিয়ে গেল পুষতে আমায়
    কিন্তু ওকে সামলাবে কে!

বাগান ছিল, দিলেম ছেড়ে
    দৌড়ে বেড়ায় সারা বেলা
ঘরে ঢুকে টুঁ মেরে যায়
    এটাও নাকি ওদের খেলা।

বাচ্চা হরিণ গজায়নি শিং
    আদর করে খোকা খুকু
গিন্নী ওকে বোতল থেকে
    দুধু খাওয়ান এতটুকু।

আমরা ওকে বাঁধি নাকো
    বনের প্রাণী মুক্ত রাখি
দামালটাকে সামাল দেওয়া
    শক্ত বলে সজাগ থাকি।

হরিণ যখন আপন হলো
    আমরা গেলেম ছুটিতে
তাঁর কাছে তো যায় না রাখা
    এলেন যিনি কুঠিতে।

বন্ধু ছিলেন প্রতিবেশী
    ছেলেরা তাঁর খেলতে আসে
হরিণ ওদের খেলার সাথী
    ওরাও তাকে ভালোবাসে।

ওরাই তাকে নিয়ে গেল
    রাখবে বলে ওদের বাড়ী
হরিণ কিন্তু হয়নি সুখী
    দেখতে গিয়ে বুঝতে পারি।

ওদের ঘরে বন্দী ও যে
    বাঁধন পরে আড়ষ্ট
খাবার দিলে ছোঁবে নাকো
    হায় বেচারীর কী কষ্ট!

বিদায় নিলেম সজল চোখে
    ওরও দেখি সজল চোখ
দিলেম গায়ে হাত বুলিয়ে
    হরিণ, তোমার শুভ হোক।

কম বেশী

ওই লোকটা খায় বেশী
তাই তো ওর লোহার পেশী।
এই লোকটি খায় কম
তাই ধরে না একে যম।

দুই ভাই

টোকাটুকি করে যে
গাড়ীঘোড়া চড়ে সে।
পড়ে শুনে করে পাস
দুঃখী সে বারো মাস।

লালবরণ ঘুড়ি

ছেলেবেলায় ওড়ায়নি কে
নানাবরণ ঘুড়ি?
যাদের ছিল ঘুড়ির নেশা.
আমিও তাদের জুড়ি।

বেরিয়ে পড়ি সাতসকালে
ঘুড়ির সঙ্গে মাঠে
হয় না লেখা হয় না পড়া
দুপুরটাও কাটে।

হয়নি নাওয়া হয়নি খাওয়া
বাড়ী যখন ঘুরি
বাবা আগুন, বেত কেড়ে নেন
ঠাকুরমা বুড়ী।

একদিন, ভাই, হারিয়ে গেল
আংটি আমার সোনার
কার যেন সে উপহার
নাম ভুলেছি ওনার।

মাঠে ফিরে কতই খুঁজি
কতই আমি ঢুঁড়ি
ব্যর্থ হয়ে গোপন করি
আমার বাহাদুরী।

তবু কি যায় ঘুড়ির নেশা
আবার চলি মাঠে
ঘুড়ি ওড়ে উচ্চ হতে
উচ্চতর পাটে।

হঠাৎ দেখি লাটাই খালি
সুতো সে উধাও
কেমন করে টানব আমি
তোমরা সুধাও।

নীলবরণ আসমান রে
লালবরণ ঘুড়ি
দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল
আমি মাথা খুঁড়ি।

হায় রে আমার আংটি সোনা
কোথায় পাব তারে!
হায় রে আমার ঘুড়ি মোনা
দুঃখ জানাই কারে!

ঘুড়ির নেশা গেল ছেড়ে
ওড়াইনে আর ঘুড়ি
কারণটা কী জানেন শুধু
ঠাকুরমা বুড়ী।

রণ-পা

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোন চুপি চুপি।

মন লাগে না লেখাপড়ায়
মন উড়ে যায় রণ-পা চড়ায়।

রণ-পা চড়ি খেলার মাঠে
রণ-পা চড়ি পথে ঘাটে।

রণ-পা চড়ি দিনের আলোয়
রণ-পা চড়ি রাতের কালোয়।

তাকায় লোকে, ডাকাত নাকি?
চেঁচিয়ে করে ডাকাডাকি।

দৌড়ে কি কেউ ধরতে পারে
ছাড়িয়ে যাই মোটর কারে।

সেই যে আমার রণ-পা জোড়া
সেই তো আমার রেসের ঘোড়া।

শোবার আগে খাটের তলে
অশ্ব রাখি আস্তাবলে।

সকালবেলা জেগে দেখি
অশ্ব কই! ব্যাপার এ কী!

ধমক লাগান ছোটকাকা
চলবে নাকো রণ-পা রাখা।

পুলিশ এসে নিত্য সুধায়,
চোরাই মাল আছে কোথায়?

চোর নাকি রে! ডাকাত নাকি!
পড়বে হাতে হাতকড়া কি!

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোন চুপি চুপি।

ক্ষান্ত হয়ে রণ-পা চড়ায়
মন দিয়েছি লেখাপড়ায়।

হ্যালির ধূমকেতু

সরকার,
দূরবীনেতে নেইকো আমার একটুও দরকার।
তার হেতু!
খোলা চোখেই দেখেছিলুম হ্যালির ধূমকেতু।
সেটা কবে?
কিং এডওয়ার্ড গত হলেন ছেলেবেলায় যবে।
সেইবার
সন্ধ্যে হলেই দেখা যেত আলোর কী বাহার!
হোঁশ নাই
লক্ষ যোজন জুড়ে আছে আকাশে রোশনাই!

মাঝ রাতে
ঝাঁটার মতো পুচ্ছটা তার ছুঁতে পারি এই হাতে।
বোঝা যায়
আগুনের হল্‌কা যেন ছোঁয় এসে সারা গায়।
মনে ডর
ধূমকেতু কি আসছে নেমে আমার মাথার পর?
ষাট! ষাট!
ভাগ্যে আমার তেমন কোন ঘটেনি বিভ্রাট।
এইবার
শুনছি নাকি বাইনোকুলার হবেই দরকার।
তার হেতু
দূরে দূরে আসবে যাবে হ্যালির ধূমকেতু।

কী আসে যায় নামে

আমি।। যায় না, ভাবা যায় না,
মেয়ের নাম চায়না!
চায়না সে তো চীনের নাম
পিতা কি এর পন্থীবাম
বিপ্লব যাঁর বায়না!
নাকটি তো কই নয়কো খাঁদা
রংটিও নয় হল্‌দে-শাদা
তেরছা তো নয় চোখের দুটি
আয়না।

তিনি।। চারটির পর আরও একটি
চাই না।
সেই থেকে নাম 'চাইনা'।
চাইনা থেকে চায়না হলো
তাই না।
খুঁজছি একটা নতুনতর নাম
পাত্র না হয় বাম।
বিয়ের বয়স হলো এখন
পাত্র খুঁজে পাই না।
আপনি কবি, সেইজন্যে আসা,
বলুন, কী নাম খাসা?

আমি।। ভেবে ভেবে নাম রাখলুম
'নাতাশা'।
সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হলো,
খেতে দিল বাতাসা।

হিপ হিপ হুরে

খেলতে গেলে ফুটবল হে
    করত আমায় গোলকীপার
গোল থেকে যে বাঁচায় ওদের
    নাইকো কোনো আদর তার।

গোল করে যে তাকেই সবাই
    মাথায় করে নাচতে যায়
কী অবিচার তার উপরে
    গোলের থেকে যে বাঁচায়!

আমার প্রাণে সাধ ছিল হে
    দৌড়ে গিয়ে গোল দিতে
ফরওয়ার্ড না হলে আমি
    খেলব না আর টীমটিতে।

ক্যাপটেন তা শুনে তখন
    করেন আমায় রাইট আউট
গোল কি আমি পারব দিতে
    সবার মনে এই ডাউট।

রাইট আউট হয়ে, দাদা,
    গোল দেওয়াটা সহজ নয়
মারলে লাথি ফুটবলটা
    লক্ষ্য হারায় সব সময়।

টিটকারিতে রোখ চেপে যায়
    একদিন এক মারি কিক্
গোলকীপারের হাত এড়িয়ে
    বল ঢুকে যায় গোলে ঠিক।

হিপ হিপ হুরে!
হিপ হিপ হুরে!
হিপ হিপ হুরে!

সেরা এই ফলার

"খোকাবাবু, খই খাবে?"
শুনলেই ক্ষেপে যাবে
    কেন তার হেন মারমূর্তি?
খই কি এতই হেয়
না হয় মুড়কি দেয়
    দেখবে কেমন লাগে ফুর্তি।

খই মোয়া হাতে পেলে
খাবে না সে কোন্ ছেলে
    গুড় দিয়ে তৈরি কী মিষ্টি!

ধনু-মোয়া চিনি-পাক
খেতে চায়, পুরী যাক্
    পিরামিড গড়নের সৃষ্টি।

খই আর দই খাও
দেখবে কী মজা পাও
    মেখে নাও সাথে পাকা কলার।
খেতে বসে মনে ভাবো
কোথায় গিয়ে আঁচাবো
    ফলারের সেরা এই ফলার!

বরযাত্রী

বিয়েতে যাবি?
একশো বার।
ফিস্টি খাবি?
একশো বার।
খাস্তা লুচি?
একশো বার।
আলুর কুচি?
একশো বার।
ভেটকি ফ্রাই?
একশো বার।
সস্‌ও চাই?
একশো বার।
মাছের ঝোল?
একশো বার।
মটন রোল?
একশো বার।
ঘি পোলাও?
একশো বার।
আচার চাও?
একশো বার।
চাটনি পাঁপড়?
একশো বার।
দই তারপর?
একশো বার।
ক্ষীর সন্দেশ?
একশো বার।
তালের পায়েস?
একশো বার।
সোনপাপড়ি?
একশো বার।
সর রাবড়ি?
একশো বার।
চন্দ্রপুলি?
একশো বার।
হজমী গুলি?
নো নেভার।

কিস্‌সা বাঘসওয়ারকা

এক যে ছিলেন ঘোড়সওয়ার
কাণ্ড শোন বলছি তাঁর।
ঘোড়সওয়ার ডাকসাইটে
লম্ফ দিলেন বাঘের পিঠে।
বাঘ তো ভয়ে ধাঁ দৌড়
খুলনা থেকে যা গৌড়।
গৌড় থেকে রাজশাহী
রাজশাহীতে বাদশাহী।
সেখান থেকে ঢাকাতে
গেলেন বিনা টাকাতে।
ঢাকা থেকে চাটগাঁয়
কেই বা তাঁকে আটকায়!
চাটগাঁ থেকে আরাকান
না, না, হুজুর ফিরে যান।
ফিরতে ফিরতে পাবনায়
পড়েন তিনি ভাবনায়।
কোথায় তিনি থামবেন
কেমন করে নামবেন।
বাঘ বলল, চড়নেওয়ালা
তোমার পরে আমার পালা।

মরছি ভুখে খেটে খেটে
পিঠ ছাড়লে পড়বে পেটে।
বাঘের পেটে যাবার ভয়
পিঠ থেকে তাই নামার ভয়।
সেই ভয়েতে ডাকসাইটে
লেপটে থাকেন বাঘের পিঠে।
বনেন তিনি বাঘসওয়ার
বাঘও বনে বাহন তাঁর।
সবাই বলে, ধন্য বীর
দেখা পেলেই নোয়ায় শির।

ব্যাঙের ডাক

ব্যাঙ্
আর ডাকে না ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ঘ্যাঙ্।
শুনছি নাকি কোম্পানী
করছে ব্যাঙ্ রপ্তানী
ফরাসীরা খাচ্ছে ব্যাঙের
ঠ্যাং।
বর্ষা এল বর্ষা গেল
ব্যাঙ্
থাকত যদি ডাকত দূরে
রাত্রি জুড়ে একই সুরে
সবাই মিলে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ঘ্যাঙ্।
ব্যাঙ্কে বাঁচাও
নইলে, ভায়া, শক্ত হবে
তোমার বাঁচাও।
ধানের ক্ষেতে লাগবে যখন
কীট পতং
ব্যাঙ্ই হবে কীটনাশক
জবরজং।
ব্যাঙ্ধরাদের ফন্দী থেকে
ব্যাঙ্কে রাখো
যাকে রাখো সেই রাখে
ভুলো নাকো।

লক্ষ্মীপ্যাঁচা

কেউ দেখেনি কেমন করে
লক্ষ্মীপ্যাঁচা এলো ঘরে।
এটা কি এক সুলক্ষণ?
ভাবছি আমি বিলক্ষণ।
"ওরে আমার লক্ষ্মী প্যাঁচা
কোথায় পাব সোনার খাঁচা?
কোথায় তোরে রাখব, বল।
লক্ষ্মী হবেন অচঞ্চল।"
প্যাঁচা শোনে, মৌন থাকে
বলে নাকো খুঁজছে কাকে।
প্যাঁচার শিকার ইঁদুর নাকি
এই ঘরে তার আস্তানা কি?
"আয় রে সোনা! আয় রে ধন!
আদর করি একটুক্ষণ।"
কাছে যেতেই জানলা দিয়ে
প্যাঁচা পালায় ফরফরিয়ে।

ডুবসাঁতার

তেল মাথা বেল মাথা
গায়ে মাখি তেল
তালপুকুরে ভরদুপুরে
ডুবসাঁতারের খেল্।

এপারেতে ডুব দিয়ে
ওপারেতে উঠি
ওপারেতে ডুব দিয়ে
এপারেতে জুটি।

তেল মাথা বেল মাথা
গায়ে মাখি তেল
এক ডুবে পুকুর পার
ভানুমতীর খেল্।

সাথীরাও ঝাঁপ দেয়
কিসে তারা কম?
মাঝখানে ভেসে ওঠে
ফুরিয়েছে দম।

এক ডুবে পারে নাকো
দুই ডুবে পারে
দুই ডুবে ফিরে আসে
আবার এধারে।

তেল মাথা বেল মাথা
গায়ে মাখি তেল
আমি জিতি ওরা হারে
ডুবসাঁতারের খেল্!

বন্যা

বন্যা
কত কিছু নিয়ে যায়
তবু কিছু দিয়ে যায়
ফুলে ফলে মাটি হয়
ধন্যা।

দেবতার শাপ নয়
মানুষের পাপ নয়
বন্যা সে ইন্দ্রের
কন্যা।

খরা

খরা! খরা! খরা!
খরার জ্বালায় জ্বলছে দেশ
বর্ষার মেঘ নিরুদ্দেশ
শুকিয়ে গেল ধরা।

কেন! কেন! কেন!
বনস্পতি হলে নিপাত
হয় না দেশে বৃষ্টিপাত
খরাই হয়, জেনো।

স্মরণ রেখো তুমি
অরণ্যের মৃত্যু যেথা
সাহারা গোবির জন্ম সেথা
ধু ধু মরুভূমি।

সুন্দরবন যদি
ক্রমে ক্রমে হয় উজাড়
বাড়বে মরুভূমির বাড়
কলকাতা অবধি।

মিষ্টি দাঁত

এলিজাবেথ গ্রেট ছিলেন
সব রকমে ভালো
মিষ্টি দাঁতের জন্যে তাঁর
দাঁতগুলি হয় কালো।

আমেরিকার মুক্তিদাতা
জর্জ ওয়াশিংটন
মিষ্টি দাঁতের জন্যে তাঁর
দাঁতের উত্তোলন।

বড়ো বড়ো রাষ্ট্রপতি
সেনাপতি যাঁরা
মিষ্টি দাঁতের জন্যে কাবু
দাঁতের রোগে তাঁরা।

আমার তবে দোষ কী, বলো,
তোমার কীই-বা দোষ!
দাঁতের মায়া কাটিয়ে, এস,
মিষ্টি খাই রোজ।

কাকের ডাক

কাক রে
গলা ছেড়ে ডাক রে।
ডাক শুনে তোর ঘুম ভেঙে যাক
রাত্তির পোহাক রে।

কাক রে
জোরে জোরে ডাক রে।
ডাক চলে যাক আকাশপানে
দরোজা হোক ফাঁক রে।

দেখা দেবেন সুয্যিঠাকুর
বাজবে ভোরের শাঁখ রে।

পেয়ারা পেয়ারের ফল

আম বলো জাম বলো কাঁঠাল বা লিচু
মরসুম চলে গেলে থাকে নাকো কিছু।
সব ঋতুতেই দেখি তোমার চেহারা
পেয়ারের ফল তুমি আমার, পেয়ারা।

কষা হোক, মিঠে হোক, যে কোন রসের
তিন থেকে তিরাশি সব বয়সের।
কাঁচা হোক, পাকা হোক, কেমনে বা ফেলি
ফেলবার মতো হলে করা হয় জেলী।

গাছের ফল তো ভালো গাছে চড়ে খাওয়া
নিচু ডাল থেকে উঠে উঁচু ডালে যাওয়া।
দিন ভর কয় কুড়ি করেছি ভক্ষণ
বলতে হবে না পরে কিসের লক্ষণ।

কিশোর বয়স ছিল কবে একদিন
গাছে চড়ে ফল খাওয়া স্মরণে বিলীন।
এখনো ভুলিনি আমি তোমার চেহারা
পেয়ারের ফল তুমি আমার, পেয়ারা।

কিশোর বিজ্ঞানী

এক যে ছিল কিশোর, তার
মন লাগে না খেলায়
ছুটি পেলেই যায় সে ছুটে
সমুদ্দুরের বেলায়।

সেখানে সে বেড়ায় হেঁটে
এধার থেকে ওধার
বাড়ী ফেরার নাম করে না
হোক না যত আঁধার।

কুড়িয়ে তোলে নানা রঙের
নক্‌শা আঁকা ঝিনুক
এক একটি রতন যেন
নাই বা কেউ চিনুক।

বড়ো হয়ে ঝিনুক কুড়োয়
জ্ঞানের সাগরবেলায়।
ঝিনুক তো নয়, বিদ্যা রতন
মাড়িয়ে না যায় হেলায়।

বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে,
"কী আপনার বাণী।"
বলে গেছেন যা নিউটন,
পরম বিজ্ঞানী—

"অনন্তপার জ্ঞান পারাবার
রত্নভরা পুরী
তারই বেলায় কুড়িয়ে গেলেম
কয়েক মুঠি নুড়ি।"

বেড়াল বাঁচাও

লোকগুলো তো বেজায় বদ
করছে শুনি বেড়াল বধ।
ছি ছি ছি!

বেড়াল আমার ঝি!
তোর কপালে অপঘাত
আমি করব কী?

বেড়াল বংশ ধ্বংস করে
শান্তি পাবে কারা?
ইঁদুর বংশে ছেয়ে যাবে
পাড়ার পর পাড়া।

বাসাবদল

বাসাবদল খাসা বদল
সবই ভালো, কিন্তু
পথ চলতে সঙ্গে নেই
বিন্দি হেন জন্তু।

বিন্দি ছিল নিত্য সাথী
আমার প্রিয় কুকুর
পথও ছিল চারি ধারে
মাঝখানে তার পুকুর

এখন হাঁটি ফুটপাথেই
পদে পদেই আপদ্
কেমন করে সঙ্গে যেত
আমার সেই শ্বাপদ!

ঘুঘুডাঙার পাঁচালি

ঘুঘুডাঙার মারাদোনা
খেলা তোমার এ কী রকম?
এমনতরো করলে কিক
বলটা মাথায় লাগল ঠিক
পথের মাঝে পড়ে গিয়ে
বেয়ান আমার হলেন জখম।

পথ হয়েছে চলার জন্যে
পথ দিয়েই আসা যাওয়া।
কোথাও যদি যাবার থাকে
পড়তে কে চায় এই বিপাকে?
ছুটতে কে চায় হাসপাতালে
ট্যাক্সি যদি যায় রে পাওয়া?

বেয়ান আমার ভাগ্যবতী
ট্যাক্সি জোটে দৈবযোগে
ফোঁড়াফুঁড়ি ইত্যাদি সব
পোহান তিনি, থাকেন নীরব
বাড়ি ফিরেও ভোগেন ব্যথায়,
সান্ত্বনা কী, এ দুর্ভোগে!

অঁইঠা কেলার কাহিনী

হোক না কেন কালনাগিনী
  গোখরো কিংবা চিতি
কেলারা সব ধরতে জানে
  ওটাই ওদের রীতি
বিষদাঁতটা ভেঙে দিলে
  থাকে না আর ভীতি।

কেউ জানে না কোথায় বাড়ী
  কোথা থেকে আসে
কোথায় রওয়ানা হয়
  কোন্ সে প্রবাসে।
একমাত্র সাথী সাপ
  নিত্য থাকে পাশে।

ওদেরি একজন ছিল
  অঁইঠা নামে কেলা
ফী বছর দেখা দিত
  আমার ছেলেবেলা
ডালা খুলে দেখিয়ে যেত
  সাপেদের খেলা।

আমার সঙ্গে ভারি ভাব,
  বলত কানে কানে,
"সাপ মন্তর শিখিয়ে দেব
  কেউ যেন না জানে।
সাপ ধরতে পারবে তুমি
  থাকবে বেঁচে প্রাণে।

জারমহুরা দেব তোমায়
  দুর্লভ জিনিস
সাপে কাটা ঘায়ে লাগাও
  শুষে নেবে বিষ।
দাম নেব না, নেব শুধু
  পাঁচ টাকা বকশিশ।"

খেলাতে খেলাতে সাপ
  খায় সে ছোবল
ছোবল খেয়েও তবু
  হয় না কোতল।
এই দ্যাখ জারমহুরার
  কেমন সুফল!

কয়লা কালো মানুষটা
  সেলসম্যান ভালো
জারমহুরা জড়িবুটি
  ঠাক্‌মাকে গছালো
মন্তরটা শেখালো না
  আমায় ভুলালো।

আরসুলা

আরসুলা সে পক্ষী নয়
  শুনেছি কদ্দিন
আরসুলাকে ধরতে গেলে
  আরসুলা উড্ডীন।

আরসুলাকে ঝেঁটিয়ে মারি
  দেখি সে নেই বেঁচে
রাত্রে আমি শুতে গেলে
  দিব্যি বেড়ায় নেচে।

বাড়ী ছেড়ে পাড়ি দিই
নেইকো চালচুলা
শূন্য ঘরে রাজ্যি করে
সম্রাট আরসুলা।

পায়রা

পায়রা করে বকম বকম
দেখে ওদের রকম সকম
ইচ্ছে করে পুষি।
পায়রা এনে পুষতে গেলে
কিন্তু যদি খেয়ে ফেলে
ও বাড়ীর ওই পুষি!

পায়রা থাকে কার্নিশেতে
কেউ পারে না সেথায় যেতে
দিক না যতই লম্ফ
কেউ বাঁচাতে পারবে নাকো
ঘরের ভেতর যদি রাখো
বেড়াল দিলে ঝম্প।

মিষ্টান্নভুক

এই প্রাণী মাছ ভাত পায় নাকো খেতে
তাই খায় রসগোল্লা, রাবড়ি, সন্দেশ।
শহরের পথে ঘাটে রোজ যেতে যেতে
ময়রা দোকানে পাবে এদের উদ্দেশ।
এই প্রাণী বাস করে এশিয়া দক্ষিণে
বঙ্গোপসাগর প্রান্তে গঙ্গার দু'ধারে।
এক জাতি দুই দেশ নিতে হবে চিনে
মিষ্টান্ন সমান পাবে এপারে ওপারে।
উপমহাদেশ জুড়ে এদের প্রভাব
সবাইকে ধরিয়েছে "বঙ্গালী মিঠাই"
মিষ্টান্ন জগতে জেনো এরাই নবাব
যদিও এদের কারো ঘরে ভাত নাই।
দিল্লীকা লাড্ডুর চেয়ে মিলেছে সম্মান
ধন্য হলো, ধন্য হলো মিষ্টান্নবিজ্ঞান।

কসরত

বাল্যকালে ছিলেম আমি এতই কমজোরী যে
ফুঁ দিলেই পড়ি।
খেলার মাঠে ঠেলা খেয়ে ফুটবলটার মতোই
যাই যে গড়াগড়ি।
বাবা আমার দুঃখ বুঝে শিখিয়ে দিতেন যত্নে
ডন আর বৈঠক।
কসরতটা কঠিন বড়ো, সইত না তাই লুকিয়ে
হতেম পলাতক।

কাকা আমায় ধরিয়ে দিলেন একজোড়া ডাম-বেল
স্যাণ্ডো হব আমি।
মাংসপেশী ফুলিয়ে বেড়াই সবাইকে দেখিয়ে
আমার ষণ্ডামি।
বাড়ীতে দুই মুগুর ছিল, ভারী বলে ভাঁজেন না
বাবা কিংবা কাকা।
ভাঁজতে গিয়ে হাত থরথর, পা টলমল করে যে
শক্ত খাড়া থাকা।
শেষটা আমায় দেওয়া হলো পশ্চিমা এক কুস্তিগীর
দারোয়ানের হাতে।
কুস্তি শিখে লড়তে হবে পরমেশ্বর নামে সেই
পালোয়ানের সাথে।
ধুতী পরায় এঁটে সেঁটে গিঁটের পর গিঁট দিয়ে
মালকোচ্চা মারা।
প্যাঁচের পর প্যাঁচ লাগায়, পড়তে গেলে ধরে সে
আবার করে খাড়া।
কুস্তি লড়ি দুই জনাতে, একটুখানি লড়ে সে
অমনি হয় চিৎ।
"লড়কা আমায় হারিয়ে দিল," আপনি ওঠে চেঁচিয়ে,
"খোকাবাবুর জিৎ।"

উকুন

ওলো ও খুকুন!
তুই এতটুকুন!
তোর মাথায় কেন উকুন!
ওগো ও নানী!
তুমি তো নও কানী!
তোমার চোখে বুঝি ছানী!

Book No.
Date

টাক

টাক পড়ার
এই তো সুগুণ
টেকো মাথায়
হয় না উকুন।

খেলোয়াড়

খেলোয়াড়, তুমি মনে রেখো এই কথা
সব খেলাতেই জিৎ আছে আর হার আছে
হার যদি হয় সেটাও খেলার অঙ্গ
হার যাতে নেই তেমন খেলা কি আর আছে?
জীবনের খেলা সেখানেও এই রঙ্গ
জীবনের মাঠে জয় আছে পরাজয় আছে
জয় পরাজয় জীবনের দুই অঙ্গ
বেঁচে যদি থাকো পরে একদিন জয় আছে।

তাক ডুমা ডুম ডুম

তখন আমার বয়স কত?
হয়তো বছর পাঁচ
তখন কি ভাই বুঝতে পারি
ওটা কিসের নাচ?
নাচতে নাচতে খেলা করে
একটুকু ওই মাঠের পরে
সে কী নাচের ধুম!
সবাই মিলে চেঁচিয়ে ওঠে
তাক ডুমা ডুম ডুম।

ডাকে নাকো কেউ আমাকে
আমিও মুখচোরা
পাড়ায় ওদের নতুন আমি
পাড়ার ছেলে ওরা।
দু'হাত তুলে তালি পেটায়
মুখে যেন ঢোলক বাজায়
পা হড়কে দুম।
সবাই মিলে হল্লা করে
তাক ডুমা ডুম ডুম।

হয়তো আরো কথা ছিল
ঠিক পড়ে না মনে
নাকের বদল নরুন পাওয়া
কেন? কী কারণে?
কাহিনীটা নাইকো জানা
কোথায় পাব তার ঠিকানা
ছিল না মালুম।
শুনিয়ে গেল শুধু ওরা
তাক ডুমা ডুম ডুম।

আপেল

আপেল ছিল গাছের ডালে
ঘটল তার পতন
পতন কেন? উত্থান নয়
কেন ধোঁয়ার মতন?
নিউটন দেন উত্তর এর—
মাধ্য আকর্ষণ।

"আপেল" এবার উর্ধ্বে গেছে
কাটিয়ে মাটির টান
এখন থেকে করবে শুনি
শূন্যে অবস্থান।
কী জানি কোন্ তত্ত্ব হবে
এর থেকে প্রমাণ।

আপেল যদি শূন্যে ফলে
আমরা খাব কী?
আমরাও তার আকর্ষণে
শূন্যে যাব কি?
আমাদের এই যুগের ধাঁধার
জবাব পাব কি?

বিশ্ব টেনিস

ধন্যি ছেলে বরিস বেকার
ধন্যি মেয়ে স্টেফি গ্রাফ
উইম্বলডন টেনিস দেখে
ভাবছি এ কী! বাপ রে বাপ!

আমার কিন্তু প্রিয় পাত্রী
নয়কো স্টেফি, মার্টিনা
এই কি ছিল ভাগ্যে তার?
সইতে আমি পারছি না।

বেকার ভায়া জিতবেই তো
বয়সটা কম, শক্ত হাত
এড়বার্গের জন্যে তবু
করছি আমি অশ্রুপাত।

সাধ থাকাই যথেষ্ট নয়
সাধনা চাই সর্বথা
যুদ্ধকালে 'লাক' থাকা চাই
লাখ কথারি এক কথা

ইচ্ছে ছিল হতেম আমি
টেনিস খেলার চ্যাম্পিয়ন
লেখা পড়ায় মন না দিয়ে
দিতে হতো খেলায় মন।

খেলার বয়স ছিল আমার
তেরো থেকে তেষট্টি
বাইশ বছর হলো আমি
আর ধরিনি সে যষ্টি।

মারাদোনা

ধিনতা ধিনা পাকা নোনা
কাপ জিতেছে মারাদোনা।
দেখছি বসে টিভি খুলে
রাত্রি জেগে নিদ্রা ভুলে
মেকসিকোতে যাচ্ছে শোনা
"মারাদোনা"! "মারাদোনা"!

তা ধিনতা ধিনা ধিনা
বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা।
ফকল্যাণ্ডের যুদ্ধে হেরে
ইংল্যাণ্ডকে দিল মেরে
শোধবোধ অস্ত্র বিনা।
আর্জেন্টিনা! আর্জেন্টিনা!

চন্দ্রযান

বিজ্ঞানীরা নীরব কেন
কী হলো সেই চাঁদে যাওয়ার?
চন্দ্রযানের টিকিট পাব
কী হলো সেই টিকিট পাওয়ার?
চাঁদকে ছেড়ে তারায় নিয়ে
হচ্ছে কী সব গবেষণা?
ধরার সঙ্গে তারার যুদ্ধ
জল্পনা যার যাচ্ছে শোনা।
যুদ্ধ যেদিন সারা হবে
ধরা কি আর থাকবে বর্তে?

মর্ত্যলোকের বাসিন্দারা
কেউ কি বেঁচে থাকবে মর্ত্যে?
বাঁচতে পারে সবাই যদি
চন্দ্রে পালায় সময় থাকতে
কেঁচোর মতো কেই বা রাজী
গর্তে ঢুকে জীবন রাখতে?
বিজ্ঞানীরা কী না পারেন?
চাঁদের গায়ে লাগবে হাওয়া
চাঁদের বুকে ঝরবে জল
তখন হবে চাঁদে যাওয়া।

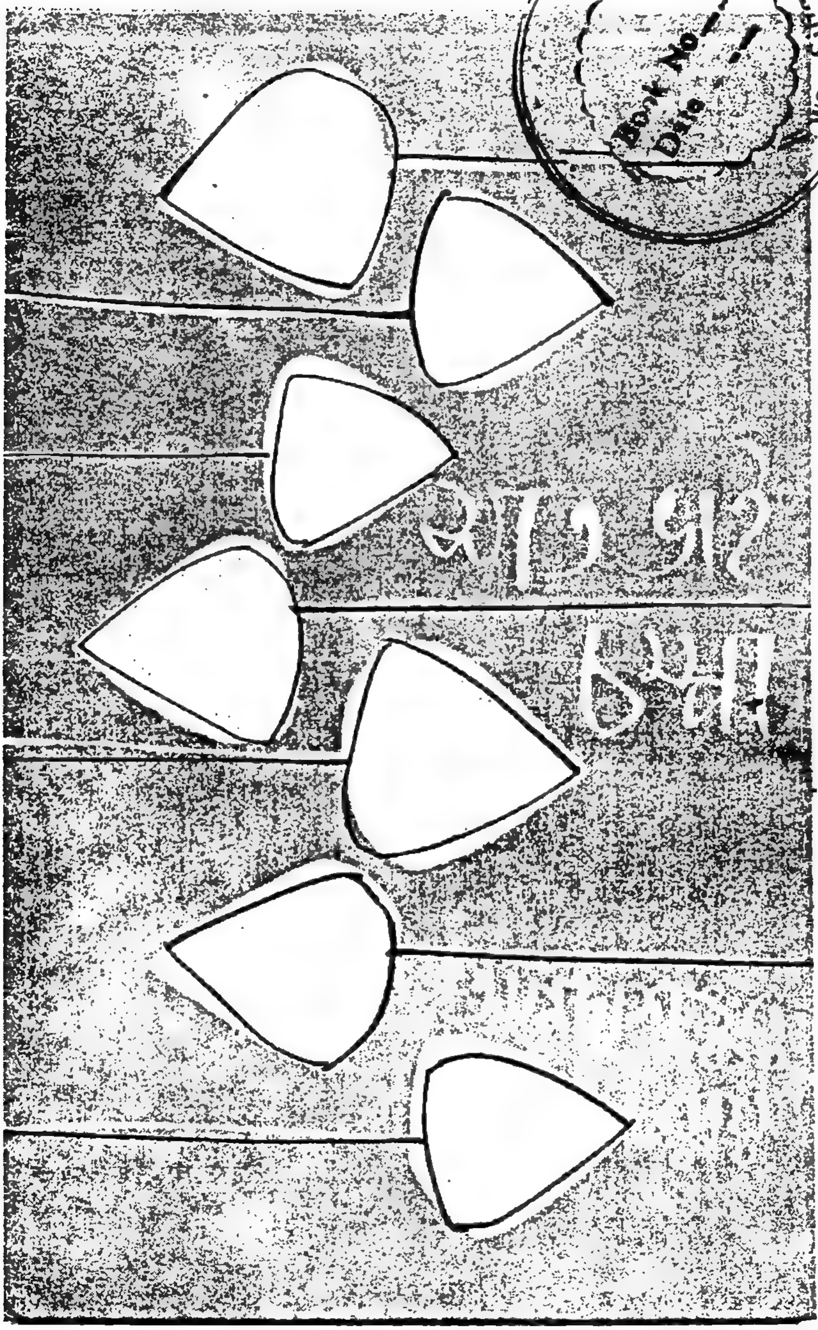

Book No.
Date

খুকুর জন্যে ছড়া

Book No.

উড়ো জাহাজ
উড়ো জাহাজ
ডানা মেলে
আয় রে আজ।

হেলিকপ্‌টার
হেলিকপ্‌টার
ভয় করে না
ঝড়ঝাপটার।

এরোপ্লেন
এরোপ্লেন
আকাশ তোমায়
হাওয়া দেন।
তাই তো তুমি ওড়ো
সকল দেশে ঘোরো।

১৯৫৫

চিতাবাঘ

চিড়িয়াখানার চিতাবাঘ!
খাঁচায় বন্দী চিতাবাঘ!
ওই অসহায় চিতাবাঘ!
    করল ওকে কানা!
কোন্ উল্লুক, কোন্ সে হাঁদা?
কোন্ মর্কট, কোন্ সে গাধা?
কোন্ শয়তান? এ কোন্ ধাঁধা।
    জবাব নাইকো জানা।

ধরতে পারলে দিতেম জেলে
থাকত খাঁচার মতন সেলে
বাইরে থেকে খাবার ঠেলে
    দিত জেলের দ্বারী

ওরাও কিন্তু কম পাজী নয়
ঢুকিয়ে লাঠি দেখাত ভয়
কত লোক যে অন্ধই হয়
    খোঁচা লেগে তারই।

কী বেদনা, চিতাবাঘ!
আমিও শরিক, চিতাবাঘ!
সেলাম করি, চিতাবাঘ!
    একটু দূরেই থাকি
দুয়ার খুলে গেলে, বাবা
আমার ঘাড়েই পড়বে থাবা
হাতে হাতে মিলবে খাবার
    ভুলব সেই কথা কি?

হংসো মধ্যে বকো যথা

ছিলেম আমি অঙ্কে কাঁচা
    গেলেম নাকো বিজ্ঞানে
বিজ্ঞানীদের হংস মাঝে
    সবাই আমায় বক মানে।

নইলে, ভায়া, আমিও হতেম
    আইনস্টাইন, নিউটন
নিদেন পক্ষে সার জগদীশ,
    সার বেঙ্কটরামন্।

না হলো এক নতুন তত্ত্ব
সর্বপ্রথম আবিষ্কার
না হলো এক নতুন যন্ত্র
উদ্‌ভাবন প্রথম বার।
না হলো এক নতুন তারার
আমার নামে নামকরণ
নতুন ধাতুর সঙ্গে আমার
পদবীটার সংযোজন।

স্বপ্ন ছিল স্বর্গে যাবার
গড়ব সিঁড়ি আমি হে
নয়তো আমি স্বর্গটাকেই
আনব নিচে নামিয়ে।
নোবেল প্রাইজ! নোবেল প্রাইজ!!
নইলে বৃথা এ বাঁচা
হায়রে কেন স্বপ্ন দেখে
অঙ্কশাস্ত্রে যে কাঁচা।

ভারতমাতার উক্তি

রাকেশ রাকেশ করে মায়
রাকেশ গেল কাদের নায়
তিনটা লোকে দাঁড় বায়
অকূল পারাবারে।
নীল আকাশে আরেক তারা
ওই তারাতে আছে কারা
রাকেশ ও তার সঙ্গী যারা
মহাশূন্য পারে?

ওদের চোখে এই ধরণী
দেখায় নাকি নীল বরণী
যেন এক নীলকান্তমণি
মহাশূন্যে ভাসে।
রাকেশ রাকেশ করে মায়
রাকেশ রে, তুই ঘরে আয়
আবার সেই উড়ন নায়
রাকেশ ফিরে আসে।

দাদু ও নাতনি

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
তোমরা তখন করছিলে কী
ভাঙল যখন বঙ্গ?

দিদি, আমরা তখন করতেছিলুম
ভা'য়ে ভা'য়ে দঙ্গ
আপন যদি পর হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
দঙ্গ কেন করতে গেলে
কাটতে দিলে অঙ্গ?

দিদি, আস্ত কেক খাবে বলে
পণ করেছে কঙ্গ
লীগ বলেছে, কাটতে হবে,
নইলে হবে জঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
ইঙ্গ ছিল রাজা, সে কি
বাধতে দিত জঙ্গ?

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
তাই যদি হয় তবে কেন
লড়লে রাজার সঙ্গ?

দিদি, রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে যে তার
অন্যরকম ঢঙ্গ।
দুই শরিকের খাঁই মেটাতে
রাজ্য হলো ভঙ্গ।

দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব
সিন্ধু থেকে গঙ্গ
সিন্ধু গেছে গঙ্গা আছে
স্বপ্ন হলো ভঙ্গ।

১৯৮৬

রণজি ট্রোফি

জামনগরের জামসাহেব
শ্রীরণজিৎ সিংজী
কাঠিয়াবাড়ের ক্ষুদে শহর
নয় কি সেটা ঘিঞ্জি?
বিলেত গিয়ে ক্রিকেট খেলায়
পেলেন রঞ্জি নাম
এক ডাকেই চেনে তাঁকে
দুনিয়া তামাম।

সেই রঞ্জির সঙ্গে আমি
এক জাহাজের যাত্রী
খাবার সময় দেখা পেতেম
দু'বেলা দিনরাত্রি।
ডিনার টেবিলে ঠাঁই
ক্যাপটেনের পাশে
সব চেয়ে সম্মানিত
তাতেই প্রকাশে।

ষাট বছর আগের কথা
পড়ছে মনে অদ্য
রঞ্জি ট্রোফি জয় করেছে
বাংলা টিম সদ্য।
থ্রী চীয়ার্স, বাংলা টিম
হিপ হিপ হুরে!
বাংলা থেকে বিশ্ব আর
নয়কো বেশী দূরে।

তিন পুরুষ

এক যে ছিল উপেন্দর
গল্প বলার যাদুকর।
তার যে ছেলে সুকুমার
ছড়ার সেরা রূপকার।

তার যে ছেলে সত্যজিৎ
চলচ্চিত্রে সর্বজিৎ।
তুলনা নাই অন্য
তিন পুরুষই ধন্য।

অবাক কাণ্ড

কই?
রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া
চিনিপাতা দই?
রাত্রে কখন উধাও হলো
শুনে অবাক হই।

ও কে?
জানলা দিয়ে চুপি চুপি
শোবার ঘরে ঢোকে।
আমায় দেখে যায় পালিয়ে
এখন দিবালোকে।

সাবাশ!
পাইপ বেয়ে নামলে পাই
দস্যিপনার আভাস।
কে বলবে নিরাপদ
দোতালায় যার আবাস?

হাসি!
ধরা পড়ে গেছ তুমি,
ওগো বেড়াল মাসী।
পাড়া বেড়ানী শাদা বেড়াল,
তোমায় ভালোবাসি।

পুসি,
এসো আবার এই বাড়ীতে
যখন তোমার খুশি।
চোরের মতন অমন করে
খেয়ো না, রাক্ষুসি।

মুন্না

সত্যি না এ গাঁজাখুরি?
মেলা থেকে ভালুক চুরি!
হায় বেচারা ভালুকওয়ালা,
প্যারিস গিয়ে এ কী জ্বালা!
ভালুক বটে বন্য প্রাণী,
পোষ মানালে অন্য প্রাণী।
যেমন বেড়াল যেমন কুকুর,
দুধ দিলে খায় চুকুর চুকুর।
খেলা শেখাও, শিখবে খেলা,
পাড়ার ছেলে জুটবে মেলা।
ডুগডুগিতে বাজবে বোল,
নাচবে ভালুক দোদুল দোল।

আসবে কাছে, চাটবে গা,
আঁচড়াবে না, কাটবে না।
চাইবে খেতে একটি কলা,
কলা পেলেই অমনি চলা।
চলবে আরেকজনের কাছে,
মহুয়া কি মজুত আছে?
ভালুক ভালোবাসে মউ,
শাড়ি পরে সাজে বউ।
হঠাৎ কাঁপে থরথর,
ওটা নাকি কম্প জ্বর!
মুশকিলটা কোথায়, জানো?
নাকে দড়ি হয় পরানো।

নয় কি এটা বর্বরতা
পশুর প্রাণে নেই কি ব্যথা?
তস্করেরা নয়কো অরি
দেয় খুলে তার নাকের দড়ি।
মুন্না এখন অন্য প্রাণী
ফের হবে সে বন্য প্রাণী।
ওরা তাকে লুকিয়ে রাখে
বনের মাঝে এক ব্যারাকে।
মাংস দিলে খাবে না সে
থাকবে বরং উপবাসে।

ভালুককে দেয় বাঘের খাবার
বোঝে না যে জানটা যাবার।
পুলিশ যখন পাত্তা পায়
মুন্না তখন মৃতপ্রায়।
খবর পেয়ে ভালুকওলা
খাওয়ায় তাকে সবরি কলা।
খাওয়ায় মধু, কেন্দু ফল
মুন্না আবার হয় সবল।
আবার পরে নাকে দড়ি
প্যারিস ছাড়ে তড়িঘড়ি।

কাকাতুয়া

কেষ্টমামার ছিল খানদানি শখ
আনালেন কাকাতুয়া শুভ্রপালক।
ঝুঁটি তার লাল কি না পড়ছে না মনে
তিন কাল গত হলো, পড়বে কেমনে?
বৈঠকখানা ঘরে উঁচু এক দাঁড়
সেইখানে বসে থাকে নিথর নিসাড়।
কোন্ দূর বিদেশের আজব সে পাখী
অধোমুখে চেয়ে থাকে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
মুখ দেখে মনে হয় মনে নেই সুখ
বেচারিকে নিয়ে করি মিছে কৌতুক।

আর সব পাখীদের সাথী যায় দেখা
ওর কোনো সাথী নেই, একেবারে একা।
কত না পাখীর গায়ে বুলিয়েছি হাত
একে আমি দূর থেকে করি প্রণিপাত।
হাত বুলাবার ছলে বলি, "কাকাতুয়া,
এনেছি তোমার তরে সুজির হালুয়া।"
কথা শুনে হেসে খুন কেষ্ট মাতুল
"ককাটু বাঙালী নয়, ওরে ও বাতুল।
আলাপ করার আগে ইংরেজী শেখ
নিয়ে আয় বিস্কুট, নিয়ে আয় কেক।"

এলসা

বাড়ীতে ডাকত না কেউ
ঘেউ ঘেউ
আহা কী মিষ্টি সে ডাক।

নাতনি আনল একে
কটক থেকে
এসেই অমনি কী হাঁক।

পাহাড়ী ক্ষুদে কুকুর
চুকর চুকুর
দুধ খায় বাটি চেটে।

মাংস দেয় না মুখে
মনের সুখে
কলা খায় খালি পেটে।

ডিম দাও, খাবে ঠিকই
আরো কী কী
ভাত আর পাতা দই।

বসবে থাবা পেতে
আদর খেতে
গিলবে কাগজ বই।

মোজাটার কোথায় জুড়ি
গেছে চুরি
চোর কে বলতে মানা।

সোনালি গায়ের লোম
যেন পশম
এলসা নামে জানা।

তা বলে সিংহী ও নয়
অতিশয়
নিরীহ পোষা প্রাণী।

বাড়ীতে এলে কেউ
ঘেউ ঘেউ
কী তার তড়বড়ানি!

বিপত্তি

দাদুর কেমন মতিভ্রম ·
পা পিছলে আলুর দম।
চানের ঘরে ঢুকতে যেয়ে
দাদু পড়েন আছাড় খেয়ে।
চানের ঘর বেশ পিছল
মেজের উপর চানের জল।
ভাগ্য ভালো, হাড় ভাঙেনি
মাথাতেও চোট লাগেনি।
দুই হাঁটুই বেশ জখম।
দুই হাতেরও শক্তি কম।
পাছার উপর ভর দিয়ে
দাদু চলেন ঘষড়িয়ে।
পাশেই তাঁর শোবার ঘর
দাদু গড়ান মেজের পর।
খাটের পায়া জড়িয়ে ধরে
ওঠেন তিনি খাটের পরে।
দাঁড়ান বাবু, হাঁটেন বাবু
দাদু কি হন এতেই কাবু!

ফলার

ইচ্ছে করে কী কী খেতে বলছি শোন, দাদু।
স্বাদু
স্বাদু আম, স্বাদু জাম, সুস্বাদু কাঁঠাল।
তাল
তাল পাকলে তালও স্বাদু, স্বাদু নারিকেল।
বেল

বেল পাকলে কাকের কী? আমার প্রিয় খাবার।
সাবাড়
সাবাড় করি একাই আমি গাছের যত কুল।
ভুল
ভুল করিনে গাছে উঠে পেয়ারা ভক্ষণে।
মনে
মনে আছে আঙুর ভোজ, যদিও শুনি টক।
শখ
শখ তো খেতে কমলা লেবু বড়দিনের প্রাতে।
রাতে
রাতে সেটা মোজায় ভরে মাথার পরে ঝোলা।
খোলা
খোলা হলে বেজায় মজা। চাই কি আর কিছু
লিচু
লিচু খেলেই ক্ষান্ত আমি, লিচুই পরম স্বাদু,
দাদু।

পালাবদল

কী বার পাবে তুমিই ট্রোফি
তুমিই করবে বিশ্ব জয়.
বোরিস বেকার, এটা তো ভাই
খেলোয়াড়ের ধর্ম নয়।

ট্রোফি তোমার মনোপলি
তুমিই কেবল করবে লাভ
খেলোয়াড়ি নয় গো এটা,
বোনটি আমার, স্টেফি গ্রাফ।

তোমাদেরই দুঃখে আমি
যদিও দুঃখী অতিশয়
তবুও বলি, মাঝে মাঝে
হেরে যাওয়া মন্দ নয়।

অন্যরাও সুযোগ পাক
খেলায় জিতে ট্রোফি নিক
মাঝে মাঝে পালাবদল
এটাই ভালো, এটাই ঠিক।

বার্সেলোনা!

বার্সেলোনা! বার্সেলোনা!
যেতেম যদি পেতেম সোনা।
চিৎ সাঁতারে ডুব সাঁতারে

আমার সঙ্গে কেউ কি পারে?
হয়তো পারে উচ্চ লাফে।
পারবে কেন লম্বা ঝাঁপে?

যখন ছিলেম লণ্ডনে
পারত না কেউ হণ্টনে।
দেয় কি সোনা অলিম্পিকে
শতরঞ্চের খিলাড়িকে?
বার্সেলোনা! বার্সেলোনা!
আমার ভাগ্যে নাইকো সোনা।
দেখছি দূরদর্শনেতে
কেউ বা হারে, কেউ বা জেতে।

সবাই ভালো, সবাই ভালো
কেউ বা শাদা, কেউ বা কালো
হলদেরাই জিতল সেবার
জিতব না কি আবার এবার?
বার্সেলোনা! বার্সেলোনা!
ভারতকে দাও একটি সোনা!
একটিও না, একটিও না—
এ কী বিচার, বার্সেলোনা!

অলিম্পিক দৌড়

অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি শাঠ্যে বেন জনসন
হত নয়কো, হতমান সে।
ঘটনার পর কী অঘটন।

দৌড়য় সে ক্ষিপ্র পায়ে
মাটির উপর হাওয়ায় ওড়ে
রেকর্ড ভাঙে প্রথম হয়ে
সোনা জেতে পায়ের জোরে।

সবাই করে হর্ষধ্বনি
জগৎ জুড়ে যায় তা শোনা
ধন্য ধন্য বেন জনসন
অলিম্পিকে জিতল সোনা।

তার পর কী ট্র্যাজিক ব্যাপার
ধরা পড়ে পরীক্ষায়
দৌড়বাজির আগেই বেন
নিষিদ্ধ এক ওষুধ খায়।

নেশার ঘোরে জেতে যে জন
বাতিল তার বাজির জয়
ফেরত দিতে হয় সে সোনা
সেটা যে তার পাওনা নয়।

ম্যাজিক যেন দেখে সবাই
বিশ্বজয়ী নিঃস্বপ্রায়
বাতিল, তবু দৌড়নো তার
কী অপরূপ। ভোলা কি যায়!

খেলার মাঠে

গোল করছে হাজার জনা
    'গোল।' 'গোল।' 'গোল।'
আকাশ যেন ভেদ করছে
    তাদের হট্টগোল।

আমিই যেন গোলকর্তা
    খেলছি রাইট আউট
তোমরা যেন বাইরে খাড়া
    করছ শুধু শাউট।

এমন সময় হলো আমার
সোনার স্বপ্ন ভঙ্গ
দেখি আমার লাথি খেয়ে
কাঁপছে খাটের অঙ্গ।

স্বপ্ন যদি সত্য হতো
আমি হতেম হীরো
আমার সঙ্গে তুলনাতে
তোমরা হতে জীরো।

পাশাখেলার রাজা

আর যা খুশি খেলতে পারো
খেলিও না পাশা
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গেল
পাশা সর্বনাশা।

ছেলেবেলায় বসত আসর
আমাদেরই বাসায়
হোমরা যত চোমরা যত
হাজির হতেন পাশায়।

অমুক বাবু গর্জে ওঠেন,
দশ দুই বারো
তমুক বাবু তর্জে ওঠেন,
চোপ। কচ্চে বারো।

কী যে ওর মোদ্দা
আর কী যে ওর মানে
সাত বছরের খোকা
কিছুই না জানে।

সবার চেয়ে প্রবীণ যিনি
সবার চেয়ে তাজা
আমরা তাঁকেই বলতেম
পাশা খেলার রাজা।

খাজনা বন্ধ খেলায় তিনি
প্রজার দলের নেতা
আসল রাজার সঙ্গে খেলায়
হলো নাকো জেতা।

জেলে না হোক নির্বাসনে
তিনি নিরুদ্দেশ
পাশাখেলার পর্বটাও
সেখানেই শেষ।

খেলার রাজা পাশা আর
রাজার খেলা পাশা
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গেল
পাশা সর্বনাশা।

কিস্‌সা বিশ্বকাপকা

মারাদোনা! মারাদোনা!
খেলা যাদের নেশা তারা
করে তোমার আরাধনা।
বিশ্বকাপের খেলার শেষে

আজকে তাদের কী বেদনা!
ঘাটে এসে ডুবল তরী
এ কী বিষম দুর্ঘটনা!
জার্মানরা পেনালটিতে

করল যেন তুলোধোনা!
কী বেদনা! কী বেদনা!
মারাদোনা! মারাদোনা!
নালিশ করে ফল কী হবে
কে করবে বিবেচনা?
এখন থেকে করো শুরু
বিশ্বকাপের দিবস গোনা।
চারটি বছর পরে আবার
খেলার মাঠে দেখাশোনা!
আর্জেণ্টিনা জিতবে আবার
ফিরে পাবে জয়ের সোনা।
ভুলে যাবে এ বেদনা।

ওটিয়া জরী

জরী। জরী। ওটিয়া জরী!
জরীকে আজ স্মরণ করি।
নয় সে পুকুর, নয় সে ডোবা
গড়খাই যে গড়ের শোভা
তারই খানিক লুপ্তাবশেষ
জলের তাতে কিছুটা রেশ।
সেই জলেতে নাইতে যাই
সাঁতার কাটা শিখতে চাই।
সাঁতার শেখায় দিদেই কাকা
কাকা সে নয়, এমনি ডাকা।
বামুন ঠাকুর খুব পুরাতন
ঠাকুরমার সে ছেলের মতন।
সাঁতার কাটার ধরলে নেশায়
জলের থেকে উঠতে কে চায়।
কান ধরে সে ওঠায় আমায়
আমার সাধের সাঁতার থামায়।
দিদেই কাকা রাঁধবে কখন
সবাই তাকে বকবে তখন।
পথ চলতে বলত গল্প
পড়ছে মনে অল্প স্বল্প।
"এই বয়সেই তোর জীবনে
চিন্তা এসে গেছে মনে।"
বয়স তখন সাত কি আট
হয়নি শুরু স্কুলের পাট।
সেই যে আমার দিদেই কাকা
হলো না তার চাকরি রাখা।
খাবার বেলা অন্ন জোগায়
নাবার বেলা সঙ্গে যে যায়
জ্ঞান অবধি প্রিয় যে জন
চাকর শুধু, নয় সে আপন?
"খোকা রে, আজ যাচ্ছি চলে
ফিরব না আর কোনো ছলে।
বলছি তোকে যাবার সময়
এ সংসারে কেউ কারো নয়।"
বিদায় নিল করুণ মুখে
বাজল ব্যথা আমার বুকে!
জরী। জরী। ওটিয়া জরী!
সেথায় নাওয়া বন্ধ করি।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি

ভাবছি আমার এই জীবনে
  কী হলো না করা
বঁড়শি দিয়ে পুকুরপাড়ে
  হলো না মাছ ধরা।

গেলেই দেখি ছিপটি হাতে
  বালক থেকে বুড়ো
কেউ বা কারো ঠাকুরদাদা
  কেউ বা কারো খুড়ো।

সবার মুখে কুলুপ আঁটা
  ঠারে ঠোরে চালায়
মাছের কানে পড়লে কথা
  মাছটা পাছে পালায়।

এক আসনে উপবেশন
  সকাল থেকে সন্ধ্যে
যোগী ঋষির মতন ভোর
  কিসের আনন্দে।

কী একাগ্র দৃষ্টি, আহা!
  কী অভিনিবেশ হে।
কী অসীম ধৈর্য আর
  কী অসহ্য ক্লেশ হে।

কত যে কৌশল লাগে
  খেলতে ও খেলাতে
দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখি
  একটুকু তফাতে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি
  সেই যে মহা তত্ত্ব
স্বচক্ষে দর্শন করি
  সেটা কেমন সত্য।

ধৈর্য ধরা শক্ত, তাই
  হলো না মাছ ধরা
তার চাইতে অনেক সোজা
  এগজামিনের পড়া।

সেসব জাহাজ

সেসব জাহাজ গেল কোথা?
  এক একটার যা বহর
সাগরজলে ভাসত যেন
  এক একটা দ্বীপ শহর।
  আহা জাহাজ রে!

কী না ছিল সেই জাহাজে
  হোটেল এবং খানা
লম্বা লম্বা রাস্তা, যাকে
  ডেক বলে যায় জানা।
  আহা জাহাজ রে!

ডেকের উপর চলাফেরা
  সকাল সন্ধ্যেবেলা
রবারের রিং হাতে
  ডেক টেনিস খেলা।
  আহা জাহাজ রে!

ক্যাবিনেতে মাথা গুঁজি
  রাতে কয়েক ঘণ্টা
কারাগারে বন্দী হয়ে
  ছটফটায় মনটা।
  আহা জাহাজ রে!

কোথায় গেল সেসব জাহাজ
প্লেন কি তাদের সমান?
প্লেনেতে কি দশ জনাতে
তাসের আড্ডা জমান?
আহা জাহাজ রে!

মিসিং

লোকটা ছিল দিলদরিয়া
টাটকা চায়ের আমেজ পেতে
যেত চলে তিনধরিয়া।
কটেজ ছিল সেখানে তার
মধ্যিখানে চা বাগিচার
তাজা চায়ের আঘ্রাণটা
নিত টেনে শ্বাস ভরিয়া।

পাহাড়িয়া লাইন ধরে
খেলনা সেই ট্রেনে চড়ে
কী যে মজা পেত যখন
বুক কাঁপত ধড়ফড়িয়া!
লোকটা ছিল দিলদরিয়া।

হায় রে চায়ের পেয়ালাতে
হঠাৎ কেন তুফান মাতে
বোমা ফাটে গুলী ছোটে
জান বাঁচাতে হয় মরিয়া।
লোকটা ছিল দিলদরিয়া।

তখন থেকেই চাচা মিসিং
বলতে পারেন সুবাস ঘিসিং
কোথায় আছে কেমন আছে
চায়ের রসে প্রাণ ধরিয়া।
লোকটা ছিল দিলদরিয়া।

বাবু তো বাবু

বাবু তো বাবু গোকুলবাবু
বলত লোকে সেকালে
সেসব বাবু লুপ্ত যেমন
ডাইনোসর একালে।

গেলেন বাবু বৃন্দাবনে
সঙ্গে গেলেন নফর
হুকুম হলো, ছড়াও টাকা
রাজপথের ওপর।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়

যে যা পারে লোটে
"রাজাবাবু কি জয়",
হাজার মুখে ফোটে।
বিশটি দিনে বিশটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য।

কাশীধামে গেলেন বাবু
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হলো, দাও আধুলি
রাজপথের ওপর।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"জয় বাবুজি! জয় বাবুজি!"
হাজার মুখে ফোটে।
বিশটি দিনে দশটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য।

পুরীধামে গেলেন বাবু
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হলো, ছড়াও সিকি
রাজপথের ওপর।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"বাবু তো বাবু গোকুলবাবু",
হাজার মুখে ফোটে।
বিশটি দিনে পাঁচটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য।

বাবু গেলেন নবদ্বীপে
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হলো, পয়সা ছড়াও
রাজপথের ওপর।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"বেঁচে থাকো, গোকুলচাঁদ",
হাজার মুখে ফোটে।
দশটি দিনে একটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য।

জমিদারি উঠল লাটে
শেষটা হলো নিলাম
বাবু বলেন, "কৃষ্ণের ধন
কৃষ্ণকেই দিলাম।"

টেকটেকাউঁ

নতুন কাকি, টেকটেকাউঁ
নতুন কাকি টেকটেকাউঁ
ওই কথাটার কী যে মানে
এই বয়সে খুঁজে না পাঁউ।
আমিও তো নতুন শিশু
বয়স তখন বছর দু'তিন
যখন খুশি বানাই কথা
খামখেয়ালি অর্থবিহীন।

কথার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
হঠাৎ বাধাই কাণ্ড নানা।
কাকির পাতে পেছন থেকে
দিই ছেড়ে এক বেড়ালছানা।
আমার যখন হো হো হাসি
কাকির তখন চক্ষে জল
খাওয়া মাটি দাঁত কপাটি
সবাই করে কোলাহল।

বেড়ালছানা মিয়াও করে
লম্ফ দিয়ে হয় উধাও
আমিও তখন কান্না জুড়ি
নতুন কাকি, একটু খাও।

কাকির যখন মিষ্টি হাসি
আমার তখন চক্ষে জল
কাকির পাতে আমিও বসি
কান্না নাকি খাবার ছল।
টেকটেকাউঁ
নতুন কাকি, টেকটেকাউঁ।

সবুরে মেওয়া ফলে

মাধ্যমিক পাশ করবে প্রথম বিভাগে
সবার মাঝে হবেই প্রথম
পাশ করেছে ঠিকই, তবে তৃতীয় বিভাগে
লোকের চোখে হয়েছে অধম।

কচি মেয়ে ওর বয়সে খেলাধূলাই সাজে
পড়াতে কি মন বসতে চায়
ছেলেবেলা হারিয়ে গেলে যতই তাকে ডাকো
আসবে নাকো আর সে পুনরায়।

আট বছরে মাধ্যমিক পনেরোতে এম এ
হয়তো ফের তৃতীয় বিভাগে
চশমা চোখে শীর্ণকায় বঙ্কিম গড়ন
কন্যাটিকে দেখলে মায়া লাগে।

মানাবে না তখন তাকে কিশোরীদের মাঝে
মানাবে না বড়দেরও দলে
কুড়িতেই বুড়ি হবে ডাক্তারি পড়লে
মানাবে না বিয়ের কনে বলে।

সবুরেই মেওয়া ফলে, এই যে প্রবচন
সত্য বলে জেনো সুনিশ্চয়
বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমার সেও একটি মেওয়া
সবুর কর, ফলবে নিশ্চয়।

কুচকাওয়াজ

সূত্র। ওরা বলে লেফট রাইট
আমরা বলি ঘাস বিচালি

ঘাস বিচালি ঘাস বিচালি
কদম কদম চলছি খালি।
চলছি খালি কদম খালি
পড়ছে পথে খ্যাঁকশিয়ালি।
খ্যাঁকশিয়ালি খ্যাঁকশিয়ালি
নয়কো ওটা, কাঠবিড়ালি।
কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি
পালায়, আসে শম্ভু মালী।
শম্ভু মালী শম্ভু মালী
ফুল তুললে পাড়ত গালি।
শম্ভু মালী শম্ভু মালী
লোকটা আমার চোখের বালি।

চোখের বালি চোখের বালি
নয়কো বুড়ো মেহের আলী।
মেহের আলী মেহের আলী
সব ঝুটা হ্যায় বলত খালি।
বলল আমায় মেহের আলী
যাচ্ছ মিছে কদমখালি।
যাও ফিরে যাও গঞ্জবালী
বলল আমায় মেহের আলী।
ঘাস বিচালি ঘাস বিচালি
কদম কদম গঞ্জবালী।

১৯৯২

মারবেল খেলা

তোমরা বল মারবেল আর
আমরা বলি মারগুলি
সোডাওয়াটার বোতল ভেঙে
বার করে নিই তার গুলি
একটি দুটি তিনটি করে
অবশেষে চার গুলি।

সোডাওয়াটার বোতল বটে
ভিতরে তার লেমনেড।
নয়তো সেটা ভিন্ন রঙের
ভিন্ন স্বাদের ডিঞ্জারেড।
আর নয়তো পাইনেপল
দোকানঘরেই রেডিমেড।

চার জনাতে খেলা জমে
মেঝের উপর উৎসব।
আঙুল দিয়ে ঠোকা মারা
ঠোকাঠুকি সেই সব।
পড়াশুনার পাট ছিল না
ছিল যখন শৈশব।

জলের দাম জলের মতো
এক আনা কি আধ আনা
বোতল ভাঙার খেসারত
এক এক টাকা জ'রমানা।
কান মলা আর নাকে খত
তাই ও খেলা আর না, না।

১৯৮৯

ভোজবাজি

বাজিকর। এই দেখ দুই হাত খালি
এই দেখ দুই হাত মুঠো
এই দেখ দুই মুঠো খোলা
উড়ে গেল বুলবুলি দুটো।

খোকা। তাজ্জব!

বাজিকর। এই দেখ দুই চোখ বাঁধা
এই দেখ দুই চোখ খোলা
দু'চোখের দুইটি গোলক
হয়ে গেল সোনার দুটি গোলা।

খোকা। তাজ্জব!

বাজিকর। কাঁউরি হাড়ের নাম শুনেছ কি, খোকা?
এই হাড় আছে, তাই দিতে পারি ধোঁকা।
কোথাও যায় না পাওয়া এ কাঁউরি হাড়
পেতে হলে যেতে হয় কামাখ্যা পাহাড়।

খোকা। আমি যদি যাই?

বাজিকর। আরে না, না, ভাই।
কামরূপে যেই যায় বনে যায় ভেড়া
জীবনে হয় না তার আর বাড়ী ফেরা।

খোকা। ফিরেছ তুমি তো।

বাজিকর। আমি জানি মন্তর, ভেড়া বনিনি তো।
আগে তুমি বড় হও, শেখাব মন্তর
আনবে কাঁউরি হাড়, হবে বাজিকর।

কপিলাস যাত্রা

রামের জন্মভূমি নয়, সীতার আঁতুড়শাল
দেখতে যারা চায় তারা যায় ঢেঙ্কানাল।
ওই শহরের একটু দূরে শৈল কপিলাস
ওইখানেই হয়েছিল সীতার বনবাস।
ত্রেতাযুগের ঘটনাটার প্রমাণ ভূরি-ভূরি
শিখরে রয়েছে পড়ে ঠিক তিনটি নুড়ি।
লব কুশ সীতা ছাড়া আর কে হতে পারে?
খর্ব হয়ে গেছে ওরা বয়সের ভারে।
তমসা সেই নদী এখন ঝরনা হয়ে গেছে
উপর থেকে ধাপে-ধাপে নামছে নেচে-নেচে।
শিবের মন্দির আজ কপিলাসের দর্প
শিবের শিরে ফণা তোলে সোনার এক সর্প।
যাত্রী যারা আসে তারা থাকে না রাত্তিরে
বাঘ নাকি গর্জায় অরণ্য গভীরে।
বছরে একটি রাত এর ব্যতিক্রম
শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রী সমাগম।
হাজার হাজার দীপ জ্বলে সারা রাত্রি
জাগর পালন করে উপবাসী যাত্রী।
সে রাতে যায় না শোনা হালুম হালুম
বাঘও উপোস করে হয় তা মালুম।

Book No.
Date

১৯৯৩

বাঘ সিংহের লড়াই

খোকা। বাঘ সিংহের লড়াইতে কে জিতবে, সার?

শিক্ষক। তুমিই বলো, শুনতে চাই উত্তর তোমার।

খোকা। সিংহই তো বনের রাজা রাজশক্তিধর
সিংহই জিতবে রণে, আমার উত্তর।

শিক্ষক। বুদ্ধি যার বল তার, শাস্ত্রের বচন

সিংহ নয় বুদ্ধিমন্ত বাঘের মতন।
বলে না জিতুক বাঘ জিতবে কৌশলে
সিংহ তো নামেই রাজা, বাঘই আসলে।
অভিমানে সিংহ গেছে বাকী ভারত ছেড়ে
লুকিয়ে আছে গুজরাতের শুধু একটি টেরে।

খোকা। এ কী কথা! সবাই জানে সিংহই মহৎ
মহত্ত্বের পরাভব সইবে কি জগৎ?

শিক্ষক। কোনও দিন কমবে না মহতের মান
তার বেলা হার জিৎ উভয়ই সমান।
সিংহ পদবী ধরে লক্ষ লক্ষ জন
বাঘ পদবী তো কেউ করে না ধারণ।
তুমিও হারতে পারো বলপরীক্ষায়
তোমার মহত্ত্ব যেন তবু না হারায়।

কিশোর দিনের স্মৃতি

দক্ষিণেতে গড় পাহাড়
সেইখানেই গড়ের পার।
তার এদিকে গড়খাই
সেথায় যেতে ডর পাই।

একটু যদি দেয় হাওয়া
বাঘের গন্ধ যায় পাওয়া।
তার এদিকে রাজপ্রাসাদ
পাহাড় কেটে বনিয়াদ।

তাই তো এমন উচ্চশির
প্রতিষ্ঠাতা সে এক বীর।
লৌহ কপাট সামনে দ্বারী
প্রবেশ মানা রাজার বাড়ী।

থিয়েটারের দলের সাথে
আমিও ঢুকি একটু রাতে।
কখন যে হয় বন্ধ ফাটক
ফিরতে গিয়ে দেখি আটক।

চক্ষে যখন অন্ধকার
তখন খোলে গুপ্ত দ্বার
বেরিয়ে আসি সুড়সুড়িয়ে
ওইটুকু ওই ফোকর দিয়ে।

তার এদিকে দেওয়ান কুঠি
পুত্রটি তাঁর আমার জুটি।
তার এদিকে খেলার মাঠ
সেই আমাদের রাজ্যপাট।

ফুটবলেতে ঠেলাঠেলি
চারজনাতে টেনিস খেলি।
তার এদিকে রাজবাগান
পুকুরে তার নিত্য স্নান।

ফুলটা তুলি ফলটা পাড়ি
মালীর সঙ্গে নিত্য আড়ি।
লিচু গাছে এত লিচু
আমি কি তার পাইনে কিছু?

গাছ ভর্তি গোলাপ জাম
আমরা খেলে রাজার নাম।
তেড়ে আসে সেই যে মালী
পালাই দেখে পাড়ে গালি।

সটকে পড়ি বেড়ার ফাঁকে
"রাগ কোরো না," বলি তাকে।

বাল্যকালে

মহরমের মিছিল যেত বাড়ীর সমুখ দিয়ে
দাঁড়াত খানিকক্ষণ তাজিয়া নামিয়ে।
লাঠিখেলা চলত যেন খেলা তো নয় রণ
কারবালার সেই যুদ্ধের ক্ষুদ্র অনুকরণ।

লাঠালাঠি করত ওরা এমন কৌশলে
কারো অঙ্গে লাগত না চোট সংঘাতের ফলে।
হঠাৎ দেখি মরুর বুকে বেঙ্গলের বাঘ
হলুদ বরণ গায়ে যে তার কালো ডোরার দাগ।

দুই চোখে তার গোল চশমা নীলবরণ কাচ
ঢাকের বোলে তালে তালে চলে বাঘের নাচ।
বাঘের ভয়ে আমি তো প্রায় হারাই সংবিৎ
আরে ও যে এই পাড়ারই শিরিয়া নাপিত।

হিন্দু ঢাকী হিন্দু বাঘ হিন্দু লাঠিয়াল
হায় রে কবে মিলিয়ে গেল সেসব দিনকাল।
ঠাকুমার মানত ছিল আবার মহরমে
লাঠিখেলা খেলব আমি পরম বিক্রমে।

বছর দশেক বয়েস যার, দেখতে পাঁকাটি
জোয়ানদের সঙ্গে কিনা সে খেলবে লাঠি!
আমার কিন্তু মনে মনে বাঘ নাচতে সাধ
ঢাকের বাদন বাঘের নাচন অপূর্ব তার স্বাদ।

সেই বারেই ক্ষান্ত হলো কারবালার রণ
ঠাকুমার মানত আজো হয়নি পূরণ।
বাঘের নাচ ভুলিনিকো মনে মনে নাচি
অপূর্ণ সেই সাধ নিয়ে আজো বেঁচে আছি।

এক যে ছিল ছাগল

বিয়ের আগে একাই থাকি
কেউ থাকে না সাথে
আউটহাউস একটু দূরে
বেয়ারা শোয় তাতে
ডিনার শেষে বাবুর্চি যায়
আপন বাড়ী রাতে।

সুখেই জীবন কাটছিল বেশ
দিনের বেলা কাজ
সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে খেলা
পরে অন্য সাজ।
ডিনার খেয়ে লেখা শুরু
থামি রাতের মাঝ।

সুখেই আছি এমন সময়
ছাগল করে ব্যা
"কিস্‌কা বকরি, আবু মিয়া?"
বলি, "ব্যাপার ক্যা?"
রান্নাঘরে ছাগল বাঁধা
কিসের তরে? অ্যাঁ!

"এ বকরি বেগানা হ্যায়,
বাগানে আপনার
কোন্ পথে যে ঢুকল এই
বদমাশ জানোয়ার।
পাকড়ে একে বেঁধে রাখা
জরুর দরকার।

হুজুর যদি হুকুম দেন
নেব আমার ঘরে
খুঁজতে হবে মালিক কে এর
সকাল হলে পরে।
সেটা তো আর যায় না ধরা
রাতের অন্ধকারে।"

কথাটা খুব সত্যি, তবু
আমার মনে সন্দ
প্রলোভনটা বেজায় বেশি
মতলবটা মন্দ।
ছাগল যদি যায় উদরে
কে করবে বন্ধ?

"বাগানের বকরি তুমি
বাগানে দাও ছেড়ে
রাস্তা দিয়ে নিতে গেলে
আসবে লোকে তেড়ে।
কেউ না কেউ নিজের বলে
অমনি নেবে কেড়ে।"

"জো হুকুম। কিন্তু, হুজুর,
কাছেই থাকে শেয়াল
রাতের মাঝে কখন আসে
কেই বা রাখে খেয়াল।
বেড়া তো নয় তেমন উঁচু
নেই তো পাঁচিল দেয়াল।"

হুঁশিয়ারি জানিয়ে আবু
গেল আপন ঘর
হুক্কাহুয়া শুনে আমার
নিজের হলো ডর।
ছাগলটাকে নিয়ে গেলুম
বাংলোর ভিতর।

শুতেও যাই ঘুমও আসে
হঠাৎ শুনি ব্যা
চমকে উঠে সুধাই তাকে,
বলি, "ব্যাপার ক্যা?"
কাছে এসে গাল চেটে দেয়
এ কী কাণ্ড! অ্যাঁ!

চুপটি করে শুয়ে থাকে
আমার খাটের নিচে
আমিও তখন চুপটি করে
ঘুমিয়ে পড়ি নিজে।
কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারি
নিদ্রা যাওয়া মিছে।

কখন উঠে হাঁটছে ওটা
ঘরময় খটখট
বন্ধ ঘরে আটকা থেকে
প্রাণটা কি ছটফট?
শয্যা ছেড়ে উঠি আমি
দীপ জ্বালি চটপট।

একটু রেগে গিয়ে আমি
দুয়ার দিলুম খুলে
শেয়াল যদি আসে আসুক
নিক না ওকে তুলে
কেন ওকে বাঁচাতে যাই
সুখের নিদ্রা ভুলে?

আহা! আহা! কেষ্টের জীব!
হলোই বা নির্বোধ
একটা রাতের নিদ হারাতে
কেন আমার ক্রোধ?
শেয়াল কেন খাবে ওকে
করব আমি রোধ।

আপনি আসে ফের ভিতরে
আবার করে ব্যা
এবার আমার কান্না পায়
আমিও করি ভ্যাঁ।
ব্যা! ভ্যাঁ! ব্যা! ভ্যাঁ!
পাল্লা দিয়ে? হ্যাঁ।

গলাটা তার জড়িয়ে ধরে
ঘুম পাড়াই তাকে
মাথায় দিই হাত বুলিয়ে
খুঁজছে সে কি মাকে?
কিন্তু কোথায় ঘুমের চিহ্ন
তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

রাত্রি জুড়ে কী হয়রানি
শুতে ও দেবে না
কেমন করে জানব আমি
কোথায় ওর মা?
হদ্দ হয়ে হাঁকি আমি
"যা, বেরিয়ে যা।"

দরজাটা খুলি কিন্তু
অমনি হয় খেয়াল
ধারে কাছে ওত পেতেছে
সেয়ানা এক শেয়াল।
সেই শেয়ালের ডরে আমি
আপনি হই বেহাল।

আবার তাকে রাখতে হলো
বন্ধ করে আগল
ঘর জুড়ে সে দাপিয়ে বেড়ায়
বেগানা এক ছাগল।
ছাগলটাকে বাঁচাতে কি
আমিই হব পাগল।

ভোর হতেই দিলেম ছেড়ে
ফের সেই বাগানে
এক ছুটে সে পালিয়ে গেল
কে জানে কোন্‌খানে।
বিছানাতে গা মেলে দি
বেয়ারা চা আনে।

সাধের বাইক

চড়েছি ট্রেন চড়েছি প্লেন
চড়েছি ইস্টীমার
চড়েছি ট্রাম চড়েছি বাস
ট্যাক্‌সি মোটরকার।

গোরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি
রিক্সা ঠেলা পাল্‌কি
চড়েছি সাম্পান নাও
হাউসবোট আর কী?

সকল যানের সেরা যান
বাইসাইকেল।
লাগে না ইলেকট্রিক
পেট্রল ডিজেল।

সাধের বাইক চড়ে আমি
সারা শহর ঘুরি
হায় রে, এক আঁধার রাতে
বাইক গেল চুরি।

এই জীবনে আবার বাধে
একই ফ্যাসাদ
তখন আমায় ছাড়তে হয়
বাইক চড়ার সাধ।

১৯৯৩

দোল দোল দুলুনি

অন্নদাশঙ্কর রায়

অজানা

ধাঁধার জবাব আছেই এটুকু জানি
জানিনে কিন্তু কোথায় লুকোনো আছে।
ধাঁধার জবাব পাবই এটুকু জানি
জানিনে কিন্তু কবে পাব কার কাছে।

দেশভাগ

উকুনের উৎপাত সয় নাকো আর
মাথাটাকে কেটে, ভাই, করো দুই ধার।
আধখানা উকুনকে দাও উপহার
তা হলেই বাকিটাতে টিকির বাহার।

২৪. ৩. '৪৭

পাপুর ছবি

ইনি কে বা! ইনি কে বা!
পাপুই জানে এ কোন্ দেবা!
সোনার মাথা কাদার পা
কখন টলে পড়েন বা!
গদি জুড়ে থাকেন বসে
গদির থেকে নড়েন না!

খেলার খবর

খবর আমায় করল বোবা,
হেরেছেন নাভরাটিলোভা।
টেনিস খেলায় নারীর তেজ,
দেখিয়ে দিলেন মার্টিনেজ।

খবর আমায় মারল ঠোনা,
ড্রাগ খেয়েছেন মারাদোনা।
করল তাঁকে মাঠের বার,
বিশ্বকাপের চৌকিদার।

ধাপ্পা দিয়ে—বাপ রে বাপ—
জিতবে কিনা বিশ্বকাপ!
মারাদোনা, মারাদোনা
এই কি তোমার বিবেচনা।

জানো না কি তোমায় বিনা
যাবেই হেরে আর্জেন্টিনা!
যে-দেশটির গর্ব ছিলে,
সেই দেশকে ডুবিয়ে দিলে!

মারাদোনা! লক্ষ্মী সোনা!
জীবনে আর ড্রাগ খেয়ো না।
বছর কয়েক বাঁচলে আরো,
বিশ্বকাপ পেতেও পারো।

১৪০১

কিস্‌সা ইন্দুরকা

শোনো পাঠক পাঠিকা
শোনো পাঠক পাঠিকা,
সেদিন যা ঘটে গেল
সে এক নাটিকা।
মাঝরাতে শোনা গেল
থালা ভাঙচুর,
রান্নাঘরে দেখা গেল
বিশাল ইঁদুর।
বেটা ঢুকল কেমনে
বেটা ঢুকল কেমনে,
ড্রেনপাইপ জালি খোলা
পড়েছে সামনে।

বেটা মহা শয়তান
বেটা মহা শয়তান,
ধরতে পারে না ওকে
অজয় জওয়ান।
তাই তো পিটিয়ে ওকে
করে আধমরা
তবু সে পালায় ছুটে
মিছে তাড়া করা।
বেটা এমন চতুর
বেটা এমন চতুর,
ড্রেনপাইপ বেয়ে হয়
উধাও ইঁদুর।

১৪০২

সামনে আকাল

আলিসাহেব বসে ছিলেন
বিষাদভরা মনে
"কী হয়েছে, আলিসাহেব?"
শুধাই গোপনে।
বলেন তিনি, "সামনে দেখি
মাছের আকাল
মাছের খোঁজে বাঙালি লোক
হবে যে নাকাল।
হাওয়াই জাহাজ চড়ে
মাছ যে হবে হাওয়া
রুই কাতলা ইলিশ মাগুর
আর যাবে না খাওয়া।"

এই কথাটা শুনেছিলুম
বিশ দশকের শেষে
এরোপ্লেনের যাত্রী হওয়া
শুরু যখন দেশে।
আমিও আজ বসে আছি
বিষাদভরা মনে
গলদা বাগদা কিনে খাওয়া
হবে না জীবনে।
ধানের চাষের চেয়ে নাকি
চিংড়ি চাষেই টাকা
জাহাজ ভরা চালান দেয়
কলকাতা আর ঢাকা।

১৪০৩

জলপানি

নুরপুরে যাও যদি
দেখবে সেই গঙ্গা নদী
কেমন করে হয়ে গেল
পদ্মা আর ভাগীরথী।

ভাগীরথী পুণ্যবতী
নবদ্বীপ ধামে গতি
তারই কূলে কলিকাতা
বিরাট বন্দর অতি।

পদ্মা যায় বাংলাদেশে
যমুনা তার সঙ্গে মেশে
মেঘনাও সে সঙ্গমে
যোগ দেয় পরে এসে।

এখন হয়েছে ভারী
জল নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মনে পড়ছে না কারো
দু'জনের একই নাড়ি।

কেউ বলে পানি চাই
কেউ বলে জল নাই।
জলপানি খেয়ে দেখ
জিনিস তো একটাই।

১৪০৪

হাতির জন্য শোক

কাঁদছি আমি হাতির জন্য
হাতি ছিল নেহাত বন্য।
জঙ্গলে কই খোরাক তার
মানুষ করে বন উজাড়।
বেরিয়েছিল পেটের দায়ে
পড়ল এসে অচিন গাঁয়ে।
হাতি পোষা সাধ্য কার
কে যোগাবে খাদ্য তার।
পোষ মানালে মানত পোষ
ধরত না কেউ হাতির দোষ।

কিন্তু হাতি খিদের চোটে
চাষীর ক্ষেত খামার লোটে।
ভাঙল গাছ ভাঙল ডাল
গাঁয়ের লোক নাজেহাল।
রুখতে গিয়ে হয় জখম
বলে হাতি হোক খতম।
রক্ষী এসে চালায় গুলি
গুঁড়িয়ে দেয় মাথার খুলি।
হাতি তখন গেল মারা
হায় বেচারা! হায় বেচারা!

১৪০১

সাগরযাত্রা

সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হতে তার সাধ
তাই তো খোকা জানতে চায়
জলপথ সংবাদ।
নানা দেশের মানচিত্রের
বিলিতি অ্যাটলাস
দিন রাত্তির সঙ্গী তার
বৎসরে বারোমাস।
বুদ্ধি আঁটে বড়ো হলে
কেথায় কোথায় যাবে
কাল সকালে বদলে যায়
আজ রাতে যা ভাবে।
রাজপুত্রের বাহন ছিল
ঘোটক নন্দন
তাই চড়ে সে ঘুরেছিল
রোম ও লণ্ডন।
তেমন ঘোড়া যায় না পাওয়া
নিঃশেষ তাহা যে
এখন তাকে চড়তে হবে
বিদেশী জাহাজে।
জাহাজে চড়তে হলে
লাগে যে পাথেয়
কোথায় পাবে? তাই তো যাবে
খালাসীর সাথে ও।
খালাসীরা কী কী খায়
ছিল না তার জানা
শুনতে পায় গোমাংস
নিত্য তাদের খানা।
সকল ভীতির চেয়ে বড়ো
গোমাংসের ভীতি
খালাসী হিসাবে যাওয়ার
সেইখানেই ইতি।
সফল হয়ে গেল খোকা
প্যাসেজ বিলেত যাবার
যাত্রীরূপে খেতে পেল
রুচি মাফিক খাবার।

১৪০২

বাঘের গলায় মালা

বাঘের গলায় দিতে মালা
ঢুকল ওরা দুই উজবুক
আলীপুরের জন্তুশালা।

ডিঙিয়ে পাঁচিল সাঁতরে নালা
চলল ওরা দুই বেয়াকুব
বাঘ যেখানে রয় নিরালা।

খাঁচা খোলা, সামনে মাঠ
রয়াল বেঙ্গলের যেন
সেইখানেই রাজ্যপাট।

বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি?
মালা দিয়ে ভুলিয়ে ওকে
পিঠে হবে সওয়ার কি?

পারত দিতে বাঘ কামড়
তা না দিয়ে দিল কিনা
থাবা দিয়ে এক চাপড়।

কী ভয়ানক বাঘের থাবা
লোকটা তাতেই ঘায়েল হয়ে
চেঁচিয়ে ওঠে, ‘ওরে বাবা!’

ধরাশায়ী হলেন দাদা
বাঘের চোখে খোঁচা মারেন
রাগের বশে আরেক হাঁদা।

করতে পারত বাঘ খতম
তা না করে আঁচড় কাটে
সারা গায়ে তাই জখম।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা
যন্ত্রণায় কাতর সে-জন
জ্বালা করে সারাটা গা।

মানুষখেকো নয় এ বাঘ
দুই মানুষের একজনেরও
অঙ্গে নেই দাঁতের দাগ।

দর্শকদের তবুও রোষ
গর্জে ওরা, 'বাঘকে মারো
আর কারো নয়, বাঘের দোষ।'

কেউ সেখানে নেই পাহারা
অমনি হলো বাঘের দিকে
ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা।

শুনতে পেয়ে এই ব্যাপার
ছুটি থেকে ছুটে আসে
সিংহ বাঘের যে কীপার।

বাঘকে পোরে খাঁচায় সে
হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে
জখমীটাকে বাঁচায় সে।

বাঘ কি মালার মর্ম জানে?
পোষ মানাবার শিকল ভেবে
আতঙ্কে সে আঘাত হানে।

শুনতে পেলাম সমাচার
বাঘের দেবী শেরওয়ালী
মরল যে-জন ভক্ত তাঁর।

স্বপ্নে দেবী দিলেন বর
বাঘের গলায় মালা দিলে
বাঘ বনবে বাহন ওর।

তাই গেল সে চিড়িয়াখানা
বাঘটা ভালো, নইলে হতো
রয়াল বেঙ্গলের খানা।

১৪০৩

অজানা এক যোদ্ধা

ওর সঙ্গে আড়ি
যাইনে ওর বাড়ি।
ফুটবলটা খেলতে গিয়ে
পড়ল কাড়াকাড়ি।

ওর সঙ্গে ভাব
ওর সঙ্গলাভ।
ইস্কুলের ছেলেদের
সেইটেই স্বভাব।

চাকরি করেন যাঁরা
বদলি হন তাঁরা।
বদলি হয়ে গেলেন কোথা
কে জানে কিনারা।

অনেক কাল পরে
বেরিয়েছি সফরে।
কে একজন পথিক এসে
আমায় সেলাম করে।

চিনতে কি আর পারি?
ইয়া গোঁফ দাড়ি।
ঝোলা নিয়ে সামনে দাঁড়ায়
গান্ধী টুপিধারী।

তাকিয়ে ওর চোখে
চিনতে পারি ও কে।
অমনি বুকে জড়িয়ে ধরি
অবাক হয় লোকে।

অনেক কাল পরে
কলকাতা শহরে
সাক্ষী দিতে এসে নরেশ
ঢোকে আমার ঘরে।

কী সমাচার, নরেশ?
কোথায় এখন পরেশ?
দেশ তো হলো স্বাধীন
ভাগ্য ওর সরেস।

মুখটি করে আঁধার
খবর শোনায় দাদার।
জানা গেল সেকালের এক
জবাব গোলকধাঁধার।

জাপানীদের সনে
পরেশও যায় রণে।
বর্মা দেশে দেহ রাখে
ফেরে না জীবনে।

আমি তো হই হাঁ
মুখেতে নেই রা।
বাল্যকালে এমন কারো
স্বপ্ন ছিল না।

বন্ধু আমার বীর
মিথ্যে আঁখিনীর।
ও যে আমার গর্ব, আমি
নোয়াই আমার শির।

১৪০৪

সেকাল আর একাল

পাঁচ বছরের আগে আমি
যাইনি পাঠশালে
খেলায় ধূলায় সারাবেলা
কাটিয়েছি সেকালে।
রাত্রে আমায় শুতে হতো
ঠাকুরমায়ের পাশে
কতরকম গল্প শুনে
চক্ষে ঘুম না আসে।
মহাভারত রামায়ণের
বিচিত্র ঘটনা
রাজপুত্র রাজকন্যার
কাহিনী কত না।

একালের বাচ্চারা
খেলাধূলা ভুলে
আড়াই বছরে ধায়
ইংরেজি ইস্কুলে।
কোথায় হারিয়ে গেছে
ঠাকুমাদের স্থান
ঘুম কেড়ে নেয় রাতে
টিভির নাচগান।
আমার মতন এরা
হবে নাকো মুখ্যু
আমার মতন তাই
পাবে নাকো দুখ্যু।

১৯৯৫

সোনার ভারত

লাভ করেছ স্বাধীনতা
কেন তবে এ হীনতা?
অলিম্পিকে সবার পিছে
অহঙ্কার তোমার মিছে।

কোথায় রুপো, কোথায় সোনা
একটিও না, একটাও না।
দৌড় ঝাঁপ সাঁতার শিখে
আবার চল অলিম্পিকে।

দেখাও তোমার গুণপনা
দশটা রুপো, পাঁচটা সোনা।
থাকবে না আর এই দীনতা
পূর্ণ হবে স্বাধীনতা।

২. ৯. '৯৭.

কুচকাওয়াজ আবার

ওরা বলে লেফ্‌ট রাইট,
আমরা বলি পান সুপারি।

পান সুপারি পান সুপারি
চলছি এবার বোয়ালমারি।

বোয়ালমারি বোয়ালমারি
সেই যেখানে বোনাইবাড়ি।

বোনাইবাড়ি বোনাইবাড়ি
যার বাগানে মজা ভারি।

মজা ভারি মজা ভারি
আম জাম আর লিচু পাড়ি।

লিচু পাড়ি লিচু পাড়ি
বোনাই আনে মালাইকারি।

মালাইকারি মালাইকারি
বিরিয়ানিও সঙ্গে তারি।

সঙ্গে তারি সঙ্গে তারি
রসগোল্লা একটি হাঁড়ি।

রসগোল্লা একটি হাঁড়ি
সাবাড় করে পালাই বাড়ি।

পালাই বাড়ি পালাই বাড়ি
পান সুপারি পান সুপারি।

১৯৯৬

মঙ্গলের বার্তা

মঙ্গলের বার্তা শুনে
জাগছে কৌতূহল
সেই গ্রহেও নদী ছিল
নদীর বুকে জল!

নদীর কূলে গাছ গাছালি
গাছের ডালে ফল
নদীর পাড়ের জমিতেও
জন্মাত ফসল!

ফসল যদি পাকে তবে
ফসল খাবে কে?
মানুষ না হোক অন্য প্রাণী
হবেই হবে সে!

কোত্থেকে এক বন্যা এল
কে জানে সে কবে
ভাসিয়ে দিল ডুবিয়ে দিল
মুছিয়ে দিল সবে!

সূর্য তাপে শুকিয়ে গেল
যেখানে জল যত
মঙ্গলের দশা হলো
মরুভূমির মতো!

১৯৯৭

বর্ণপরিচয় ও কথামালা স্মরণে

গোপালের মতো সুবোধ বালক
যাহা পায় তাহা খায়
নাহি যদি পায় নাহি খায়, আর
না খেয়েই মারা যায়।

চেষ্টা সে করে শৃগালের মতো
কিন্তু তা কাঁহাতক?
নাগাল না পেয়ে অবশেষে বলে,
আঙুর ফলটা টক।

বিদ্যাসাগর, বিদ্যা কি আজ
গোপালকে দেয় অন্ন?
অশিক্ষিতের ঘরেই এখন
হরেক রকম পণ্য।

৯. ৯. '৯৭

কম্বল আর টুপি

নিয়ে আয় রে আমার সেই
আলমোড়ার কম্বল
কম্বল।
হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় আজ
হাত পা যে অসাড়
অসাড়।
শীতকালে আমার নেই
আর কোনো সম্বল
সম্বল।

তার উপর জ্বালাতন
এক ঝাঁক মশার
মশার।
নিয়ে আয় রে আলমোড়ার
সেই বাঁদর টুপি
টুপি।
ঢাকবে সারাটা মুখ
চোখ দুটি ছাড়া
ছাড়া।
মানুষ না বাঁদর না
এক বহুরূপী
রূপী।
দেখলে কি চিনতে
পারবে এ পাড়া?
পাড়া?

Book No.
Date

১৪০১

পাদটীকা : প্রত্যেক স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দটি সবাই মিলে প্রতিধ্বনিত করতে হবে—এটা যেন একটা কোরাস।

খেলার মাঠে হিরো

খেলার মাঠে হিরো
সেবার করেন সেঞ্চুরি
এবার করেন জিরো।
দর্শকরা বলে,
হিরো এখন হেরো, ওকে
রেখো না আর দলে।
সরিয়ে দিয়ে তাঁরে
আরেকজন প্লেয়ার নিয়ে
গোটা দলটা হারে।

দর্শকরা বলে,
হিরো কোথায়, আসুন ফিরে
সর্বহারার দলে।
নেইকো তাঁর জুড়ি
ব্যাট ধরতেই জুটে গেল
আবার সেঞ্চুরি।
এ ভবসংসারে
হারে যারা জেতে তারা
জেতে যারা, হারে।

জিত কিংবা হার
কোনোটাই তোমার নয়
খেলাটা তোমার।

১৯৯৮

কাল্পনিক বাসযাত্রা

তৈরি থেকো তৈরি থেকো
এবার বর্ষাশেষে
বাস চলবে এপার থেকে
ওপারে বাংলাদেশে।

বাসেই পারবে যেতে
সটান পদ্মাপারে
নয়কো আগের মতন
ট্রেনে আর ইস্টিমারে।

বাস থামবে লোক নামবে
ওবেলা ঢাকায় এসে
সেখানে দুদিন থেকে
বেরিয়ো রাত্রিশেষে।

এবারে মেঘনা পাড়ি
নামবে কুমিল্লাতে
সেকালে স্টিমার ছিল
একালে নেই বরাতে।

পাহাড় হেরা সাগর ঘেরা
কর্ণফুলীর তীরে
চট্টগ্রাম না দেখেই
কেউ কি আসে ফিরে?

ওরাও আসবে ছুটে
দেখতে কলিকাতা
এখানে ওদের তরে
হোক না আসন পাতা।

২৬. ৮. '৯৭

চানাচুর গরম

আইয়ে বাবু, খাইয়ে বাবু
চানাচুর গরম
শুনেই খোকা ছুটল পথে
আনন্দে পরম।

চানাচুরওয়ালার
ঘুঙুর বাঁধা পায়
মাথায় টুপি, কাঁধে ঝুড়ি
নাচতে নাচতে যায়।

আগুন ভরা মালসা থাকে
ঝুড়ির মধ্যিখানে
চানাচুরকে গরম রাখে
কেউ তা না জানে।

চার পয়সায় ঠোঙা কিনে
কে না খেতে চায়
চার পয়সা কোথায় পাবেন
খোকনবাবু, হায়।

আইয়ে বাবু, খাইয়ে বাবু
চানাচুর গরম
বাড়ি ফিরে আসেন বাবু
বিষাদে পরম।

অবাক জলযান

কলকাতার জন্মদিন
    কে জানে সে কবে
কালীঘাটের মতন সেটা
    মধ্যযুগেই হবে।

ক্যালকাট্টার জন্মদিন
    সেদিন থেকে গণ্য
জোব চার্নক যেদিন এলেন
    বাণিজ্যের জন্য।

তার পরেই কেটে গেছে
    তিনশো সাত বর্ষ
সেই দিনটি স্মরণ করে
    বঙ্গজনের হর্ষ।

সেই দিনেই সেই খানেই
    মিলবে তাঁর ভেট
এই ধারণায় আমরা গেলাম
    চড়ে সিলভারজেট।

সিলভারজেট কাটামারান
    জাহাজ থেকে অন্য
জাহাজেরই মতন গতি
    ইঞ্জিনের জন্য।

যাত্রা শুরুর আগে কাটি
    জন্মদিনের কেক
মস্ত বড় সন্দেশ, তার
    খাইয়ে অনেক।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম
    সুতানুটি গ্রামে
সেই ঘাটেই চার্নকের
    বজরা এসে থামে।

নদীর পাড়ে আমরা যেন
    সুতানুটির লোক
স্বাগত জানাই তাকে
    ওয়েলকাম, চার্নক।

সে কালের জবরজং
    পোশাক পরা গায়
কালো বরণ তরুণটিকে
    সাহেব চেনা দায়।

সেকালের সুতানুটিই
    একালে ক্যালকাট্টা
সভাজনের মুখে শুনি
    এ কি রকম ঠাট্টা।

ঠাট্টা নয় ফিরতি পথে
    চড়ে সিলভারজেট
কতরকম খাবার দিয়ে
    ভরাই যখন পেট।

জন্মদিন একশ বার
    আসুক সুখ নিয়ে
বিদায় ক্ষণে এই কথাটি
    এসেছি শুনিয়ে।

৩১. ৮. '৯৭

চিড়িয়াখানার খবর

খাঁচা খোলা, বানর মশাই
কাঁপিয়ে বেড়ান মুলুক সারা
ধরতে গিয়ে কীপার তাঁকে
কামড় খেয়ে গেল মারা।

বাঘ সিংহ খাঁচায় বন্দী
বানর কিন্তু স্বাধীন
ডালে ডালে নেচে বেড়ান
তা ধিন্ তা ধিন্।

সৌরভ আমাদের গৌরব

সৌরভ হে, সৌরভ
তুমি আমাদের গৌরব।
সৌরভ হে, সৌরভ
তুমি এ যুগের পাণ্ডব
ওরা এ যুগের কৌরব।

সৌরভ হে, সৌরভ
তোমার জন্যে স্বর্গসুখ
ওদের জন্যে রৌরব।

লিয়েণ্ডার

লিয়েণ্ডার হে, লিয়েণ্ডার
তোমার জয় দেশের জয়
তোমার হার দেশের হার।

সোনা রুপো নাই বা পেলে
ব্রোঞ্জ সেও চমৎকার।

মুখরক্ষা করলে তুমি
তোমায় করি নমস্কার।

সোনা কিন্তু আনতে হবে
অলিম্পিকে পরের বার।

পারবে তুমি, পারবে ভারত
মিলবে সেরা পুরস্কার।

প্যাঙ্গোলিন

প্যাঙ্গোলিন! প্যাঙ্গোলিন!
হয়নি দেখা অনেক দিন
তাই তো দেখে লাগছে ডর
হচ্ছে মনে ডাইনোসর।

ডাইনোসর কি এল ফিরে
দিঘার এই সাগরতীরে?
এখন থেকে এর ঠিকানা
আলিপুরের চিড়িয়াখানা।

টিপসি

কুকুরের নাম টিপসি
স্বভাবে সে জিপসি।
ঘুরে বেড়ায় হেথা হোথা
খুঁজে বেড়াই টিপসি কোথা!
ধরা পড়ে খাটের তলায়
লুকিয়ে রাখা হাড় চেটে খায়!

বিছানাতে আমার পাশে
যখন খুশি তখন আসে।
মুখটি রাখে মুখের কাছে
একটুখানি আদর যাচে।
মাথায় তার বুলাই হাত
ডরাই পাছে বসায় দাঁত।

খেলার ইতিহাস

ক্রিকেট ফুটবল হকি
খেলেছি সকলই
কোনোটাতে কোনোদিন
হইনি সফলই।
টেনিস পিংপং আর
ব্যাডমিণ্টন
খেলেছি, খেলায় কিন্তু
ছিল নাকো মন।

তার চেয়ে প্রিয় খেলা
ছিল যে বরঞ্চ
রাজা মন্ত্রী অশ্ব গজ
নিয়ে সতরঞ্চ।
বুঁদ হয়ে যা খেলেছি
তার নাম তাস
তাহলে কী করে হই
পরীক্ষায় পাশ?

পরীক্ষায় পাশ হওয়া
এই হল সার
সব খেলা ছেড়ে শুধু
কেটেছি সাঁতার।

নদে এল বান

এল রে বান এল রে
ক্ষেত মাঠ ডুবল জলে
পথ কোন্ অতলে।

যাব যে ইস্টিশনে
কেমনে দেব পাড়ি
ধরতে রেলের গাড়ি?

মোটর বাস চলে না
রিকশা সেও হাওয়া
পালকি যায় না পাওয়া।

মাঝি ভাই, ভরসা তুই
বার কর নৌকা তোর
এই তো মওকা তোর।

ও কী রে! দাঁড় বাইতে
হাঁকছিস আশি টাকা
এ দিকে যে পকেট ফাঁকা!

নেমেছিস ষাট টাকাতে
আচ্ছা, ষাটই সই
এ ছাড়া উপায় কই?

জোরে টান, আরো জোরে
জলদি দেব পাড়ি
ধরব রেলের গাড়ি।

যদি নিপততি বল্লী

রাজা গেলেন বাঘ শিকারে
পেলেন পথে বাধা
টিকটিকি এক ডাইনে পড়ে
বাধিয়ে দিল ধাঁধা।

দক্ষিণাংশে পড়ে যখন
স্বজন হবে বিয়োগ
বামভাগে পড়লে পরে
লাভের যত সুযোগ।

রাজামশায় ভেবে আকুল
জবাব কী এই ধাঁধার
টিকটিকিটা আপনা হতে
না যদি যায় বাঁ ধার।

বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়
নিলেন মোড় ডাইনে
টিকটিকিটা রইল বাঁয়ে
বলেন, ভয় পাইনে।

বৈশাখী বন্যা

বৈশাখেতে বান এসেছে
গাঁ ভাসছে জলে
গাঁয়ের যত ছেলে বুড়ো
মাছ ধরতে চলে।

কী মজা রে মাছ ধরতে
ডুব জলে জাল পেতে
বাড়ির কাছে মাঠের মাঝে
সুফলা ধানক্ষেতে।

কারো ভাগ্যে কাতলা পড়ে
কারো ভাগ্যে রুই
ভাগ্যে কারো চিতল আর
রাঘব বোয়াল দুই।

আসুক না বান ভাসুক না গ্রাম
মাছ তো পাব মাগনা
ধান না হলে খাব কী
ওসব কথা থাক না।

পদমর্যাদা

হাতির পিঠে চড়ে যে
সে এক মস্ত সাহেব
ঘোড়ার পিঠে চড়ে যে
জমিদারের নায়েব।

উটের পিঠে চড়ে যে
হোমরা চোমরা সে খুব
গাধার পিঠে চড়ে যে
গাধার মতন বেকুব।

বাঘের পিঠে চড়বে যে
নামতে গেলে মরবে
ষাঁড়ের পিঠে চড়বে যে
থামতে গেলে পড়বে।

তার চাইতে ভালো যে
গোরুর গাড়ি চড়ন
গোরুর গাড়ি না চলে তো
ভরসা দুটি চরণ।

পদব্রজেই তীর্থ করেন
যতেক সাধু সন্ত
পদযাত্রা করেন দেখি
কতক বুদ্ধিমন্ত।

পায়ে চড়েই মানুষ বাঁচে
পা-ই সেরা বাহন
চলতে ফিরতে পারেন যাঁরা
বৃদ্ধ তাঁরা না হন।

গুরুশিষ্যসংবাদ

পড়াশোনা ছেড়ে
চললে কোথায়, বৎস?
বন্যার জলে
ধরতে চলেছি মৎস্য।
ঝুড়ি হাতে নিয়ে
মৎস্য ধরা কি সহজ কাজ?
ধরতে না পারি
চেষ্টা করতে নাই তো লাজ।

বৃথা চেষ্টায়
সময় যে হয় নষ্ট।
কেষ্ট কি মেলে
না করলে কিছু কষ্ট?
পাশ না করলে
না খেয়ে মরবে দুখে।
মাছ না ধরলে
কী খেয়ে বাঁচব সুখে?

লিচু ফল টক

একটা শুধু লিচু, খোকা
এক টুকরো সোনা
একটা গাছে ক'টা আছে
সবই আমার গোনা
একটা শুধু নিতে পারো,
তার বেশী নিয়ো না

এ লিচুটা মিঠে নয়,
নয়কো শাঁসালো
আর একটা মুখে দিই,
মালীটি কী ভালো!
এটাও তো টক—বলতে
তক্ষুনি তাড়ালো।

দুটি খেয়েই মেটে কি আর
লিচু খাওয়ার শখ!
যাকেই দেখি তাকেই বলি
লিচু ফল টক।
লিচু কিন্তু মিষ্টি ছিল,
বাকীটা নাটক।

রাঙা ঘোড়ার সওয়ার

অন্নদাশঙ্কর রায়

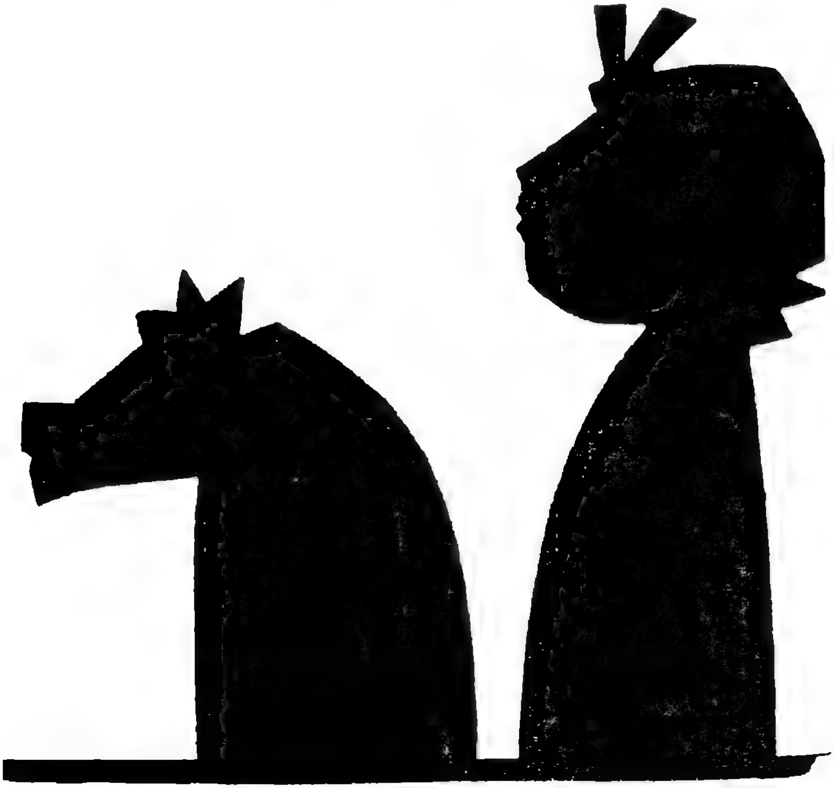

তিনটি ছেলে

ওই ছেলেটা দস্যি ছিল
আমার নাকে নস্যি দিল
হাঁচি, কেবল হাঁচি
হাঁচি নিয়ে বাঁচি।

এই ছেলেটা শিষ্ট ছিল
কথাগুলি মিষ্ট ছিল
হাসি, কেবল হাসি
হাসতে ভালোবাসি।

সেই ছেলেটার বুদ্ধি ছিল
পড়াশোনায় প্রাইজ নিল
তার সাথে কি পারি?
হারি, কেবল হারি।

১৯৯৮

বই নং ৫১১
তারিখ
ফোন

বৃষ্টিপাত

ইন্দ্র করুন দৃষ্টিপাত
আষাঢ়ে নেই শ্রাবণে নেই
ভাদ্রেও নেই বৃষ্টিপাত।
ধানের ক্ষেত শুখনো কাঠ
ধু-ধু করে রুক্ষ মাঠ

ধানের চারা গেল মারা
চাষীর এখন মাথায় হাত।
ইন্দ্র করুন দৃষ্টিপাত
ভাদ্র মাসে হোক না এবার
অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত।

১৯৯৮

রাঙা ঘোড়ার সওয়ার

রাঙা ইজের রাঙা জামা
রাঙা পাগড়ি পরে
কোথায় তুমি যাচ্ছ খোকা
রাঙা ঘোড়ায় চড়ে?

যাচ্ছি আমি মামার বাড়ি
ঢেঙ্কানাল গড়ে।

সামনে আছে বামনি নদী
গভীর তার জল
ঘোড়া তোমায় নিয়ে যাবে
যেথায় রসাতল।

এক লম্ফে পার হবে সে
এমনি তার বল।

তার পরেও দেখবে খাড়া
মেঘা পর্বত
উঠতে কেন পারবে ঘোড়া
অমন উঁচু পথ?

মেঘাই জানে আমার ঘোড়ার
আজব কেরামত।

ওপারে যে ওত পেতেছে
ডোরা কাটা বাঘ
দেখবে তোমার ঘোড়ার উপর
কেমন অনুরাগ।

গায়ে আমার রাঙা পোশাক
মাথায় রাঙা পাগ
বাঘই আমায় ভয় করবে
বলব, তুই ভাগ।

১৯৯৮

পথ্য নির্দেশ

ভাতের সঙ্গে নিত্য আমি
পাতি নেবু খাই
সরদি থেকে রেহাই পেতে
অমন পথ্য নাই।

সুক্ত যদি না থাকে রোজ
উচ্ছে ভাজা খাই
বহুমূত্র রোধ করতে
অমন পথ্য নাই।

স্যালাড রূপে নিত্য আমি
পেঁয়াজ, শসা খাই
রক্তের চাপ না বাড়াতে
অমন পথ্য চাই।

মিষ্টি দই খাইনে, রোজ
টক দই খাই
দীর্ঘ জীবন পেতে হলে
অমন পথ্য চাই।

১৯৯৮

এবারকার বিশ্বকাপ

ধিনতা ধিনা পাকা নোনা
নেইকো আবার মারাদনা।
আর্জেন্টিনার ঘটল হার
পড়ল সেথা হাহাকার।
হল্যাণ্ড তো অকিঞ্চিৎ
তারই কিনা ঘটল জিত।
ক্রোয়েশিয়া অতি ক্ষুদে
জার্মানরা অতি দুঁদে।
জার্মানির হলো হার
পড়ল সেথা হাহাকার।
ছোট্ট হলেও তুচ্ছ নয়
সেও পারে করতে জয়।
বড় হলেই উচ্চ নয়
তারও ঘটে পরাজয়।
খেলার মাঠের এটাই রীত
সকল কিছুই আচম্বিত।

১৯৯৮

বাঘের গন্ধ পাঁউ

বলল আমায় গাড়োয়ান,
খোকাবাবু সাবধান
খকখকিয়ে কাশবে না
ফিকফিকিয়ে হাসবে না
মুখটি বুজে থাকবে পড়ে
পথের এই মাঝখান।

ভয় পেয়ো না, খোকাবাবু।
চলছে গাড়ি পাঁচখানা
পাঁচ লণ্ঠন জ্বলছে তেজে
তাই দেবে না কেউ হানা
তোমার মামার ধরন আমার
বহুৎ দিনের বেশ জানা।

দুইধারেই জঙ্গল
রাতটা ঘোর অন্ধকার
হঠাৎ আমার নাকে এল
বোটকা এক গন্ধ কার
শিউরে উঠি দাঁতকপাটি
বাঘ নয় তো কে আবার।

বাঘমামা গো, পায়ে পড়ি
শিবঠাকুরের দোহাই
আমরা তোমার ভাগ্নে গো,
দাও আমাদের রেহাই
কালকে যেন বেঁচে থাকি
আজ নিবেদন ইহাই।

মাইলটাক রাস্তা
বাঘের এলাকায়
সেইটুকু পার হতেই
গন্ধ চলে যায়।
খোকাবাবু, হাসো, কাশো,
বলো যা মন চায়।

১৯৯৮

এক ঢিলে দুই লাখ পাখি

অ্যাটম বোমা বানিয়েছিলেন
বিদেশী বিজ্ঞানী
একটি বোমার ঘায়ে মরে
লক্ষাধিক প্রাণী
সবাই বলে ধিক ধিক
ধিক সে বিজ্ঞানী।

হাইড্রোজেন বোমা বানান
স্বদেশী বিজ্ঞানী
একটি বোমায় মরতে পারে
দুই লক্ষ প্রাণী
ধন্য ধন্য করে সবাই
ধন্য হে বিজ্ঞানী।

পরের বেলায় ধিক ধিক
নিজের বেলা ধন্য
এঁদের প্রয়োজন ত দেখি
গণহত্যার জন্য
চেঙ্গিস খাঁর মতো এঁরা
ঘাতক বলে গণ্য।

এই কথাটি রেখো মনে
এ ভব সংসারে
যে বাঁচায় সেই বাঁচে
সে মরে যে মারে
যে হারে সে জিতে আর
যে জিতে সে হারে।
১৯৯৮

অণুমান

সেই যে বীর হনুমান
লাঙ্গুলে তার আগুন নিয়ে
হলেন তিনি অণুমান।

অণুমানের দলে
পাঁচটি মোট সভ্য ছিল
ওস্তাদ সকলে।

পাঁচের পরে ছয়
নূতন অণুমানকে দেখে
তাদের মনে ভয়।

কে শুনে কার বাত
দেখতে দেখতে সভ্য বাড়ে
ছয় পরে সাত।

আরো আরো আরো
দেখতে দেখতে একুশ হলে
ঘুম রবে না কারো।

কে বলতে পারে
কার বোমা যে পড়তে পারে
কখন কার ঘাড়ে।
১৯৯৮

বোমাবাজি

ওই বোমা বানালাম
দুনিয়াকে জানালাম
আমাদেরও আছে সেই ক্ষমতা।

মার্কিন ও রুশবাসী
ইংরেজ ও ফরাসি
চীনাদের সঙ্গেও সমতা!

আরে আরে এ কী! এ কী!
পাকিস্তানীরাও দেখি
বানিয়েছে অনুরূপ বোমা!

ওরাও ক্ষমতা চায়
ওরাও সমতা চায়
এর ফল কী যে হবে, ওমা!
১৯৯৮

বিশ্বকাপ ফাইনাল

বিশ্বকাপ পাচ্ছে এবার ফ্রান্স
মনে মনে করছি আমি ডান্স।

জিতবে ওরা বলেছিলুম আগেই
ফরাসিদের প্রতি অনুরাগেই।

ব্রাজিলের যে সব অনুরক্ত
তাদের এখন মুখদেখানো শক্ত।

শহরময় এতো ধুমধাম
দিনমান ব্রাজিলের নাম।

জেগে থাকা আধখানা রাত
তিনটি গোলে হলো ধূলিসাৎ।

তাহলেও ভুলতে কি পারি যে
খেলা হলো নিজভূমে প্যারিসে।

যদি হতো করাচি কি দিল্লিতে
পারত কে ব্রাজিলকে গোল দিতে?

১৯৯৮

পরম অমানবিক বোমা

হর হর ব্যোম ব্যোম
বনে পরমাণু বোম।

আল্লা হো আকবর
বোমা বনে তড় বড়।

চুং চাং চিং লিং
বোমা বানায় বেইজিং।

কবে হবে বোমা বাজি
কে বলতে পারে আজি?

শকুনের মহাভোজ
শেয়ালের খুশরোজ।

১৯৯৮

কে কী হবে

লেখা পড়া করে যে
মোটর গাড়ি চড়ে সে।

খেলাধূলা করে যে
বিশ্বকাপে লড়ে সে।

নাচ গান করে যে
যশ পায় পরে সে।

কারিগরি করে যে
ধন আনে ঘরে সে।

সেবাকর্ম করে যে
পরদুঃখ হরে সে।

১৯৯৮

বাগমারীর ঝড়

ওই যে পাজি ঝড়
হাতের কাছে পেলে ওকে
দিতেম এক চড়।

ভাঙল গাছপালা
এক নিশ্বাসে শুকিয়ে দিল
পুকুর নদী নালা।

ভাঙল বাড়ি ঘর
কোথায় খাবে কোথায় শোবে
গাঁয়ের নারী নর।

মরাই ভরা ধান
মরাই ভেঙে ঝড়ের মুখে
কোথায় ছত্রখান।

ভাঁড়ার ভরা চাল
উড়িয়ে নিল ছড়িয়ে দিল
ঘটালো আকাল।

গোয়াল ভরা গাই
বেরিয়ে তারা পলাতকা
কোথায় দুধ পাই?

পুকুর ছেড়ে মাছ
ডাঙায় উঠে মরে পচে
কে যাবে তার কাছ?

ভালোর মধ্যে এই
দুপুরবেলা, বেঁচেছে তাই
মানুষ সকলেই।

১৯৯৮

সেলাম দু হাজার অব্দ

একের পিঠে শূন্য
দশক হবে পূর্ণ
দশের পিঠে শূন্য
শতক হবে পূর্ণ
শতের পিঠে শূন্য
এক সহস্র পূর্ণ।

শতাব্দী ও সহস্রাব্দী
একই দিনে দুইয়ের আদ্যি
এবারকার নববর্ষ
আসছে নিয়ে দ্বিগুণ হর্ষ
দুই জনাকেই সেলাম
আগেই দিতে এলাম।

১৯৯৯

টিকটিকির ছানা

টিকটিকির ছানা
কদিন থেকে দিচ্ছে আমার
ওয়াশবেসিনে হানা
যতবারই সরাই ওকে
ততবারই লুকিয়ে ঢোকে
মানবে না কো মানা
যায় না দেখা টিকটিকিটার
কোনখানে আস্তানা

ওয়াশবেসিনে দেখতে না পাই
কোনখানে ওর খানা
পাইপ দিয়ে ঢুকে পালায়
টিকটিকির ছানা। ১৯৯৯

একাদশ বাঙালি

2887

মিষ্টি আনো ফিস্টি দাও
উল্লাসের নাই কো শেষ
পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল
বিশ্বকাপে বাংলাদেশ।

ইংলণ্ডের খেলার মাঠে
একাদশ বাঙালি
দুনিয়াকে দেখিয়ে দিল
বাঙালি নয় কাঙালি।

ক্রিকেটের খেলায় আজ
ওদের করি গর্ব
বাঙালি বেশ শক্তিশালী
বাঙালি নয় খর্ব। ১৯৯৯

নীরদ বিদায়

কারো চেয়ে নয় কম বাঙালি ও
কারো চেয়ে কম ইংরাজ
তেমন মানুষ একজনই ছিল
সেই একজন নেই আজ।

প্রবাদপুরুষ নীরদচন্দ্র
শতেক বরষ জীবন যাঁর
বাঙালি হিন্দু ইংরাজদের
যুগও ফুরোল সঙ্গে তাঁর।
১৯৯৯

দাদুর বচন

এই কথাটা জেনো ভাই
হাঁটার মতন ব্যায়াম নাই

বয়স গেছে পায়ে হেঁটে
বয়স গেছে সাঁতার কেটে

বয়স গেছে টেনিস খেলে
বয়স গেছে বাইক ঠেলে

এখন পঁচানব্বই
কী আছে আর হাঁটা বই

এই কথাটা জেনো খাঁটি
এই বয়সেও নিত্য হাঁটি। ১৯৯৯

বাঘের নাচন

ঠাকুরমায়ের মানত ছিল
মহরমের রঙ্গে
খেলব আমি লাঠি খেলা
খিলাড়িদের সঙ্গে।

মহরমের লাঠিখেলা
সে তো এক লড়াই
ছেলেমানুষ বড়র সঙ্গে
লড়াইকে ডরাই।

মহরমের অঙ্গ ছিল
নাচনেওয়ালা বাঘ
হলুদমাখা গায়ে তার
কালো ডোরার দাগ।

দু চোখে তার নীল চশমা
কীসের ইঙ্গিত
আরে এ যে এই পাড়ারই
শিরিয়া নাপিত।

তালে তালে পা ফেলে সে
ঘুরে ঘুরে নাচে
নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়
দর্শকদের কাছে।

তখন থেকে স্বপ্ন আমার
মহরমের রঙ্গে
বাঘের নাচ নাচব আমি
হলুদমাখা অঙ্গে।

হায় রে কপাল, সেবার থেকেই
মহরমের ইতি
মনে মনে নাচি তখন
এমনি নাচের প্রীতি।

১৯৯৯

ওরে বাপ

খেলার সুখে খেলবি তোরা
নাই বা পেলি বিশ্বকাপ
বল পিটবি জোর ছুটবি
করবি দুই সেঞ্চুরি
পাঁচ ওভারে একটা আউট
বোলার তোর নেই জুড়ি

বিশ্বকাপ হাতে পাওয়া
নেহাত সেটা বরাত
হয়ত তোরা পেয়ে যাবি
একদিন তা হঠাৎ।

১৯৯৯

হরবোলা

সে যে অনেকদিনের কথা—
লোকটা ছিল হরবোলা
যে খেলা সে দেখিয়ে গেল
কখনও কি যায় ভোলা!
বলল, বাবু, দেখবে মজা
ডাকব আমি এমন ডাক
যেথায় যত কাক রয়েছে
আসবে ছুটে সকল কাক।
এই বলে সে কা-কা রবে
ডাক ছাড়ল নকল সুরে

শুনল সে ডাক কাকেরা সব
কেউ বা কাছে কেউ বা দূরে।
অমনই তারা ছুটে এসে
বাধিয়ে দেয় কোলাহল
কোথায় যাব তখন আমি
চারদিকে যে কাকের দল।
লোকটা বলে, দেখলে, বাবু,
কাকের কেমন একতা—
মানুষের কাছে তো নয়,
কাকের কাছে শেখো তা।

২০০০

বিচিত্র যান

ছেলেবেলায় চড়েছিলুম গোরুর গাড়ি
জাহাজ চড়ে পরে দিলুম সাগরপাড়ি
আর কেউ নয়, সেই আমি।
আরও পরে বিমান চড়ে বারে বারে
পাখির মতো উড়ে গেলুম আকাশপারে
আর কেউ নয়, সেই আমি।
মহাশূন্যে নভোযানে পর্যটন
এই জীবনে ঘটবে না সে অঘটন
ঘটবে যখন দেখবে তখন
নেই আমি
নভোযান সত্যি হবে ধরে রেখো
মহাশূন্যে ঘোরার জন্য তৈরি থেকো
তোমরা যাবে যদিও তখন
নেই আমি।

২০০০

তত্ত্ব আর সত্য

তত্ত্ব ভালো সত্য ভালো
চাই উভয়ের সমাহার,
সত্য নেই তত্ত্ব আছে
কতটুকুন মূল্য তার?
সত্য কোথায় সত্য কোথায়
নিত্য করো অন্বেষণ
আবিষ্কারের আলোয় করো
তত্ত্বটার মূল্যায়ন।

২০০০

আবার কাঁদুনি

মশাই—

বাসান্তরী করলে আমায়
ঘুঘুডাঙার মশায়।
সন্ধ্যাবেলায় পড়ল ধরা
ম্যালেরিয়া জ্বর
নার্সিংহোমে যেতে হল
তখনই সত্বর।
শুয়ে শুয়ে কেটে গেল
চার রাত চার দিন
সমস্তক্ষণ ছিলুম আমি
চিকিৎসার অধীন।
দুইবেলা দুজন ছিল
শুশ্রূষাকারিণী
এ হেন সংকটে আমার
তারাই তারিণী।
হোম্ থেকে হোম্-এ এসে
নাই কো নিস্তার
পালা করে সঙ্গী হয়
দুজন সিস্টার।
মাস ছয়েক কেটে গেছে
তবুও দুর্বল
বেঁচে আছি এখনও
এটাই সুফল।
মশাই, কোমর-ভাঙা করে গেছে
ঘুঘুডাঙার মশায়।

২০০০

মঙ্গলযাত্রা

খবরটা কি শুনেছ ভাই
মঙ্গলেতে জল আছে!
মাটিতে তার জল থাকে তো
গাছে গাছে ফল আছে!
গাছে গাছে ফল থাকে তো
মাঠে মাঠে ধান আছে!
মাঠে মাঠে ধান থাকে তো
জীবজন্তুর প্রাণ আছে!
জীবজন্তুর প্রাণ থাকে তো
তোমার আমার স্থান আছে!
তোমায় আমায় নিয়ে যাবে
কোথায় এমন যান আছে!

২০০০

গদাযুদ্ধ

গদাযুদ্ধ লড়েছিলুম
সে এক মজার গল্প—
সব কথা কি মনে আছে?
পড়ছে মনে অল্প—
তর্ক যখন থামতে না চায়
মানে না কেউ সালিশ
তখন আমরা তুলে নিলুম
লম্বা দুটো বালিশ।
বালিশে বালিশে রণ
বেরিয়ে যায় তুলো,
তুলোয় তুলোয় ছেয়ে যায়
হাতের পেশিগুলো,
দুইজনের চেহারা হয়
ভূতের মতো প্রায়,
কেউ কি তবু কারও কাছে
হার মানতে চায়!
বালিশ আছে নেই কো তুলো
মিথ্যে ঠোকাঠুকি
হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে
পাড়ার খোকাখুকি।

২০০০

নাচার

যেমন দেশ তেমনি আচার
বিদেশ গিয়ে তুমি নাচার—
খেতে যা দেয় হয়তো সেটা মন্দ
তা বলে কি বিদেশ যাওয়া বন্ধ।
জাপানেতে গেলাম যেবার
আদর করে দিলেন খাবার
কবি তাঁর নিজের হাতে ভাজা
টেমপুরা সব তাজা—
খেতে ভারি চমৎকার
খেয়ে গেলুম নির্বিকার
পরে শুনি অক্টোপাসের দাঁড়া,
পেটে তখন করছে নাড়াচাড়া।
তখন কি আর ফেলতে পারি তুলে
দেশকাল ভুলে?
আর-একদিন আর-এক জন
খেতে দিলেন টাটকা কাঁচা মৎস্য—

শুনতে চাও তো বলছি তোমায় বৎস—
তখন আমার হলো এ ভাবনা
এটা আমি খাব কি খাব না।
নারাজ হলেও আমি তখন নাচার
অতিথিকে মানতে হয় আচার
মুখে হাসি মনে বিষম বিকার
একেই বলে ভদ্রতার শিকার।
বুঝতে পারি কেন তার কারণ
সাগরযাত্রা হয়েছিল বারণ—
সাগরপারে যদি বা কেউ যেত
ফিরে এসে গোবর নাকি খেত
প্রায়শ্চিত্ত বিধান—
গোবর তার নিদান।

২০০০

লড়াই

সত্যি কথা শুনতে চাও—
বলছি তোমায় খোলাখুলি।
লড়তে আমার ভালোই লাগে,
সয় না কিন্তু গোলাগুলি,
গায়ের জোরে হারব কেন?
পায়ের জোরে লাগাই দৌড়।

চারিদিকে আওয়াজ ওঠে—
পালায় পালায় চৌর চৌর।
পলায়ন নয় গো ওটা,
ওটাই রণকৌশল,
বাহুবল নাই কো যাদের
ভরসা তাদের চরণবল।

২০০০

গ্রাম্য কাজিয়া

গণশক্তি কই গো দাদা
এ যে রণশক্তি
গ্রামকে গ্রাম দখল করে
অস্ত্রধারী ব্যক্তি।

ওরাই পরে বুলেট ছেড়ে
ব্যালট নেবে হাতে
নির্বাচনে সুফল পেলে
তখ্ত পাবে সাথে।

শেষ হাসিটা হাসে যে-জন
সে-জন পায় তখ্‌ত
দেখবে তখন গাঁয়ের লোক
সবাই তার ভক্‌ত।

গণশক্তি তাকেই বলি
রাজ্য পায় যেই
গণতন্ত্র ভিন্ন দাদা
অন্য উপায় নেই।

২০০০

কৌতুক

চিরেতার মতো মিষ্টি নয়
আঙুরের মতো টক।
রসগোল্লা বেজায় তেতো
তেতো খেতে কার শখ!

চাইছ যখন দিচ্ছি তোমায়
একটুকু একবার
'আবার আবার' চাইলে খাবার
সবটাই কাবার।

২০০১

বলদেও

বলদেও সিং ছিল বাল্যকালের মিতা
অফিসার প্রীতিচাঁদ ছিলেন তার পিতা।
তিনি নিজে শিখ নন যদিও ধার্মিক
বলদেও মাতা কিন্তু শিখ-কন্যা, শিখ।
প্রথম থেকেই ওর পুরো শিখ বেশ
পাগড়ির নিচে ঢাকা কংগি আর কেশ।
কোমরে কৃপাণ তার দু হাতে কঙ্কণ
পোশাকের অন্তরালে কৌপিন গোপন।
খেলার মাঠে দেখা হয় রোজই বিকেলে
সেখানেই জড়ো হয় ইস্কুলের ছেলে।
অনুপম গুপ্ত ছিল দুষ্টুদের সেরা—
বন্ধু ওকে ঠেলে দেয় কাঁটা তারের বেড়ায়।
রক্ত দেখে ছুটে যাই আমরা সবাই
বলদেও হেসে বলে, কেয়া বাত ভাই!
রক্ত দেখে ভীত নয় এমনি নির্ভীক
তখনি বুঝতে পারি কেন এরা শিখ।
কর্ম থেকে প্রীতিচাঁদ ফেরেন ভবনে।
বলদেওর সঙ্গে দেখা হয় না জীবনে।

২০০১

লাইনার জাহাজ

হায় রে হায়, কোথায় গেল সেসব লাইনার
যে জাহাজে হয়েছিলুম সাগর পারাপার!
এক-একখানা জাহাজ তো নয়, এক-একটা শহর,
যেমন সেটা দীর্ঘাকার তেমনই তার বহর।
দিনের বেলা ডেকের ওপর কত রকম খেলা,
সন্ধে হলে সেইখানেতেই বসত নাচের মেলা।
খানার পরে আড্ডা জমে, অনেক সময় যায়,
বারে বারে চুমুক দিই কফির পেয়ালায়।
অবশেষে ঘুমোতে যাই যে যার কেবিনেতে
সরু সরু বিছানাতে দিই শরীর পেতে
ভোর হলেই বেল বাজে শয্যা থেকে নামি,
হাত মুখ ধুয়ে তখন চা খাই আমি
তারপরে ডেকে গিয়ে বেড়াই অনেকক্ষণ
চারিদিকে সমুদ্র, করি যে দর্শন।
প্রাতঃরাশের বেল পড়ে, মিলি সবার সাথে,
শুনতে পাই কী ঘটেছে কোথায় দুনিয়াতে। ২০০১

ডালাবালা

পেছনে তার মস্ত ডালা
তাই তার নাম ডালাবালা।
আসলে সে ফলওয়ালা
রোজ সকালে হাঁকতে হাঁকতে যায়
আমাদের সামনের রাস্তায়—
'কিসমিস, খেজুর, আখরোট, বাদাম—
এক এক পয়সা, দো দো পয়সা, চার চার পয়সা দাম।'
তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়,
এসব খাবার বয়স আমার নয়,
এক পয়সাও নেই কো সম্বল।
কেমন করে কিনব আমি ফল!
'ডালাবালা অমনি আমায় দাও,

হাতে নেই একটি পয়সাও,
বড় হলে দেব তোমায় দাম—
এখন তো খাই কিসমিস বাদাম।'

রোজ সকালে হাঁকতে হাঁকতে যায়
আমাদের সামনের রাস্তায়—
'কিসমিস, খেজুর, আখরোট, বাদাম—
এক এক পয়সা, দো দো পয়সা, চার চার পয়সা দাম।'
তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়
এসব খাবার বয়স সেটা নয়,
এক পয়সাও নেই কো সম্বল।
চার পয়সা কোথায় পাই বল!
'ভালাবালা, চার পয়সার অমনি আমায় দাও,
কিসমিস, খেজুর, আখরোট, বাদাম—
বড় হলে দেব তোমায় দাম।'

'খোকাবাবু, চার পয়সায় হয় না চারটে চিজ,
এখন কিছু দিচ্ছি কিসমিস
কালকে আবার পয়সা যদি পাই
দিতে পারি আর যা তোমার চাই।'

২০০১

হিরোশিমা

হিরোশিমা! হিরোশিমা!
সভ্যতার পরিসীমা
দেখা গেল আচমকা প্রভাতে
একটা অ্যাটম বম
সে কেমন সক্ষম
কত বড় মহামারী ঘটাতে।

২০০১

শান্তির পারাবত

চারদিকে তার গুলি আর গোলা
কেহ নাই তার রক্ষী
শান্তির বাণী বয়ে নিয়ে যায়
পারাবত নামে পক্ষী।
বিশ্বশান্তি দিবসেতে আজ
উড়িয়ে দিলুম যারে
দেশ হতে দেশে যাবে সে পক্ষী
সপ্তসাগর পারে।

২০০১

লিমেরিক

একটি লোক ছিল তার নাম হরিশ,
তাকে শুধালুম, তুই কী করিস?
        বলে : 'আমি মারি যত গণ্ডার,
        লুট করি বড়ো বড়ো ভাণ্ডার...'
আমি বলি, তারপর কী করিস?

ডাকসাইটে

        লোকটা ছিল ডাকসাইটে।
স্পেনে গিয়ে যোগ দিল সে
        ওখানকার বুলফাইটে।
বুলগুলো বেজায় রাগী
        এক-একটা যমদূত,
তাদের দেখে ভয় পায় না
        এমনই সে অদ্ভুত।

অবশেষে খবর পেলুম
        সময়টা লাস্ট নাইট
কে একজন মারা গেছে
        বন্ধ আছে ফাইট।

আজকে শুনি, ডাকসাইটে দিব্যি বেঁচে—
        মনে হয়, রাইট,
মারা গেছে বুল্ একটা
        পেয়ে ভীষণ ফ্রাইট।

বড়োদের ছড়া

২০০১

২০০১

যুক্তবঙ্গের স্মৃতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ক্লেরিহিউ

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলেছেন পশু।
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিংবা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর
মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর।

পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

শ্রীমান্ সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখেছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সব ক'টি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে'।

১৯৩৭

রুথ্‌লেস রাইম্

ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন
    শ্রীহারাধন কারফর্মা
ছাপতে গিয়ে দেখা গেল
    লেখা হলো চার ফর্মা।
সম্পাদক শ্রীসেনশর্মা
    চালিয়ে দিলেন করাৎ
লেখা হলো চার পৃষ্ঠা
    পাঠক, তোমার বরাত।

হঠাৎ বনল ফেমিনিস্ট
    ও পাড়ার ওই বিশে
    পিসীকে ডাকল পিসে।
খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে
    চণ্ডীচরণ চাকী
    কাকাকে ডাকলেন কাকী।

১৯৩৭

এপিটাফ

আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয়
    তবে লিখো—
লোকটা ছিল তরুণ

শেষ নিঃশ্বাসে
শেষ হিক্কায়
শেষ ধুকধুকে

তরুণ।
ফুর্তি করতে ভালোবাসত
ভালোবাসত ফুর্তি করে
ফুর্তি করে কাজ করত
ফুর্তির ছল পেলে বর্তে যেত।
তেমন ছল
মিলত কিন্তু তার বরাতে
ভাগ্যক্রমের পক্ষপাতে
তাই তার আপসোস ছিল না।

১৯৩৮

স্বগত

একদা দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল সহজে নাম করা
নাম তো হলো সহজে, ভালো বিপদে গেল পড়া।
সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য
কখন কথা কইব তবে? কখন তবে ভাবব?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে নাইব এবং খাব!
দুপুরে যদি পত্র লিখি নিশীথে নিবন্ধ
কখন ভালোবাসব তবে? করব কখন দ্বন্দ্ব?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে শোব, স্বপ্ন দেখব!
এ বেলা যদি কাহিনী লিখি ও বেলা লিখি ভাষণ
কখন তবে খেলব, বল? করব কখন শাসন?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে নাচব এবং বাঁচব!

১৯৪২

পণ

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
আসল কিংবা কম্‌দরী।
সোনায় হবে সোহাগা যে
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক!
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বন্ধ দেখি চারদিক।
মানতে হলো দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।

১৯৪২

মহাজন

মহাজন সুদ যদি পায়
আসল না চায়।
বুঝে দেখ, আছে কোন জন
নয় মহাজন?
বই লিখি পড়বে সকলে।

কেউ যদি বলে,
(না পড়েই) মহা সাহিত্যিক
আমি ভাবি, ঠিক!
আর তুমি, হে সমালোচক,
তোমার কী শখ?

লেখকেরা যেন ঘিরে থাকে
দাদা বলে ডাকে।

১৯৪২

বিক্রমীরা

বিক্রমীরা ভাগ করে ধরা
বেয়োনেট দিয়ে সে বাঁটরা।
পণ্ডিতেরা ভাজেন নজির
খই ফোটে ইডিয়োলজির।
তরুণের রক্তে লাগে দোল
সেও দেয় গোলে হরিবোল।

আমি নই বীর বা বিদ্বান
তরুণের দলে নাই স্থান।
এক কোণে আমি রচি ছড়া
বিনা ভাগে ভোগ করি ধরা।

১৯৪২

গেরিলার গান

ইউরেকা! ইউরেকা!
অনেক খুঁজে অনেক টুঁড়ে
অনেক চায়ের দোকান ঘুরে
পেয়েছি তার দেখা!
চাইনে জাহাজ, চাইনে বিমান,
চাইনে পুকুর*, চাইনে কামান,
কী হবে রণ শেখা!
ইউরেকা! ইউরেকা!

ইউরেকা! ইউরেকা!
অনেক রকম ঝাণ্ডা তুলে
অনেক বুলি আউড়ে ভুলে
পেয়েছি তার দেখা!
আয় নিধিরাম, আয় রে ছুটে
শত্রুদেরই অস্ত্র লুটে
মারব তাদের একা!
ইউরেকা! ইউরেকা!

১৯৪২

* tank

নিধিরামের নিবেদন

কইল নিধাই,
    ''রাইফেল চাই!
দিয়েছ তো যা চেয়েছি সব,
হে আমার পরম বান্ধব!
    বাকী ছিল, ভাই,
    রাইফেলটাই।
পিলে ভরা পেটটি যদিও
রাইফেল এই হাতে দিও।
    ঘরে ভাত নাই,
    রাইফেল চাই।''

    ফুকারে নিধাই,
    ''কী বলছ, ছাই!
রাইফেল এত কোথা পাবে?
বিলালে তো বারুদও ফুরাবে!
    কী দিয়ে সিপাই
    চালাবে লড়াই?
বুঝেছি, তোমার মনে ত্রাস
আমাদের কর না বিশ্বাস!
    পাছে আমরাই
    তোমায় তাড়াই!''

১৯৪২

পোড়ামাটি

সম্মুখে সমর হেরি' বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি' যবে গেলা বীরভূমে
স-মাল সপরিবার রেলপথ দিয়া
সখেদে কহিলা, ''সখে, এ কী কথা আজ
ইংরাজের মুখে! দগ্ধ মৃত্তিকার নীতি
রুশাচার হতে পারে, দেশাচার নহে।
বোমা পড়ি' যায় যাবে বাড়ীখানা। নাড়ি
ছাড়ি' যাবে যাক। কিন্তু কলিয়ারী মম
পোড়াইলে কী খাইব! মিল কারখানা
যদি ধ্বংস করি' যায় ইংরাজ আপনি
তবে মোর শেয়ারের মূল্য কী, বলহ!''
ভনিলাম, ''বিজেতার হস্তে পড়িবার
সম্ভাবনা ঘটিলেই পুড়িয়া মরিত
রাজপুত সতী। এ কি নহে দেশাচার?
কলিয়ারী কারখানা ইহারা কি নহে
পতিব্রতা ইংরাজের?'' শুনি' বীরবাহু
বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলি' স্মরিলা ঈশ্বর।
ট্রেন ছেড়ে দিল। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৯৪২

হিতোপদেশ

খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
গর্তে ঢুকে গপ্‌প জুড়ো।
সঙ্গে রেখো নস্যি গুঁড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো।

খুড়ি গো খুড়ি হামাগুড়ি
খাটের তলায় লেপের মুড়ি।
সঙ্গে রেখো টাকাকুড়ি
নইলে কখন যাবে চুরি।

১৯৪২

পারিবারিক

হ্যাঁ গো হ্যাঁ
পটলের মা
বর্গীরা পৌঁছাল বর্মা।
আসতে কি পারে
গঙ্গার ধারে
এদিকে যে রয়েছেন শর্মা!

থাক্ হে থাক্
পটলের বাপ
শুনেছি অমন কত বাক্।
তুমি যদি না যাও
বেহালাটি বাজাও
আমি যাই, পটলাও যাক্।

১৯৪২

উভয়সঙ্কট

হবে না শুনলে সুখী নয় এরা,
হবে শুনলেও শঙ্কিত
হবে কি হবে না, কেবলি শুধায়
উত্তেজনায় কম্পিত।

মরণের প্রজা, জীবনের সুত—
বেধেছে উভয়সঙ্কট
খাজনা না দিয়ে ভোগ করবে কি
ভোগ করে দেবে চম্পট।

সমাধান নেই, পলায়ন সেই
সমাধানেরই তো চেষ্টা
পালাতে পালাতে কিছু নাই হোক
দেখা হয়ে যাক দেশটা।

১৯৪২

কবিরা

সকলেই যদি ভাঙনের তাণ্ডবে
স্বেচ্ছায় রত রবে
তবে
সৃজনের কাজ করবে কে আজ ভবে!
দেবতা কি শুধু মারেন মৃত্যুবাণই
রুদ্র পিনাকপাণি!
জানি
দূরে গিরিচূড়ে একাকী থাকেন ধ্যানী।
আমাদের করে বজ্রাঙ্কুশ নাই
সে কথা ভুলে না যাই
ভাই,
আমরা যেন রে ধ্যানের সময় পাই।

১৯৪২

পার্থক্য

না, না।
আমরাও আছি তাণ্ডবে
তবে
আমাদের আছে মানা
সৃষ্টিরে ফেলে অনাসৃষ্টির অঞ্চল ধরে টানা।
না, না
কে চায় বাঁচতে নিরবধি
যদি
দিকে দিকে দেয় হানা
মারণ-মাতাল মরণের চর, শকুনিরা মেলে ডানা!
না, না।
আমাদের নেই পলায়ন
ক্ষশ,
পাল্‌কি হয়নি আনা।
কোন বনে গেলে মরব না, তার জানিনে ঠিক ঠিকানা।
না, না
আমরাও আছি তাণ্ডবে
তবে
আমরা তো নই কানা!
অনাসৃষ্টি কি নব সৃষ্টি রে? ভেদটুকু আছে জানা।

১৯৪২

প্রার্থনার উত্তর

করেছি প্রার্থনা—
আমায় সৈনিক করো, ক্রিশ্চান সৈনিক,
সকল বন্ধনহীন ক্রশ্‌ বাহনিক।
দীন পদাতিক করো, করেছি প্রার্থনা—
সকল বাসনাহীন ক্রিশ্চান সৈনিক।
পেয়েছি উত্তর—
আমায় করেছ তুমি বিদ্যানাগরিক।
তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক।
আমায় করেছ তুমি—পেয়েছি উত্তর—
তোমার অনন্ত রাস রসের রসিক।

১৯৪২

দিলীপদাকে

তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমি পলাতক সংগ্রাম হতে ভীরুর মতো!

আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
বলে, কাপুরুষ! গম্বুজে বসে বাদ্যরত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমার উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত!

ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই শরমে নত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত!

১৯৪২

বিষ্ণুকে

তোমায় আমায় মিল নাই কথা ঠিক সে
মিল নাই পলিটিক্‌সে।
কিন্তু রয়েছে মিল তো একটি ব্যাপারে
দুই জনেই তো ক্ষ্যাপা রে।
তোমার আমার দু'জনেরই অভিলষিত
কোটি কোটি জন তৃষিত।
শখের লেখায় সুখীদের খুশি করতে
কে চায় লেখনী ধরতে!
তুমি চাও আর আমি চাই মহাজনতায়।
অমিল তবুও আছে, হায়!

Book No.
Date

তুমি চাও তারা গান গেয়ে গেয়ে কাজ করে
সম সমাজের তাজ গড়ে।
আমি চাই তারা সৃষ্টির নব নব লীলায়
গান গায় আর হাত মিলায়।
তুমি কবি যত কর্মীর, যত শ্রমিকের
আমি কবি যত প্রেমিকের।

১৯৪২

পিতাপুত্রসংবাদ

পিতা

জাপানীরা যদি আসে
সাত টাকা যার যোগ্যতা নয়
যাট টাকা পাবে মাসে।
এ বি সি ডি যারা পারেনি শিখতে
বি এ বি টি হবে তারা
পাড়ায় পাড়ায় বি এ বি টি হলে
বিটির বিয়ে তো সারা।
এক টাকা দিলে আট মণ চাল
আট আনা মণ আটা
পাঁচ সিকা পণে বর পাওয়া যায়
পাঁচ পয়সায় পাঁঠা।
কাপড় কি আর কিনতে হবে রে
চায়ের কুপন জমে
ধুতি আর শাড়ি কামিজ শেমিজ
একে একে হবে ক্রমে!
স্বরাজ স্বরাজ সবাই চ্যাচায়
স্বরাজ কি ফলে গাছে!
স্বরাজ রয়েছে আধ পয়সার
আস্ত কাতলা মাছে।
জাপানীরা যদি আসে
পশুরাজ যাবে বসুরাজ হবে
মুক্ত করবে দাসে।

পুত্র

জাপানীরা যদি আসে
চন্দ্র সূর্য উঠবে না, আলো
ফুটবে না মহাকাশে।
ফুটপাথে হবে লুটপাট, আর
বাটপাড়ি হবে বাটে
ঘাটে ঘাটে হবে নারীধর্ষণ
খুন হবে মাঠে মাঠে।
পুঁইশাকটিও দেখতে পাবে না
পুঁটিমাছটিও নাই
বেত খেয়ে খেয়ে পেট ভরবে না
জুতো খেতে হবে তাই।
শাদার গোলামি সাদাসিধে ছিল
খাঁদার গোলামি শক্ত
নাক কেটে কেটে খাঁদা করে দেবে
চেটে চেটে খাবে রক্ত।
স্বরাজ স্বরাজ যে জন চ্যাচায়
সে জন জাপানী চর
আমাদের বাণী, রাশিয়ার মতো
গেরিলা যুদ্ধ কর।
জাপানীরা যদি আসে
ল্যাজ তুলে তারা কাল পালাবেই
লাল গেরিলার ত্রাসে।

পিতা

ধন্য রে তুই ধন্য
আমার অন্নে হয়েছিস তুই
গরিলার মতো বন্য।
বাড়ী ছেড়ে তুই বনেই চলে যা
গতি নাই আর অন্য।

পুত্র

বলেছ তো বেশ চোস্ত
জানো নাকি তুমি গত জুন হতে
ইংরেজ মেরা দোস্ত।
পুলিশের কাছে যাচ্ছি বলতে
তুমি বিভীষণ বোস তো।

পিতা

''দুর্গা!'' ''দুর্গা!'' জপ করো মন
আর কি গো প্রাণ বাঁচে!
জাপানীরা কবে আসবে কে জানে
পুলিশ তো আজ আছে!

১৯৪২

সৈনিক

সংখ্যায় কী আসে যায়! আমি চাই সত্যই সৈনিক
পশ্চাতে রাখেনি তরী, সাথে নাই সন্ধ্যার খোরাক।
একমাত্র প্রিয়জন দেশলক্ষ্মী। শুনে তাঁর ডাক
একটি তন্ময় প্রাণ যেথা আছে দিক সাড়া দিক।

আয়ুধে কী আসে যায়! আমি চাই স্বভাব সৈনিক।
যার আছে যার নেই দু'জনেই নির্ভয়ে বিহরে।
প্রতিপক্ষ নতশির দু'জনেরি মৃত বক্ষ 'পরে।
হিংসা অহিংসার মূল্য মরণেই হোক প্রামাণিক।

ইজ্‌মে কী আসে যায়! আমি চাই একাগ্র সৈনিক।
লক্ষ্য যদি এক হয় উপলক্ষ হোক না শতেক!
একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী যতেক।
দেশ যদি অন্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক!

হে অশান্ত, করো মনঃস্থির। আগে আপনার মনে
জয়ী হও নীতি আর মত্ততার নিত্যতন রণে।

১৯৪২

উত্তম পুরুষ

ভিক্ষুক বলি তাকে
"নাও নাও" বলে কখনো ডাকে না,
"দাও দাও" বলে হাঁকে।
ঘাতকেরও সেই ধারা,
প্রাণ নেবে তবু প্রাণ দেবে নাকো,
মারবে, যাবে না মারা।
ব্যবসায়ী তার নাম,
দেয় আর নেয় দুই হাতে তার
দক্ষিণ আর বাম।
সৈনিক সেইমতো
প্রাণের বদলে প্রাণ দেয় নেয়,
ক্ষতের বদলে ক্ষত।
প্রেমিক তারেই মানি,
নেয় নাকো, শুধু দিয়ে যায় সব,
রিক্ত উভয় পাণি।
ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।

তোমাদেরি দেওয়া প্রাণে
তোমাদের দেশ প্রাণ পাবে, আর
যুগ পাবে তার মানে।
আর কে বাঁচাবে বলো!
তোমরাই যদি হিসাবীর মতো
বিনিময় বুঝে চলো।
অথবা ঘাতক রূপে
প্রাণ দিয়ে তার দাম দিতে ভয়ে
ঘুরে মরো চুপে চুপে।
হে বন্ধু, হবে জয়
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়!
জানিনে কী জানি কবে,
এই শুধু জানি, হবে একদিন,
হবেই, হতেই হবে।

১৯৪৪

শঙ্করন্ নম্বুদিরি

নাচতে নাচতে খুলে যায় কারো কেশ
কারো খসে পড়ে বেশ।
নগ্ন তনুর সীমাহীন শিখা
হয় না তো নিঃশেষ।
তেমনি যে জন নটরাজ নটবর
তারও যায় কলেবর।
আত্মাকে দেয় আবরণহীন
প্রকাশের অবসর।

বাঁচনের বেগে শরীর পড়েছে খসে
তাই শোক করি বসে।
দৃষ্টি কেবল তনুগত; তাই
ঝাপসা অশ্রুরসে।
নৃত্য-তোমার ভারতে অতুলনীয়
মৃত্যুও মহনীয়!
মৃত্যুর নাচ দেখালে, দেখানো হলে
মৃত্যু দেখালে স্বীয়।

১৯৪৩

দুঃশাসনবধ কথাকলিনৃত্য দেখানোর অব্যবহিত পরে আচার্য শঙ্করন্ নম্বুদিরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি তার একটু পরে পৌছাই।

হনুমান জয়ন্তী

মুখপোড়াটা হনুমান
লঙ্কা পোড়ালি
লঙ্কাপোড়া আগুন দিয়ে
মুখও পোড়ালি।

পোড়ালি রে ছেলের মুখ
নাতির পোড়ালি
যুগে যুগে জাতির মুখ
তাও পোড়ালি।

মুখপোড়াটা অণুমান
জাপান পোড়ালি
জানিস্ কি রে সেই আগুনে
কাকে পোড়ালি?

মহাবীর অণুমান
মুখটি পোড়ালি
পোড়ালি রে জাতির মুখ
দেশের পোড়ালি।

১৯৪৫

রামরাজ্যবাদীর বিলাপ

এতদিন যে নাচতেছিলেম
তাক ধিনা ধিন ধিন্না
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

বনে যাবেন শ্রীদশরথ
রাজা হবেন রামজী।
কৈকেয়ী সে কোথায় ছিল
দিল এসে ভাঙ্‌চি।

দশরথ তো রয়েই গেলেন
সোনার সিংহাসনে
শ্রীরামকে যেতে হলো
দণ্ডক কাননে।

শোন্ রে ও ভাই রাশিয়ান রে
শোন্ রে ও ভাই চীন্না
পাকা ধানে মই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

সিমলার বৈঠক, ১৯৪৫

Book No
Date

হর্ষবাবুর হর্ষ

কোথায় চায়ের কেট্‌লীরে
মন্ত্রী হলেন এট্‌লী রে!
কোথায় আগুন?
চুলোয় আগুন।
কোথায় জল?
কুয়োয় জল।

কোথায় চা?
দোকানে চা।
কোথায় চিনি?
রেশনে চিনি।
কোথায় দুধ?
বাথানে দুধ।

যা ঝটপট ধাঁ চটপট
লে আও চিনি লে আও চা
ধরাও আগুন তোলাও জল
চাপাও চায়ের কেট্‌লী রে
ভারতসখা এট্‌লী রে!
কত জল?
ছ' কাপ জল।
কত চা?
ছ' চামচা।
কত চিনি?
ছ' চামচিনি।
কত দুধ?
আধ পো দুধ।
নামাও চায়ের কেটলি রে
মুক্তিদাতা এট্‌লী রে!
১৯৪৫

সাত ভাই চম্পা

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক

চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী।

গবরমেণ্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব
এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন, "যাও সাহেব।"
জেলখানাতে বন্দী এঁরা, এঁরাই আবার মিনিস্টর
ফাঁসি কাঠে এঁরাই ঝোলেন, এঁরাই নাকি গুপ্তচর।
সি এফ এফ চ্যাটারজী
এম এম এম মুকারজী...

জমিদারের পিসতুতো ভাই মহাজনের মাসতুতো
এঁরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতো।
মিল মালিকের প্রিয় শ্যালক মজুতদারের ভগ্নীপৎ
মজুর দলে এঁরাই আবার রক্তরাঙা অগ্নিবৎ।
চটি ফট ফট চটরস্কি
মুখ মক মক মুখরস্কি...
চোরা বাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এঁরাই তবু সম্পাদকী কাঁদুনী গান, "হায় রে হায়!"
এঁরাই নীলাম করেন জমি, এঁরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা—গোরু মেরে জুতো দান।

চটি ফট ফট চাটুয্যে
মুখ মক মক মুখুয্যে...

থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরি পরের দিন
কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের সেই লেনিন।
বর্তে যদি থাকতে পারো মর্ত্যে আরো কয়েক দিন
দেখবে তেনার জামাই দুটি কোলচাক আর ডেনিকিন।
চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী...

১৯৪৫

শ্রীশ্রী বাহনবর্গ

মা লক্ষ্মী, এই কি তোমার বিবেচনা
প্যাঁচাটাকে দিলে তোমার বাহনপনা!
স্বর্ণাসনা বলেন হেসে কানের কাছে
প্যাঁচার মতো প্যাঁচোয়া লোক ক'জন আছে!

সরস্বতী, বাহনটি, মা, দেখতে খাসা
শোভা পায় যতক্ষণ না ফোটে ভাষা!
বাগ্‌বাদিনী বলেন রেগে, শুনতে রূঢ়
প্যাঁক প্যাঁক বুলির আছে অর্থ গূঢ়!

কার্তিকেয়, তোমার কেন এ ভীমরতি
ময়ূর চড়ে রণ করে কোন্ সেনাপতি!
স্কন্দ বলেন, হায় রে এ কাল! কেই বা চেনে
এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ পীককপ্লেনে!

গণপতি, ভুঁড়ির ওজন পাইনে ভেবে
ইঁদুর তোমায় বয়ে বেড়ায় কোন্ হিসেবে!
গণেশ বলেন, বলিহারি বুদ্ধি হিঁদুর!
ইলেকট্রিকের মূর্ত প্রতীক এই যে ইঁদুর!

১৯৪২

মরা হাতী লাখ টাকা

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতী
একবার হরি হরি বল্
হাতী যারা মারল তারা কাঁপল রাতারাতি
যত লক্ষ্মীপেঁচার দল।
হাতীর শোকে কাঁদল যারা চাপড়ে বুকের ছাতি
একবার হরি হরি বল্
চোখের জলের ছাপা বেচে কিনল জিনিসপাতি
যত সারস্বতের দল।

হাতীর জন্যে হন্যে হয়ে করেন মাতামাতি
একবার হরি হরি বল্
নির্বাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতী
যত গণপতির দল।
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতীর খ্যাতি
একবার হরি হরি বল্
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতীর জাতি
যত বেঁচে মরার দল।

১৯৪৫

মোড়ল বিদায়

মোড়ল গেলেন মামার বাড়ী
মোড়ল! মোড়ল!
আস্ত একটা সাগর পাড়ি
মোড়ল!
পিঠ চাপড়ে বলেন, ওহে
মাতুল! মাতুল!
আছো তুমি কিসের মোহে
মাতুল!
লাল ভালুকে চেটে খেলো
ইরান! ইরান!
আধখানা যে পেটে গেলো
ইরান!

বজ্র বাঁটুল তোমার আছে
য়্যাটম! য়্যাটম!
দাও না ওটা আমার কাছে
য়্যাটম!
মামার অংশ আমার অংশ
অভেদ! অভেদ!
আমরা দুটি কুলীন বংশ
অভেদ!
মাতুল বলেন, কে রে ওটা
বাতুল! বাতুল!
য়্যাটম বুঝি লাঠিসোঁটা
বাতুল!

ইরান যদি যায় রে তাতে
তোর কী! তোর কী!
লড়বে এখন রুশের সাথে
তুর্কী।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
হা হা! হা হা!
কী যে বকিস হযবরল
হা হা!
মোড়ল তখন ক্ষুণ্ণ মনে
বিদায়! বিদায়!
মনের দুঃখে গেলেন বনে
বিদায়!

১৯৪৬

দুই রাণী

সুয়ো যে রাণী ছিল সোনার মঞ্জিলে
দুয়ো যে রাণী ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিল ভূপতির মনে!
ভূপতি বলে, শোন, তোমরা দুই বোনে
প্রাসাদে মিলেমিশে রহ
আমিই বনে যাই যাবার আগে তাই
ভবন দান করি, লহ।
সুয়ো যে রাণী বলে, না—
চাহি না এক সাথে থাকা
আমারে আলাহিদা মহল দিয়ে যাও
পাঁচিল গড়ে দাও পাকা।
দুয়ো যে রাণী বলে, না—
পাঁচিল গড়া হবে নাকো
তোমার না পোষায় যেথায় খুশি যাও
পোষায় যদি তবে থাকো।
নৃপতি দু'জনারে বোঝায় বারে বারে
বোঝে না কোনো একজনা
বরং গোসা করি উভয়ে গেল চলি
পুরীতে কেহ রহিল না।
গনিয়া পরমাদ দুয়োরে ডাকে রাজা
বলে, যা নিতে চাও লহ
শুধু সুয়োরে সেধে ভাঙাও অভিমান
দুজনে মিলেমিশে রহ।
তখন দুয়ো গিয়া চরণে হাত দিয়া
করিল কত সাধাসাধি।
সুয়োর তবু হায় ধনুকভাঙা পণ—
আলয় হবে আধাআধি।
নারীর মান ভাঙা নারীর কাজ নয়
ও কাজ পুরুষেরি সাজে
সুয়ো তা জানে তাই পুষিয়া রাখে মান
ধেয়ান করে মহারাজে।
আপনি মহীপাল না ডাকে যত কাল
ঘুরিবে পাগলিনী পারা
দুয়োর সুখ দেখে দুয়ারে ঢিল মেরে
করিবে মঞ্জিলছাড়া।
দু'বেলা শাপ দিবে ধরণীপতিকেও
বলিবে, মরো তুমি মরো
তা হলে দুই বোনে করিব কাড়াকাড়ি
আমিই বাহুবলে বড়।
রাজার বনে যাওয়া হলো না বুঝি হায়
গেলে যে ঘোর মারামারি
ভবন জুড়ি রহে পরম কারুণিক
বচসা করে দুই নারী।

১৯৪৬

গৃহযুদ্ধ

গোরুর গাড়ীর দুই গোরু ছিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
আধমরা দুই নির্বোধ প্রাণী
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
গাড়ী নিয়ে করে ঘোর টানাটানি
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
চাকা খসে গেলে হাবা হয় খুশি
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
গবা তাই দেখে মারে শিং ঘুষি
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
শকুনের দলে পড়ে গেল সাড়া
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
দিকে দিকে বাজে কাড়া ও নাকাড়া
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
হাবা আর গবা দুই মহাবীর
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
গুঁতোগুঁতি করে হলো চৌচির
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
গাড়ী ওল্‌টালো চাকা হলো ভাঙা
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
মেঠো রাস্তার মাটি হলো রাঙা
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
মরবে না ওরা। মিছে মন ভারী।
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
মরলে কে বলো টানবে গো-গাড়ী!
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

১৯৪৭

মা নিষাদ

ধন্য হে দেশ! ধন্য তোমার গুণ!
    সাধুরে করেছ খুন।
এবার তা হলে অসাধুরে নিয়ে থাকো
    চোরা কারবারে পাকো।
মৌর্য যুগের চক্র তোমার ধ্বজায়
    মর্যাদা রাখে বজায়
ধনে জনে বাড়ে চৌর্য বংশ
    বংশে ধরেছে ঘুণ।

ধন্য হে দেশ! ধন্য তোমার গুণ!
    নুন খেয়ে করো খুন।
দাসত্ব হতে মুক্তি যে দিল তার
    এই তো পুরস্কার!
হিংসার মদে মশগুল হয়ে আছো
    ধর্মের নামে নাচো
লজ্জা তো নেই, এক গালে কালি
    এক গালে মাখো চুন!

১৯৪৮

লক্ষ্মণসেনের প্রত্যাবর্তন

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
    গৌড় থেকে বঙ্গ
লক্ষ্মণসেন রাজা, তাঁর
    রাজ্য হলো ভঙ্গ।
    সাত শো বছর বাদে
    রাধে কৃষ্ণ রাধে!
আবার দেখি বাধল এ কী
    রাজ্যভাঙা রঙ্গ!

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
    বঙ্গ থেকে গৌড়
লক্ষ লক্ষ সেন যেন
    লক্ষ লক্ষ চৌর।
    সাত শো বছর পরে
    হরে কৃষ্ণ হরে!
ঘরের ছেলে ফেরেন ঘরে
    দিয়ে ডবল দৌড়।

অনুশোচনা

জননি, তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ
    বিকল করেছি অঙ্গ।
তোমারে যে ব্যথা দিয়েছি তাহার
    শতগুণ বহি, বঙ্গ।
পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর
    ছেড়েছি আপন ঘর।

দুর্বল ওকে করেছি, হয়েছি
    নিজে দুর্বলতর।
জননি, তোমার নিত্য করিব ধ্যান
    অভগ্ন অম্লান।
তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা
    তোমারি তো সন্তান।

১৯৪৯

নজরুল

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো
নজরুল।

এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক।

১৯৪৯

কাজী থেকে পাজি

কাজী
সকল কথায় হাঁ-জী।
হাঁ-জী! হাঁ-জী! হাঁ-জী!
দরদালানে থাকেন তিনি
বাদশা বেজায় রাজী।
একদিন সেই কাজী
বলে বসলেন,-না-জী।

যাবেন কোথা, এক নিমেষে
অমনি হলেন পাজি।
পাজি! পাজি! পাজি!
মনের দুঃখে বনে গেলেন
কাজী!

১৯৪৯

চোরের আত্মকথা

চোর বলে, ভাই, ডাকাতের উৎপাতে
রাজধানীতেও রাস্তায় চলা দায়
বোমা ছুঁড়ে মারে গাড়ীতে ও ফুটপাথে
বুলেট চালায় ব্যাঙ্ক পিয়নের গায়।

মানুষকে যদি বলি দিতে হয়, দাদা,
আমাদের মতো অহিংস মতে মারো
চালের সঙ্গে মেশাও কাঁকর শাদা
ফাঁসির হুকুম হবে না একজনারো।

তেলের সঙ্গে মেশাও শেয়ালকাঁটা
　　হোক বেরিবেরি কোলাব্যাঙ্ সম ফোলা
তেঁতুলবীচির সঙ্গে মেশাও আটা
　　পেট ছেড়ে যাক, যমের দুয়ার খোলা!

মানুষ মারার কৌশল জানি নানা
　　শুধু ভয় পাই চীনেদের দশা দেখে
এ মহাবিদ্যা ওদেরো তো ছিল জানা
　　তবু কেন ওরা ভাগে রাজধানী থেকে?

বলো দেখি এই এত ভুঁড়ি নিয়ে
　　কোথায় পালাই, কোন ফরমোজা দ্বীপে?
স্বপ্নের মাঝে কেঁদে উঠি ডুকরিয়ে
　　ওরা যে আমায় তাড়া করে আসে জীপে।

চোরের সঙ্গে ডাকাতের সংগ্রামে
　　গান্ধীর নাম কোনোই কাজের নয়
হাত যোড় করি মার্কিনজীর নামে
　　আণবিক বোমা, তোমারি হউক জয়।

১৯৪৯
Book No.

লিয়াকৎ আলির মস্কো যাত্রা

বাপজান! তুমি যেয়ো না!
সোনামণি! তুমি যেয়ো না!
ভালো ছেলে! তুমি যেয়ো না!
　　যেয়ো না হে তুমি রাশিয়া!
ওখানে রয়েছে স্টালিন!
যাদুকর ও যে স্টালিন!
ছেলেধরা ও যে স্টালিন!
　　ভোলাবে সর্বনাশিয়া!

জবাহর! যেতে দিয়ো না!
ভাইয়াকে যেতে দিয়ো না!
বাচ্চুকে যেতে দিয়ো না!
　　দিয়ো না হে যেতে রাশিয়া!
ছেড়ে দাও ওকে কাশ্মীর!
চায় যদি তবে আজমীর!
খুলে দাও গেট দিল্লীর!
　　স্বাধীনতা যাক ভাসিয়া!

১৯৪৯

গিন্নী বলেন

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিস্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি।
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা? কমিউনিস্টি।
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি
নিয়ে এলো প্লেগ কমিউনিস্টি।

গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বনলো কমিউনিস্টি।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলী খায় কমিউনিস্টি।
যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।
তাই বসে বসে করছি লিস্টি
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্টি।

১৯৪৯

দিলীপদাকে আবার

এবারে তা হলে কবিতে কবিতে
কোলাকুলি
বলার যা ছিল বলেছি সকলি
খোলাখুলি।
এসব কবিতা থাকবার নয়
থাকবে না
উড়ে যাওয়া হাঁস কেউ তারে ধরে
রাখবে না।

তবে যদি কেউ মনের জ্বালায়
রাগ করে
বুনো হাঁস বলে তীর ধনু নিয়ে
তাগ করে
তা হলেই হবে মরণে স্মরণে
একাকার
তা হলেই রবে রাগে অনুরাগে
মনে তার।

১৯৪৯

পাপ

জঙ্গল সে তো আপনি হয় না সাফ
কাটতে কাটতে সাফ করে যেতে হয়
অনেক জনের অনেক দিনের পাপ
অনেক জনের ত্যাগ দিয়ে তার ক্ষয়।

ত্যাগের বীর্য যদি কারো নাই থাকে
জঙ্গল তবে করে দিতে হয় খাক্
আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে তাকে
চেটেপুটে খায় কিছুই থাকে না ফাঁক।

ত্যাগের অস্ত্র হাত থেকে যদি খসে
সেই দিন হবে আগুন লাগার দিন
বাঁচবে না কেউ রাজার তক্তে বসে
ত্যাগের পুণ্য যদি হয়ে থাকে ক্ষীণ।

স্বাধীনতা নয় সব পেয়েছির দেশ
বহু শতকের স্তূপাকার জঞ্জাল
কোদাল লাগিয়ে নাই যদি হয় শেষ
আসবে তখন আগুন লাগার কাল।

১৯৪৯

মণিদাকে

ধ্যানের ধরণী ধ্যানের দেশ
হবে কি হবে না জানে কে?
ধ্যানেই হয়তো ধ্যানের শেষ
পরাভব তবু মানে কে?
দান্তে কি কভু জেনেছেন, কভু
মেনেছেন?
শেলী কি কখনো জেনেছেন, কভু
মেনেছেন?
কেন তবে তুমি জানবে, কেন বা
মানবে?
আশাহীন বাণী কেন তবে মুখে
আনবে?

অপরের আছে অপর কাজ
আছে করণীয় জ্ঞান, ভাই
আমরাই যদি না করি আজ
আর কে করবে ধ্যান, ভাই!
ঘুম নেই চোখে, পদচারণায়
রাত কাটে
আকাশের তারা আকাশে মিলায়
রাত কাটে।

সকলের হয়ে ধ্যান করি ভাই
আমরা
সকলের তরে লিখে রেখে যাই
আমরা।
অপরের কাজ অপরে করে
ধ্যান সাথে মিল নেই তার
তা বলে তোমার আমার পরে
সমালোচনার নেই ভার।

অনাসৃষ্টি সে তোমায় আমায়
কাঁদাবে
স্বপ্নভঙ্গ তোমায় আমায়
কাঁদাবে।
ব্যর্থ হবে না সে কাঁদন, যদি
ধ্যান করি
কিছুই হবে না অকারণ, যদি
ধ্যান করি।

১৯৪৯

নবদাকে

শান্ দাও আত্মার অস্ত্রে
শান্ দাও, শান্ দাও, অবিরাম
আর যার সংগ্রাম শেষ হোক
তোমার হয় নি শেষ সংগ্রাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
বিষাদে থেকো না ম্রিয়মাণ হে
তোমার জীবনে নেই বিশ্রাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
সত্যের আহ্বান শুনলেই
চিত্ত তোমার হয় উদ্দাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
রুদ্রের আহ্বান নিষ্ঠুর
মনে রেখো গান্ধীর পরিণাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।

১৯৪৯

ভূষণ্ডী

ভুষণ্ডী কয়
শোন্ রে উল্লুক...
এতদিন ছিল
ঠগের মুল্লুক
এইবার হবে
মগের মুল্লুক।

১৯৫০

কোনো নেতার মৃত্যুতে

ভাই,
স্বর্গে নরকে যেখানেই হোক ঠাঁই,
দেখবে সেথায় মুসলমানও আছে
কিন্তু ওদের তাড়াবার পথ নাই।

১৯৫০

কালের হাওয়া

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
লড়নেওয়ালা লড়ুক, যারা
মরবে তারা মরুক
লুটনেওয়ালা লুট করে নে
ভাঁড়ারটা তো ভরুক।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
কোরিয়া থেকে আসছে না, তাই
দাম বেড়েছে সাগুর।
মার্কিনেরা পাঠায় না; তাই
আট টাকা সের মাগুর।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
চালের বাজার আগুন হলে
তোদের আসে ফাগুন
এবার তোরা বেচবি, দাদা
পাঁচ সিকা সের বাগুন।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
শিক্ষা তোদের হয়নি আজো,
শিক্ষক পাইনি
অমনি তো কেউ শুনবে নাকো
ধর্মের কাহিনী।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
ভয় দেখাই বারো মাসই
কেউ করে না ভয়
দৈবে যদি পড়ল ধরা
পিছলে খালাস হয়।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
লড়নেওয়ালা লড়ুক, আর
মরণেওয়ালা মরুক
লুটনেওয়ালা লুট করে নে
ভাঁড়ারটা তো ভরুক।

১৯৫০

আরে আরে

আরে আরে ছিছি!
চোদ্দ হাত কাঁকুড়, তার
ষোলো হাত বীচি!

১৯৫২

কোথায় যাই?

আই লো আই
কোথায় যাই
কোথায় গেলে
শান্তি পাই?
বাঙাল দেশে
শান্তি নাই।

আসাম গিয়ে
সেথায় দেখি
কপালে মোর
লিখল এ কী!
কুমীর হলো
ঘরের ঢেঁকি।

বেহার গিয়ে
মনে ভাবি
পুরুলিয়ায়
আছে দাবি!
বললে, গয়ায়
পিণ্ডি খাবি।

তখন গেলাম
জগন্নাথ
দিলেক খেতে
পান্তা ভাত।
কেউ মানে না
জাত পাত।

তাই তো হলো
খেয়ালটা
এলেম চলে
শেয়ালদা।
চিঁড়ে গুড়
দিচ্ছে, খা।

১৯৫০

বঙ্গদর্শন

এক গালে তোর চুন, ও ভাই
আরেক গালে কালি
এমন করে কে সাজালো
ডান গালী বাঁ গালী
ডান গালী বাঁ গালী ওরে
ডাঙ্গালী বাঙ্গালী

এমন করে কে বানালো
ভিক্ষার কাঙ্গালী।
কে মেরেছে কে ধরেছে
কে দিয়েছে গালি।
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে
সংসার হাসালি।

১৯৫০

ঘুঘু-চরানি ছড়া

অবাক হতো বিশ্ব যাদের
মেল্ দেখে
হদ্দ হলো নিত্য নতুন
খেল্ দেখে।
মাকে নিয়ে ভাগাভাগি
মড়ার মতন রে
শেয়াল শকুন করে থাকে—
সে কী পতন রে!
সে যদি বা সত্য হলো
এ কী আজব খেল্!
ভা'য়ের বুকে হান্‌লি সুখে
দারুণ শক্তিশেল!
জান্‌লি না যে বাজল সে বাণ
কার বুকে!

দুই জনারি অভাগিনী
মা'র বুকে!
বুক থেকে মা'র রক্ত ঝরে,
স্তন্য কই?
দিকে দিকে শোর উঠেছে,
অন্ন কই?
ভাইকে মারে, মাকে কাঁদায়,
তারে বাঁচায় কে!
ভিটাতে যার ঘুঘু চরে
তারে নাচায় কে!
অবাক হতো বিশ্ব যাদের
মেল্ দেখে
হদ্দ হলো নিত্য নতুন
খেল্ দেখে।

১৯৫০

আড়ি

প্রথম অবস্থা

চাচা, তোমার সঙ্গে আড়ি
আর যাব না তোমার বাড়ী ·
চাচা, তোমার মাথা গরম
কথায় কথায় মারামারি
আর যাব না তোমার বাড়ী।
চাচা, তোমার সঙ্গে আমার
চিরদিনের ছাড়াছাড়ি
আর যাব না তোমার বাড়ী।

দ্বিতীয় অবস্থা

এই দুনিয়ায় সবাই ভালো
তুমিই শুধু মন্দ, চাচা,
তুমিই শুধু মন্দ।
ভেবেছিলেম তোমার সাথে
মিটল না আর দ্বন্দ্ব।
আসাম গিয়ে এলেম দেখে
বেহার গিয়ে এলেম ঠেকে
সকল দুয়ার বন্ধ, চাচা,
সবার দুয়ার বন্ধ।
ভাবছি, চাচা, লোকটা তুমি
এমন কী আর মন্দ!

তৃতীয় অবস্থা

চাচা, তুমি ভেজাল দিয়ে
মানুষ মারার কল জানো না
মিষ্টি কথার মুখোশ এঁটে
প্রতারণার ছল জানো না।
ষণ্ডামিতে পক্ক বটে
ভণ্ডামিতে নেহাৎ কাঁচা
এবার আমি বেশ বুঝেছি
তোমায় ছেড়ে যায় না বাঁচা।
চাচা, তোমার মনটা শাদা
যে যা বোঝায় তাই তো বোঝো
রাগের মাথায় পাগল হয়ে
মিথ্যে আমার সঙ্গে যোঝো।
নয়তো ভালো তোমার মতো
এই দুনিয়ায় ক'জন আছে!
কেই বা আমায় বাঁচিয়ে রাখে
শস্তা চালে শস্তা মাছে!
চাচা, এবার সন্ধি করে
যাবই যাব তোমার বাড়ী
তোমার বাড়ী বলছি কেন—
তোমার আমার দোঁহার বাড়ী।

১৯৫০

ঘুঁটে গোবর সংবাদ

গোবরবাবু চললেন তো চললেন।
বললেন,
গোবর থেকে ঘুঁটে বানায় জানতুম।
মানতুম
ঘুঁটে গোবর দুই জাতি নয় এক জাতি।
বজ্জাতি
দেখে দেখে এখন আমার হয় মনে
দুই জনে
এক গোয়ালে থাকা তো আর চলবে না।
ফলবে না
সুফল কোনো তোষণ করে বার বার।
থাকবার
চেষ্টা যত ব্যর্থ হলো তাই বলে
যাই চলে।
ঘুঁটে যখন পুড়বে তখন হাসব
আসব।
গোয়াল যখন জ্বলবে তখন নাচব
বাঁচব।
ঘুঁটে মিঞা বসে আছেন খুশ মনে।
দুশমনে
গোয়াল থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আহ্লাদ।
ঘোড়ানাদ
কোথায় ছিল বলল এসে,—আয় ভাই,
আমরাই

মিলে মিশে এক গোয়ালে বাস করি।
নাশ করি
চিহ্ন যত গৌবরীয় সভ্যতার
ভব্যতার
সঙ্গীতের সাহিত্যের নাট্যের
পাঠ্যের।

এখন থেকে ভাষা হবে মোর মতো।
তোর মতো
ঘুঁটে বুলি আমার মুখে খুলবে না।
ভুলবে না
তুমি বালক আমি পালক আজ থেকে
মাঝ থেকে!

১৯৫০

আটান্নর হামলা

আগডুম রে বাগডুম রে সাজলো রে ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম।
সাজলো রে বাজলো রে ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম।
ঢাক তাক তাক ঢাকাই ঢাক তাক তাক খুলনাই
খুলনাই।
ঢাকীরা মুলতানী সুলতানী—ভুল নাই
ভুল নাই।
বাজতে রে বাজতে রে চললো রে দৌড়ে
দৌড়ে।
সপ্তদশ অশ্ব পৌঁছলো গৌড়ে
গৌড়ে।
গুড় দিয়ে চা খায় রে গৌড়েরি লোকজন
লোকজন।
চিনির সাধ মিটবে রে জিতলে নির্‌বাচন
বাচন।
কোন্ দিন তা আসবে রে এই তার এক মামলা
মামলা।
এমন যে সময় রে বাধলো রে হামলা
হামলা।
এবারকার শতকটা দ্বাদশ নয় বিংশ
বিংশ।

গৌড়ের এই লোকজন যে নয় খুব অহিংস
হিংস।
মুলতানী সুলতানী হাঁক শুনে হায় রে
হায় রে!
লাফ দিয়ে উঠলো রে ছুটলো রে বাইরে
বাইরে।
জুটলো রে গাড়ওয়ালী মাড়ওয়ারী রক্ষক
রক্ষক।
গৌড়ের ওই গুড়টুকুর সিংহের ভাগ ভক্ষক
ভক্ষক।
আগডুম রে বাগডুম রে থামলো রে ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম।
সাজলো না, বাজলো না ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম।

১৯৫১

নাসিকের পরে

বলতেছিলেম মাসিকে—
নাক কান কাটা হলো না এবার
নাসিকে।
উক্ত মহান কার্য
মনে হয় অনিবার্য।
শাক দিয়ে মাছ যায় নাকো ঢাকা
ডেকে নিয়ে আসে
মাছিকে।

নাসিক কংগ্রেস, ১৯৫০

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী

ব্যাঙ্গমী
ঢেন্‌কানাল হয়েছে লাল
হায় ব্যাঙ্গমা সব বেচাল।

ব্যাঙ্গমা
জবাহরলাল
হন যদি লাল
তবেই রক্ষে—

নয় তো বা কাল
সারা দেশটাই
হয়ে যায় লাল।

ব্যাঙ্গমী
জবাহরলাল
হন যদি লাল!
তবেই হয়েছে—
সামাল সামাল!

নির্বাচন, ১৯৫০

বারো রাজপুত

জননী গো তুমি
নমস্যা
তোমারেই নিয়ে
সমস্যা।

দুঃখ তোমার
নয় পোহাবার
যেন রাত অমা-
অবস্যা।

ইংরেজ গেলো
কংগ্রেস এলো
করেছিল ঘোর
তপস্যা।

ভোট চান তাই
ডজন আড়াই
বামমার্গীয়
সদস্যাঃ।

১৯৫১

ঢাকার কারবালা

প্রাণ দিল যারা ভাষার জন্যে
জয় কি হবে না তাদের?
জয় তো তাদের হয়েই রয়েছে
জনতা পক্ষে যাদের।

১৯৫২

ত্রিকালদর্শী

সাম্রাজ্য রামরাজ্য
দেখলি একে একে
বাকী থাকে বামরাজ্য
হয়তো যাবি দেখে।

১৯৫২

পশ্চিম বঙ্গের প্র-জাতীয় সঙ্গীত

দু' বেলা দু' মুঠো ভাত যদি পাই
তবে তার মতো আর কিছু নাই
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
খেতে দাও, খেতে দাও!
বাঙালীকে খেতে দাও
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
ওগো দিল্লীর নাথ
ওগো জগতের নাথ
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর
প্রণিপাত! প্রণিপাত!

ভাতের বদলে দিতে চাও গম
ওগো নিষ্ঠুর! ওগো নির্মম!
দু'বেলাই চাই ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
খেতে দাও, খেতে দাও!
বাঙালীকে খেতে দাও
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
ওগো দিল্লীর নাথ
ওগো জগতের নাথ
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর
প্রণিপাত! প্রণিপাত!

সাহেবের মতো হবে কি ক্রুয়েল?
বজরা মেশানো গেলাবে গ্রুয়েল?
ঝরঝরে চাই ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
খেতে দাও, খেতে দাও!
বাঙালীকে খেতে দাও
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্।
ওগো দিল্লীর নাথ
ওগো জগতের নাথ
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর
প্রণিপাত! প্রণিপাত!

১৯৫২

ফতেপুর সিক্রী

শেষটা আমি ঠিক করেছি
দেশটা করে বিক্রী
গণ্ডা কয়েক গড়িয়ে দেব
ফতেপুর সিক্রী।

আয় রে বাঙাল, আয় রে
আয় রে কাঙাল, আয় রে
দেনার দায়ে জন্মভূমি
হলো তোদের ডিক্রী।

নাকের বদলে নরুণ পেলি
ফতেপুর সিক্রী।

১৯৫২

পক্ষিপণ্ডিত

ময়না রে
হবার যা নয় হয় না রে!
ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলি,
আসবে ফিরে ভেবেছিলি
সেই পুরাতন মনুর শাসন
যখন জাতির অন্নপ্রাশন।
সেই যে প্রাচীন সমস্কৃত
অমৃত সে বালভাষিত।
সেই সেকালের কুলীন প্রথা
পতির চিতায় শতেক গতা।
পূর্ব জন্মে পাপের ফলে
শূদ্র রবে পায়ের তলে
নইলে যে তার মুণ্ডু কাটা
নয়তো বা তার বুকে হাঁটা।
ময়না রে
বড়ো সাধের স্বপন যে তোর
আর মানুষের সয় না রে।
যা শিখেছিস্ সত্য যুগে
যা পড়েছিস্ যুগে যুগে
আদ্যি কালের কপচানো বোল
শুনতে শুনতে মানুষ পাগোল।
এখন শুনছি ইংরিজীতে
সেই সনাতন বুলির কিতে।
অবাক করলি পুঁথিপোড়ো
অমানুষিক কীর্তি তোর ও!
মানুষ তো নয়, পোষা পাখী
মানুষ হতে অনেক বাকী।
জানিস্ কেবল ষত্ব ণত্ব
জানিস্ নে তো মনুষ্যত্ব।
ময়না রে
তোর দিনকাল গেছে, ও ভাই,
চির দিন তা রয় না রে!

১৯৫২

দোসরা কামাল

ওরে নকীব সর্বনাশা!
খেদিবকে খেদিয়ে দিয়ে
মিটল না তোর মনের আশা!
একটি ঢিলে ভাঙলি রে তুই
পাঁচশো পাখীর সুখের বাসা!
ফকির হলো পাঁচশো পাশা।
এর পরে কি এক বা দু' লাখ
লিক্উইডেট্ করবি কুলাক?
জমিন্ পেয়ে বর্তে যাবে
জমিন্হারা ভুখা চাষা।
ওরে নকীব, দীনের আশা।
এবার তোকে শুনতে হবে
এছলাম বিপন্ন ভবে
গেল গেল ধর্ম গেল
গেল গেল মোল্লা সবে!
মিশর দেশের তুই যে কামাল,
শুনিস্ নে তুই ভয়ের ভাষা।
ওরে নকীব, দেশের আশা!

১৯৫২

NO

রাজা উজীর

তার পর কী খবর হে
তার পর কী খবর?
খবর তো জবর হে
খবর বেশ জবর।
কায়রোর কোন্ জাঁদরেল হে
নামটা তার নকীব
হাল তার কেউ জানত না
আমরাও না ওকিব।
চুপ করে "কূপ" করে
করছে কী করুক
দেশ ছেড়ে চললেন যে
শাহান শা ফরুক।
তার পর কী খবর হে
তার পর কী খবর?
খবর তো জবর হে
খবর বেশ জবর।

তেহরানের কায়ুম তো
বাদশার খুব পেয়ারে
জনতার কোপ দুর্জয়, তাই
চম্পট দেন এয়ারে।
কায়রো আর তেহরানসে
শ্রীনগর দূর অস্ত্
মহারাজ শ্রীহরিসিং যে
সবংশে দুরস্ত্।
তার পর কী খবর হে
তার পর কী খবর?
খবর তো জবর হে
খবর বেশ জবর।
কাঠমাণ্ডুর কৈরালা
এইবার তার পালা
এক ভাই কয় আর ভাইকে,
পালা রে পালা।

রঙ্গিলা দুনিয়া হে
আজগুবি কাণ্ড
শুম্ভ নিশুম্ভের রণ
দেখছে কাঠমাণ্ডু।

১৯৫২

বানভাসি

এলো বান সর্বনেশে
এলো বান সর্বনেশে গেল ভেসে হিমালয়ের নদীর পাড়
ডিব্রুগড়ে বাঁধ ভেঙেছে ঢাকার গ্রামে হাহাকার।
শহরের রাস্তা যত
শহরের রাস্তা যত খালের মতো কিস্তি চলে অবিরল

মৎস্য ধরে বেড়ায় কেউ আঙিনাতে অথই জল।
ওদিকে কুচবিহারে
ওদিকে কুচবিহারে চারি ধারে ছিন্ন হলো যোগাযোগ
বিমানপথে যাবে যে তার নাইকো উপায়! কী দুর্ভোগ!
বিহারের উত্তরেতে
বিহারের উত্তরেতে ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় সমুদ্রের
কোথায় মানুষ কোথায় বাড়ী ভাসছে হাতি ভাসছে শের।
তরাই গোরখপুরে
তরাই গোরখপুরে একটু দূরে সাপ জমেছে, যেমন স্তূপ
বাঘগুলোকে মুখে পুরে কুমীরগুলো আছে চুপ।
কুমীরের পৌষ মাস
কুমীরের পৌষ মাস সর্বনাশ অন্য যত বন্যদের
বনস্পতি ভাসছে জলে, কুলায় কোথা বিহঙ্গের!
কেন যে বন্যা হেন
কেন যে বন্যা হেন ক্ষেপল কেন ঠাণ্ডা মাথা হিমাচল?
হাইড্রোজেন বোমা ফেলে বরফকে কেউ করল জল?
হেন বান কে হেনেছে
হেন বান কে হেনেছে কে জেনেছে বলতে পারো সমাচার!
কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।

১৯৫৪

পোষ্য

চারটি বেলা চর্ব্য চোষ্য
খাবেন আমার চারটি পোষ্য।

তিনটি বেড়াল একটি কুকুর
সব রাখা চাই আমার খুকুর।

যে কোনো দিন অধিকন্তু
জন্ম নেবেন আরও জন্তু।

১৯৫৪

ঠাকুরঘরে কে রে

শত্রু তোমার ছিল যারা
তারাই পূজারী
তোমার নামে নৈবেদ্য
তাদের ছাঁদা ভারী।
বেঁচে থাকো রবি ঠাকুর
চিরজীবী হয়ে
তোমার যারা ইষ্টকামী
তারাই মরে ভয়ে।

বন্ধুগণের হস্ত হতে
রক্ষা করুন হরি
শক্ত হাতে পড়েছ হে
কর্ণ-ধরা তরী।
পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী
পাড়ায় পাড়ায় সং
এত ভঙ্গ বঙ্গভূমি
তবু কত রং!

১৯৫৪

চাল না পেলে

বাড়ী যদি বর্ধমান
খাবেন সুখে মর্তমান।
বাড়ী যদি হুগলী
খাবেন সুখে গুগলি।
বাড়ী যদি কলকাতা
খাবেন সুখে ওলপাতা।
বাড়ী যদি হাবড়া
মনের সুখে খা বড়া।
বাড়ী কি মেদিনীপুর?
খাবেন সুখে তালের গুড়।
বাড়ী যদি বাঁকড়া
খাবেন সুখে কাঁকড়া।

বাড়ী যদি বীরভূম
খাবেন ছাতু মাশরুম।
বাড়ী কি মুর্শিদাবাদ?
কোর্মা খাবেন মশলা বাদ।
বাড়ী যদি মালদা
খাবেন সুখে চালতা।
বাড়ী যদি দিনাজপুর
খাবেন সুখে চানাচুর।
বাড়ী কি জলপাইগুড়ি?
খাবেন সুখে গুড়গুড়ি।
বাড়ী যদি দার্জিলিং
গাঁজা খাবেন চার ছিলিম।

বাড়ী যদি কুচবিহার
খাবেন নাকো কুছ ভি আর।

১৯৫৪

ধরাধরি

রামের মোসাহেব শ্যামকে দেখি
শ্যামের মোসাহেব যদু
যদুর মোসাহেব শুনছি হরি
হরির মোসাহেব মধু।

এদের কাকে ছেড়ে কাকে বা ধরি
বলো তো ঘুরি কার পিছে
যাব কি উঁচু থেকে উঁচুতে আরো
অথবা নিচু থেকে নিচে?

রামের কোনো এক সাহেব আছে
মধুরও আছে মোসাহেব
সেকালে ত্রিশ কোটি দেবতা ছিল
একালে কয় কোটি দেব?

ধরতে হবে নাকি সকলকেই
ঘুরতে সকলেরই পিছে
যাব কি উঁচু থেকে উঁচুতে আরো
এবং নিচু থেকে নিচে?

১৯৫৪

রাসপুটিন

অনেক ছেলের তুমি হয়েছ বাবা
অনেক মেয়ের তুমি ছেলের বাবা।
জানতে না কোনো দিন পড়বে ধরা
ভাবতে সর্বসহা বসুন্ধরা।
পুলিশের সঙ্গে লড়তে গেলে
এখন তো যেতে হবে হাজতে জেলে।
ভুল করেছিলে, বাপু, ভারতে এসে
তোমার হবে না ঠাঁই আজ এ দেশে।

আরে, আরে, রামধন, ক্ষেপেছ তুমি
এই তো আমার আদি জন্মভূমি।
ভক্তরা চেয়ে দেখ সর্ব ঘটে
সকলের আনাগোনা আমার মঠে।
রুপেয়া জোগাবে যত মেড়োর মেড়ো
বুদ্ধি জোগাবে যত ভেড়োর ভেড়ো।
হাকিম খাটাবে মাথা করতে খালাস
সেই যেন চোর আর আমি এজলাস।

অতএব ভয় নেই, আমিই জেতা
দেশটা ভারত আর যুগটা ত্রেতা।

১৯৫৪

লেবু

লেবুর পাতা করমচা
দাও আমাকে গরম চা।
লেবু ওটা সরবতি
দাও তা হলে সরবৎ-ই।

লেবু ওটা পচ ধরা।
আমার সঙ্গে মশকরা!
বানাও তবে চাটনি
জিহ্বা দিয়ে চাট নিই।

১৯৫৪

এবারকার গরম

গরমটা যা পড়েছে, ভাই! চৈত্র থেকে এই!
আর বলো কেন? আর বলো কেন?
কুয়োর জল তো শুকিয়ে এলো! আকাশে জল নেই!

আর বলো কেন? আর বলো কেন?
কোনোখানে যাব যে ছাই আছে কি তার চারা?
আর বলো কেন? আর বলো কেন?
কোম্পানী তো বাড়িয়ে দিলেন সহসা রেলভাড়া।
আর বলো কেন? আর বলো কেন?
বোশেখ জষ্ঠি পাহাড়গুলো লোকে লোকারণ্য।
আর বলো কেন? আর বলো কেন?
সাগরতীরে বালু তাতে, যাব কিসের জন্য?
আর বলো কেন? আর বলো কেন?
আষাঢ়ে তো বৃষ্টি নামে তখন গিয়ে ফল কী?
যা বলেছ! যা বলেছ!
এখানে যে ফল পাকবে খাবে সেসব ফল কে?
যা বলেছ! যা বলেছ!

১৯৫৫

জমিদার তর্পণ

হায় রে জমিদারি! তোমার মায়া
কাটালো নাকো কেউ স্বেচ্ছায়
কালের ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটাতে হলো
কর্ণওয়ালিসের কেচ্ছায়।
খেদিয়ে দিল পূব বাংলা হতে
পিটিয়ে ছাল দিল উতরে
এখানে বধ হলো কলম দিয়ে
আইন কানুনের সূত্রে।

দু' ফোঁটা জল যদি থাকত চোখে
এসব অভাগার জন্যে!
সান্ত্বনার ছলে মিষ্টি কথা
তাও তো পড়ল না কর্ণে!
নবাবী আমলের জিয়ানো ভূত
নামবে নাকো ধূপ সরষের
নবাব মন্‌জিলে নামাতে হলো
ডঙ্কা পিটে খুব জোরসে।

১৯৫৫

শুচিবাই

ছুঁচো বললেন ছুঁচীকে,
তোমার মত ছুঁচি কে?
তোমার যেমন ছুঁচিবাই
এমনটি আর কোথা পাই?

ওগো গন্ধবেনের ঝি
তোমার শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে
আমিও ছুঁচি।

১৯৫৫

কৌতূহল

বাবু পায়ে হেঁটে চলেন যখন
ভুঁড়ি আগে আগে চলে
সেই যেন তাঁর বরকন্‌দাজ
"হট যাও" হেঁকে বলে।

অথবা সে তাঁর ইন্‌জিন, তিনি
চলেন যন্ত্রবলে
অশ্বশক্তি কত হবে, তাই
ভাবছি কৌতূহলে।

১৯৫৫

বাজার

বলো কী হে, বলরাম
কচু কেন এত দাম
ঢ্যাঁড়স এমন কেন মাগ্‌গি!

জানেন না, গঙ্গায়
জাহাজ আসে না, হায়!
পাচ্ছেন এই ঢের ভাগ্যি!

১৯৫৫

বীর বন্দনা

আহা অতুল, কীর্তি রাখলে ভবে
পর্তুগালের বীর!
ধন্য তোমার জন্মভূমি
টেগাস নদীর তীর!
চেয়ার থেকে উঠবে কেন?
বসো হেলান দিয়ে।
সিগারেটটা মুখেই থাকুক
কী হবে নামিয়ে!
মেশিন গানটা বাগিয়ে ধরো—
আগিয়ে আসে যেই
ঝাণ্ডাধারী নরনারী
অস্ত্র হাতে নেই

অমনি চালাও গুলির কল
চর্‌র্‌ চর্‌র্‌ চর্‌র্‌।
মানুষ তো নয়, পোকামাকড়
মর্‌র্‌ মর্‌র্‌ মর্‌র্‌!
আহা, কী মজাদার দৃশ্যখানা!
পর্তুগালের মউজ।
বিশ্বযুদ্ধে জিতবেই সে
এমন যার ফৌজ।
তাঁরা সবাই জিতবেনই
এনার যাঁরা মিত্র।
নাৎসী হতে নাৎসীতর!
অতীব বিচিত্র!

১৯৫৫

কিন্তু বাবু

'কিন্তু' বাবু গিয়েছিলেন
'কিংবা' দেবীর বাড়ী।
'যদি' মশায় এলেন সেথা
হাঁকিয়ে বেবী গাড়ী!

'কিন্তু' আর 'যদি' এঁদের
এমন হলো আড়ি
'কেন' হঠাৎ না জুটলে
বাধত মারামারি।

১৯৫৫

হট্টমালার দেশে

হট্টমালার দেশে
মুখার্জিকে ধরে নিল
মুখার্জিতে এসে।
মুখার্জিতে চালান দিল
মুখার্জির কোর্টে
দুই দিকেই গাউন পরা
মুখার্জিরা জোটে।
জেল হলো মুখার্জির
মুখার্জি জেলার
মুখার্জিতে বাঁধে বাড়ে
মুখার্জি টেলার।
ছাড়া পেলেন মুখার্জি
ইংরেজ চম্পট
সেই কারাদণ্ড তাঁর
পরম সম্পদ।
মন্ত্রী হয়ে মুখার্জির
আহা কী সুকার্যি!
অপোজিশন জুড়ে বসেন
আরেক মুখার্জি।
মুখার্জিকে বলেন তিনি,
মুখার্জি বুর্জোয়া
মুখার্জি জবাব দেন,
মুখার্জি রুশোয়া।

মুখার্জি পোড়ায় ট্রাম
মুখার্জিরা সরে
মুখার্জিরা চালায় গুলী
মুখার্জিরা মরে।
হট্টমালার দেশে
মুখার্জিকে ধরে নিল
মুখার্জিতে এসে।
ইতিহাসের পুনরুক্তি
মুখার্জির জেল
সেই কারাদণ্ড তাঁর
ভানুমতীর খেল্।
মুখার্জিরা কিষাণ মজুর
মুখার্জি হুজুর
নির্বাচনে দেখায় ভয়
মুখার্জি জুজুর
হেরে গেলেন মুখার্জি
হারিয়ে দিলেন কে?
হারিয়ে দিলেন মুখার্জি
মজা দেখ সে।
রাজ্য হলো ওলট পালট
আহা কী সুকার্যি!
তক্ত জুড়ে বসে আছেন
রক্তিম মুখার্জি।

১৯৫৫

শিলনোড়া সংবাদ

শিল বলে...শিল বলে...নোড়াকে...নোড়াকে...
তোর মতো...তোর মতো...খোঁড়া কে? খোঁড়া কে?
ফিরে ফিরে...ফিরে ফিরে...নেংচিয়ে...নেংচিয়ে...
থির হোস্...থির হোস্...ঠেস্ দিয়ে...ঠেস্ দিয়ে।
নোড়া কয়...নোড়া কয়...শিলকে...শিলকে...
চুরি করো...চুরি করো...কিল খেয়ে...কিলকে!
থামি তাই...থামি তাই...রক্ষে...রক্ষে...
বলো দেখি...বলো দেখি...ভদ্দর লোক কে?

১৯৫৫

নতুন রকম ক্রেরিহিউ

মেয়ে আমার আদুরী
নোটনরানী ভাদুড়ী।
একাই নাচে একাই গায়
একটি জনের সম্প্রদায়।

ছিল তখন চৌঘুড়ী
লক্ষ্মীদুলাল চৌধুরী।
আছে এখন লালবাতি
আড়াই কুড়ি নাতনাতি।

না আঁচালে নাই বিশ্বাস
বংশীবদন বিশ্বাস।
তবু যাই তাঁর উৎসবে
দৈনিকে নাম ছাপা হবে।

ধন্য তোমার এনার্জি
চিত্তচকোর বেনার্জি।
হারতে হারতে হারাধন
করছো নতুন দল গঠন।

১৯৫৫

দাদা, সত্যি

বাঙালীরা লেখে বাংলা হরফে
বাঙালীরা পড়ে সত্যি
দাদা, সত্যি! দাদা, সত্যি!
রাজ্যপালক হয়েছেন শ্রী
পি বি চক্রবর্তী।
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মাঝখানে উইঢিবি
আগে সংস্কৃত পরে সংস্কৃত
মাঝে ইংরাজী পি বি।

সত্যপঠন করালেন শ্রী
আর পি মুখার্জী।
এ আর কী! এ আর কী!
এখনো দেখছি সভাপতি পদে
সুনীতি চ্যাটার্জী।
আগে সংস্কৃত মাঝে ইংরাজী
শেষে অদ্‌ভুত শব্দ
জী জুড়ে দেওয়া মুখার চ্যাটার
ভাষাবিদ্ শুনে স্তব্ধ।

১৯৫৬

কুমীর বিদায়

গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।
আফ্রিকার পায়ের বেড়ী নাই।
খাল কেটে যে কুমীর হলো ডাকা
ভেবেছিল খালটা ওদের পাকা।
ঘুরিয়ে দিলে ইতিহাসের চাকা
কুমীরগুলোর গুমোর হলো ফাঁকা।

এবার ওরা মারবে বুঝি ঘাই
গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।
আফ্রিকার ভেঙেছে আজ ভয়
পায়ের বাঁধন হয়েছে তার ক্ষয়।
যাই ঘটুক—জয় বা পরাজয়—
সে হীনতা আর নয়, আর নয়।

কালো ধলো সমান হওয়া চাই
গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।

১৯৫৬

খনার বচন

বলছি তোমায় চুপি চুপি
যেমন মাথা তেমনি টুপী।
হাতের মাপে দস্তানা
নয়তো খালি পশ্‌তানা।
বড় যেথায় মানায় না
বড় সেথায় আনায় না।
নয়তো এনে হায়রানি
ফেরৎ দিতে দৌড়ানি।

বড় কলার পরবে কে
ঢলঢলে তার ঢং দেখে।
যেমন গলা তেমনি পটি
নইলে কেবল হটাহটি।
চ্যাঁচাও তুমি হাজারই
সাইজটা যে মাঝারি।
জেনো তোমার আপন মাপ
থাকবে নাকো মনস্তাপ।

১৯৫৮

ভবানীপুরের গাথা

সোনা দিয়ে মোড়া গদি
হায়, ও কে ছেড়ে যায়!
সিদ্ধার্থ রায়।
সিদ্ধার্থ রায়।
তখনি তো গেছে বোঝা
অর্থ ইহার সোজা—
"তদা নাশংসে বিজয়ায়!"

বারো শত মরা ঘুঁটি
কেঁচে গেল পুনরায়।
সিদ্ধার্থ রায়।
সিদ্ধার্থ রায়।
তখনি বুঝেছি, দাদা
অর্থ ইহার সাদা—
"তদা নাশংসে বিজয়ায়!"

দুই বলদের চেয়ে
দুই চাকা আগে ধায়।
সিদ্ধার্থ রায়।
সিদ্ধার্থ রায়।
বলেছে জ্যোতির্বিদে
অর্থ ইহার সিধে
"তদা নাশংসে বিজয়ায়!"

১৯৫৮

দুরদৃষ্ট

কী করব! পড়ে গেছি সেনেদের কোপে।
সেনানীরা রয়েছেন ঝাপে আর ঝোপে
খাপে আর খোপে।
কোথায় পালাই বল! ওঁরাই তো দেশ।
তবে কি জমাব পাড়ি আবার উরোপে?

বীমা তো করেছি বহু, কিন্তু করিনি এ—
বয়স যখন ছিল সেনবাড়ী বিয়ে।
মরি পশ্‌তিয়ে।
কী করব! ছিল না তো দূরদৃষ্টিলেশ।
খোয়াইতে পড়ে আছি দুরদৃষ্ট নিয়ে।

১৯৫৮

ধন্য নগর

গান্ধীবাদের জন্মভূমি
কর্মেও প্রথম
আহ্‌মদাবাদ কিসের মদে
এমন মতিভ্রম!

হিংসা এসে খাদি পোড়ায়
লক্ষেক টাকার
খাদি তো নয়, মহাত্মাজীর
বুকের শাদা হাড়।

পিতৃঘাতের রক্ত মেখে
দিল্লী হলো অন্য
পিতৃ পাঁজর ভস্ম করে
আহ্‌মদাবাদ ধন্য।

১৯৫৮

পিতৃহত্যার দ্বিতীয় দফা

নাথুরাম তো হানল দেহ
হানবে এরা মূর্তি
দেশের মুখে কালী মেখে
ধন্য এদের ফুর্তি।

১৯৫৯

উল্টো কেরল

টুইডেলডাম চাইনে
টুইডেলডী চাই
আয় রে তোরা দেশের লোক
শ্বশুরবাড়ী যাই!
শ্বশুরবাড়ী ক'হাজার?
শ্বশুরবাড়ী ছ'হাজার।
হাজার কবে লক্ষ হবে
লক্ষ্য আমার তাই।

টুইডেল সেন চাইনে
টুইডেল রায় চাই
আয় রে তোরা দেশের লোক
ডালহাউসি যাই।
ভক্ষ্য আমার লক্ষ্য নয়
আমি খুঁজি খেলায় জয়
রায় হবেন অন্নদাতা
সেন ধরাশায়ী।

১৯৫৯

চাঁদের বুড়ি ছোঁওয়া

মহাশূন্যের পারে বহুদূর লক্ষ্য।
ছেদ করে পৃথিবীর কক্ষ
লুনিক করেছে ভেদ চন্দ্রমা বক্ষ।

মানবের ইতিহাসে কোথা এর তুল্য!
কী এক নতুন দ্বার খুলল!
রুশেরা হয়তো এই ধরণীকে ভুলল।

আসমানী ভেলা ধরে ভাসতে ভাসতে
চলে যাবে হাসতে হাসতে।
"এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।"

হোক তাতে শোক নাই, এই শুধু কাঁদনি—
রাঙা যেন নাই হয় চাঁদনি।
এ মাটিতে বসে যেন স্বর্গের স্বাদ নিই।

১৯৫৯

শবরীর প্রতীক্ষা

সাত শত বৎসর যে
পথ চেয়ে আছি
ভিন দেশী জল্লাদের
হাত থেকে বাঁচি।
সেই তুমি ফিরলে হে
লক্ষ্মণসেন রাজা
কই তোমার ভাণ্ডারে
ক্ষীর সর খাজা?

সেনযুগের কীর্তি তো
পিষ্টক আর পুলি
অক্ষর পাল্টিয়ে হলো
ইষ্টক আর গুলি!
ভাত দেবার ভাতার না
কিল দেবার গোঁসাই
তুর্কী না তাতার না
গৌড়ীয় মশাই!

১৯৫৯

দাদাতন্ত্র

দাদা আমাদের অতি হুঁশিয়ার
বিড়ালকে দেন মৎস্যের ভার।
দাদা আমাদের!
শস্য ফলাতে মাঠে আর পাঁকে
মুনিষ পাঠান কীর্তনিয়াকে।
দাদা আমাদের!
খামারে মজুত ধানের সুমারি
রাখবে কে.আর? আদার বেপারী।
দাদা আমাদের!

রান্নাঘরে যে আছেন রাঁধুনে
গ্যাস ছেড়ে দেন মৃদু ও কাঁদুনে।
দাদা আমাদের!
ষষ্ঠীর কোলে বিরাট গুষ্টি
প্রথম লক্ষ্য তাদেরি পুষ্টি।
দাদা আমাদের!
প্রজাগুলো আছে, থাকা বাহুল্য
ভেট জোগানোই তাদের মূল্য।
দাদা আমাদের!

ব্যাটাদের যত আর্জি বায়না
আধপেটা খেয়ে বাঁচা কি যায় না?
দাদা আমাদের!

দাদা আছে বলে আছে তবু ধড়
দাদা না থাকলে মন্বন্তর।
দাদা আমাদের!

১৯৫৯

ন্যাশনাল বেঙ্গল টাইগার

আইন সভায় জংলা আইন
ঢাকায় হলো আগে
কলকাতা সে পেছিয়ে ছিল
এখন পুরোভাগে

আজকে ভাবে বাংলাদেশ
যে সুমহান তত্ত্ব
কালকে ভাবে সারা ভারত
এই তো শুনি সত্য।

১৯৫৯

সিঁদুরে মেঘ

ঘরপোড়া গোরু ফিরবে না ঘরে
যাবে না দেশের মাটিতে
গোয়ালপাড়ায় গোয়াল তুলে সে
গৌ হবে গৌহাটিতে।
আকাশে উঠবে সিন্দুরে মেঘ
কেমন করে সে জানবে?
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে
কোথায় ক্ষান্তি মানবে?

ত্রিবেণী

চোখের জলের তীর্থ ছিল
বঙ্গোপসাগর।
এ পার গঙ্গা ও পার পদ্মা
অশ্রুর নির্ঝর।

এমনি করে গেলো কেটে
তেরোটি বৎসর।
এবার আসে ব্রহ্মপুত্র
নয়ন ঝর্ঝর।

১৯৬০

ব্রহ্মপুত্র

বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি
নিত্য করে মারামারি।
মোগল এলো, ঐক্য এলো
মোগল গেলো, ঐক্য গেলো।

রাজপুতানী ভাগের মা
গঙ্গা পাওয়া ঘটল না।
এখন শুনি নতুন সূত্র
গঙ্গা নয়—ব্রহ্মপুত্র।

১৯৬০

বিদায়, মায়াবিনী

ঠাকু'মা, তুমি যদি থাকতে বেঁচে
এমন দিনে এই ঘটিকায়
তোমায় শোনাতেম নতুন কথা
বজ্রে ভরা এই ঝটিকায়।
তুমি যে বলেছিলে কামরূপেতে
পুরুষ গেলে আর ফেরে না
মেয়েরা জাদু জানে, বানায় ভেড়া
ভেড়াও ঘর মুখে ভেড়ে না।
তাই তো বড় হয়ে যাইনি আমি
কখনো কামরূপ প্রান্তে
কে জানে মায়াবিনী কী মায়া করে
বানায় মেষ তার কান্তে।

আমরা নিরাপদ দূরতা হতে
এখন শুনি কত কাহিনী
অভাগা নিবারণ বধূর হাতে
কাবাব বনে যেত, যায়নি।
ফিরছে দলে দলে পুরুষ যত
জাদুর মোহ হলো ভঙ্গ
এখন অগতির কোথায় গতি!
আ মরি পশ্চিম বঙ্গ!
এখানে কালীঘাটে কুহক আছে
যে আসে বনে যায় হাতী, মা!
এ নয় ভাঙা কুলো ফেলতে ছাই
আমরা কত বড় জাতি, মা!

১৯৬০

জিজ্ঞাসা

ডান হাতে আর বাম হাতে মিলে
বেধে গেল বাক্ যুদ্ধ
ডাইনী সে জোরে মটকিয়ে দিল
বামার কব্জি সুদ্ধ।
শিরে করাঘাত হানে বাম হাত
সমুখে আইন পুস্তক
বলে, "তুমি তারে শাস্তি না দিলে
কী করতে আছো, মস্তক?"

মস্তক থাকে তটস্থ হয়ে—
ডান হাতে দিলে শাস্তি
সেও যদি বলে, "আছো কী করতে?
এর চেয়ে ভালো নাস্তি।"
আমরা সভয়ে দেখছি দাঁড়িয়ে
জননীর দুরবস্থা
এমনিতে ছিল অঙ্গহীনা সে
হবে কি ছিন্নমস্তা?

১৯৬০

কালস্য কুটিলা গতি

মোচ্ছব
আহা মোচ্ছব
দেব মোচ্ছব আমি সত্যি
যদি পাকিস্তানের
দ্বার খুলে দেন
আয়ুব চক্রবর্তী।

যদি ফিরে যায়
আহা ফিরে যায়
ঘরে ফিরে যায় উদ্‌বাস্তু।
ওহো তেরো বৎসর
আগে ছিল যথা
পুনর্‌বার তথাস্তু।

ওঁ তথাস্তু।
ওঁ তথাস্তু।

১৯৬০

ধন্যি কুকুর

স্পেস ফের্তা কুকুর দুটো
লজ্জা দিল চিত্তে হে।
বলল, ''ওহে বিলেতফেরৎ,
গুমর তোমার মিথ্যে হে।
মোল্লা তুমি দৌড় তোমার
মসজিদ পর্যন্ত হে
মাইল চারেক ঊর্ধ্বে উড়ে
নিঃশেষ দিগন্ত হে।

আমরা কেমন গেলেম চলে
চাঁদ তারাদের কক্ষে হে
ধরিত্রী সে রইল পড়ে
দূর আকাশের বক্ষে হে।
দশ দিকেই মহাশূন্য
বিশ্ব যেন নিঃস্ব হে
তুচ্ছাদপি তুচ্ছ এই
মাটির মনিষ্যি হে।

মহাশূন্যে চেটে চেটে
জেলীর মতন পথ্য হে
উপলব্ধি হলো এই
দার্শনিক তত্ত্ব হে।''

১৯৬০

বল্ মা তারা

আফিম বিনে দিন চলে যায়
বেঁচে আছি মদ বিনে
এই বাজারে কেমন করে
আমরা খাব মাছ কিনে?

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা
চার টাকা চায় রুই পোনা
সুধাই তাকে, মাছের বেশে
পাচার কর কোন্ সোনা?

দর উঠছে রকেট চড়ে
মহাশূন্যে দিনকে দিন
দেখছি চেয়ে আকাশপানে
বাংলাদেশের গাগারিন।

১৯৬১

শব্দী

জব্দিবে কে শব্দীকে?
শব্দ যে যায় সব দিকে।
যতই আসুক দুঃসময়
শব্দ যে যায় বিশ্বময়।
যতই ঘটুক ভোগান্তি
শব্দ যে যায় যুগান্তে।

স্তব্ধ করো শব্দীকে
শব্দ যাবে সব দিকে
আর
পার হবে শতাব্দীকে।

১৯৬১

কোতরং

হাঁসের প্রিয় গুগলি
পোর্তুগীজের হুগলী!
গুণীর প্রিয় তানপুরা
ওলন্দাজের চিনসূরা!

চোরের প্রিয় আঁধার ঘর
ফরাসীদের চন্নগর!
শিশুর প্রিয় চানাচুর
দিনেমারের সিরামপুর!

লোকের প্রিয় ভোট রং
পিতৃকুলের কোতরং!

১৯৬২

রকেট

হা হা! হাউই চড়ে
মহাশূন্যে পাক দিয়ে আর পাক দিয়ে
দুই বীর এলো নেমে
কী গৌরবের ভাগ নিয়ে হে ভাগ নিয়ে।
একদিন এমনি করে
মহাশূন্যে ভোঁ হবে হে ভোঁ হবে।
ওরা ঠিক সোজা গিয়ে
চাঁদের দেশে পৌঁছবে হে পৌঁছবে!

কী সুধা আনবে হরে
সুধাকরের ভাঁড়ার থেকে ভাঁড় থেকে?
সে সুধা পান করে কি
অমর হবে প্রত্যেকে হে প্রত্যেকে?
হা হা! গাছে কাঁঠাল
গোঁফে তেল দাও, দাদা হে দাও, দাদা।
বেঁচে যাও বছর কয়েক
চিরকাল বাঁচতে যদি চাও, দাদা।
শুধু কি অমর হবে?
চিরযুবা সেই সাথে হে সেই সাথে।
হা হা! বলি কাকে?
হো হো! বৌদিদি যে নেই সাথে।

১৯৬২

রবীন্দ্র সরণি

ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে
রবীন্দরকে ভাসিয়ে দিল চিৎপুরের ঝিলে।
দ্বিধা হও, দ্বিধা হও, ওগো মা ধরণী,
চিৎপুরের নাম হলো রবীন্দ্র সরণি।

১৯৬৩

পরীক্ষা

এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি
স্বপ্নে মনে হয় সত্য সে কি?
একখানও পড়িনি পাঠ্য বই
পড়ব যে আর তার সময় কই!
কামাই করেছি ক্লাস, শুনে শিখিনি
সিলেবাস ভুলে গেছি, নোট লিখিনি।
পরীক্ষা এলো বলে। কী হবে উপায়!
ফেল করে এইবার মান বুঝি যায়!
অদ্ভুত ভয়বোধ, থরহরি ত্রাস,
ঘাম ছোটে, জোরে জোরে পড়ে নিঃশ্বাস।
কারে ডাকি, কে আমারে করে উদ্ধার?
মাথার উপরে যেন ঝোলে তলোয়ার।

আতঙ্কে চারি দিক হয়ে আসে কালো
উঠে বসে হাতড়াই কোন্‌খানে আলো।
আমারি আর্তরবে ভেঙে যায় ঘুম
চেয়ে দেখি এটা নয় হস্‌টেল রুম।
আমিও ছাত্র নই বয়সে কাঁচা
পরীক্ষা দিতে আর হয় না, বাছা।

১৯৬৩

নিধুবাবুর টপ্পা

নিধুবাবু বললেন বিধুবাবুকে,
"সব কিছু করা যায় কড়া চাবুকে।
পাহাড় টলানো যায়
পাথর গলানো যায়
স্বর্ণ ফলানো যায়
স্বার্থ ভোলানো যায়
ময়না পড়ানো যায়
গয়না গড়ানো যায়
ষাঁড়কে নড়ানো যায়
হাতীকে ওড়ানো যায়
খরচ কমানো যায়
ব্যাঙ্কে জমানো যায়
না খেয়ে আঁচানো যায়
বাকীটা বাঁচানো যায়
সব কিছু করা যায় কড়া চাবুকে।"
"কিন্তু"
বিধুবাবু বললেন নিধুবাবুকে,
"এটি তো গেল না করা জোড়া চাবুকে।
দিন দিন চড়ছে
জিনিসের দাম
কিছুতেই করছে না
নামবার নাম।
তা হলে কি আমিই
গদি থেকে নামব?"
(কোরাস) "তুমি না, তুমি না,
আমরাই নামব।"

১৯৬৩

বই নং
তারিখ
ফেরৎ

পরামর্শ

চাল কম খান
লাল গম খান।
চাল কম খান
শালগম খান।

চাল কম খান
আলু দম খান।
চাল কম খান
চমচম খান।

১৯৬৩

নদীয়া

কুমারখালী
এক হাতে বাজে না তালি।
মেহেরপুর
মিটমাট অনেক দূর।

বীরনগর
মনে কেউ রেখো না ডর।
নবদ্বীপ
জ্বেলে রেখো প্রেমের দীপ।

১৯৬৩

ভালেণ্টাইন

মহাশূন্য মনোলোভা
ভালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা।
তোমার তরে ভালিয়া,
পাঠাই আমার ডালিয়া।
সামান্য এই ক'টি লাইন
আমার প্রীতির ভালেণ্টাইন।

১৯৬৩

'ভালেণ্টাইন' এক জাতের সেণ্টিমেণ্টাল বা কমিক চিঠি।

দেখা যাক

আচ্ছা, মশায়, চৈনরা কি আসবে আবার তেড়ে?
—পার্কালাম।
পাকীরা কি ওদের সঙ্গে জুটবে দাড়ি নেড়ে?
—পার্কালাম।
কশীরা কি আমুর নদীর দখিন দেবে ছেড়ে?
—পার্কালাম।

সুকর্ণ কি বোর্নিওর উতোর নেবে কেড়ে?
—পার্কালাম।
বার্লিন যে এই হিড়িকে গেল ঠাণ্ডা মেরে।
—পার্কালাম।
জার্মানরা হাঁকবে নাকি, হা রে রে রে রে রে?
—পার্কালাম।

১৯৬৩

কামরাজ নাদার কথায় কথায় বলেন "পার্কালাম"—দেখা যাক।

বানর বা নর নয়

আগন্তুকের সাথে
রয়েছি মগন
লক্ষ্য করিনি তাই
মধ্যে কখন
বাগানে পড়েছে ঢুকে
পায়নিকো বাধা
বানর বা নর নয়
এক পাল গাধা।

১৯৬৩

Book No.

চাতকের গান

কানু বিনে গীত নেই
চিনি বিনে চা।
গুড় দিয়ে খাবো নাকো
লেবু দিয়ে না।
চাতকের কণ্ঠে
একই রাগিণী—
"হা চিনি! হা চিনি! হায়!
হা চিনি! হা চিনি!"

১৯৬৩

আমার কথাটি

ছড়া দিয়ে মিটবে না
কবিতার সাধ
তবু তো যায় না ভোলা
বচন প্রবাদ।
খোকা ঘুমোবে না, যদি
না পায় এ স্বাদ
পাড়া ঘুমোবে না, যদি
এটা পড়ে বাদ।

শান্তিধামের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চাঁদে নিয়ে যাও

চাঁদ বেড়ানী মাসী পিসী
চাঁদে নিয়ে যাও।
এবার, মাসী, সাধব নাকো
চাঁদ এনে দাও।

'আয় চাঁদ আয়' নয়
'যাই, চাঁদে যাই'।
ফিরে আসবার যেন
পথ খুঁজে পাই।

খোয়াই

খোয়াইতে থেকে
খেয়োখুয়ি দেখে
এই কথা বলে মন তো

খোয়াইতে যার
আদি উৎসার
খোয়াইতে তার অন্ত।

মৃত্যুঞ্জয়

মরতে মরতে ভয় যেন যায় ছুটে।
তখন জোয়ার রুধবে কে রে
দেয়াল যাবে টুটে।
আফ্রিকা! আফ্রিকা!
তখন লোহার দেয়াল যাবে টুটে।

অস্ত্র ওদের পড়বে খসে
চেয়ে তোমার মুখের পানে
আফ্রিকা! আফ্রিকা!
ওরাই তোমার ভয়াল রূপে
ভজবে মাথা কুটে।

সেদিন সেই প্রলয় বানে
কুলোবে না মেশিন গানে

মরতে মরতে ভয় যেন যায় ছুটে।

১৯৬০

বেনারসের সড়ক

ওগো আমার প্রাণের দাদা,
তুমি নইলে বলবে কে আর
কালোকে শাদা।
অতি সূক্ষ্ম বিচার কর
ব্যারিস্টারকে টীচারগণের
টীচার কর।
আমাদের এই গোয়ালপাড়ায়
বেনারসের সড়ক হবে
তেনার দ্বারায়।

বিড়ম্বনা

হায় হায় নিয়তির ছলনা!
ব্যারিস্টারের চাল হয়ে যায় বানচাল
গুরুগিরি আর তাঁর হলো না।
দাদাকেই দেওয়া হয় গুরুভার।
ভাইটি তো গুরুতর মানবে না দাদা বড়
সম্‌ঝাতে হলো তাকে ঠাঁই তার।
সড়ক রচনা হলো বন্ধ।
রচয়িতা একে একে সরে যায় পথ থেকে
কমে আসে গোয়ালের গন্ধ।

তিন সেন

জেতের দফা করলে রফা
সে তিন সেন :
ইস্টিসেন আর
উইলসেন আর
কেশব সেন।

দেশের দফা করলে রফা
এ তিন সেন :
পার্টিসেন আর
ইন্‌ফ্লেসেন আর
কোরাপসেন।

ধাঁধা

"এ জীবন অতি অনিশ্চিত
তবুও নিশ্চিত
কী আছে, বলহ।"
"কলহ!"

উষ্ট্র রোগ

উটের পিঠে চাপাও কুটো
যেমন খুশি মুঠো মুঠো।
পিঠের নাম মহাশয়
যা সওয়াবে তাই সয়।

উটের হলো উষ্ট্র রোগ
উট যে হলো অপারোগ।
ডাকো ডাকো বদ্দি ডাকো
বদ্দি বলেন, "খাবে নাকো।"

উট যে হলো পড়ো পড়ো
বদ্দি বলেন, "চোরকে ধরো।"
চোর বাছতে গাঁ উজাড়
বাড়ছে তবু কুটোর ভার।

উট যে হলো মরো মরো
বদ্দি বলেন, "ডাকাত ধরো।"
ডাকাত ধরে লাগাও মার
বাড়ছে তবু কুটোর ভার।

বদ্দি বলেন, "এখন উঠি।
চাপাও এবার শেষ কুটোটি।"

একাত্তুরে মন্বন্তর

একাত্তুরে মন্বন্তর
এ তার আয়না—
সধবা খায় না মাছ
কেননা পায় না।

মূষিকপর্ব

জানতে না তো হাল কী হবে
হটিয়ে দিলে হিন্দুরে!
ও মিঞা—
খুলনা শহর ছেয়ে গেছে
হাজার হাজার ইন্দুরে!

দিনে রাতে খাজনা নিতে
সদলবলে উৎপাত হে।
ও মিঞা—
ঢাকনা খুলে খাবার সরায়
হাঁড়িকুঁড়ি লুটপাট হে।

আলমারিতে রাখলে পোশাক
রাখলে কেতাব সিন্দুকে।
ও মিঞা—
দেখলে খুলে কেটে কুটে
গেছে, যেমন হিন্দুকে।

হল্লা করে দৌড়ে বেড়ায়
কিচমিচিয়ে আহ্লাদে।
ও মিঞা—
ভয় করে না, ডর করে না
বেড়াল হেন জল্লাদে।

ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর কিসে
বেড়াল হতে কম বা সে!
ও মিঞা—
ইয়া ইয়া বদন দেখে
বেড়ালই দেয় লম্বা সে।

হামেলিনের হাল মনে হয়
হাল আমলের খুলনারে।
ও মিঞা—
বেহালা আজ কে বাজাবে?
কোথায় সে জন? কোন্ পারে?

গাছ-পাঁঠা

মৎস্য খাইনে, কেননা পাইনে
মাংসেরও বেলা তাই হে
অগত্যা রোজই নিরামিষভোজী
গাছ-পাঁঠা পেড়ে খাই হে।

"ছি"

ছোট্ট একটি কথা আছে—"ছি"
সেই কথাটি বলতে যদি পারি
কেমন করে মুখ দেখাবে দেশে
মুনাফা শিকারী!

শত শত কণ্ঠে বল, "ছি"
বল, "ছি"
কর ছি—ছিকারী।
কেমন করে মুখ দেখাবে দেশে
মুনাফা শিকারী!

অরন্ধন

ইলিশ রে, তুই ধন্য!
ষোলো টাকা কেজি, তবু
কিনবেই এ পণ্য।
রন্ধনের রসদ নেই—
অরন্ধনের জন্য।

মাথার খোরাক

"মাছে আছে ফস্‌ফোরাস,
আমরা খাই মাছ।
মাছ খেলে বুদ্ধি বাড়ে।"

—আজ?

আকাল

"ফী রোজ খেয়েছি মাছ
চল্লিশ বছর,"
বলেন গোপালবাবু
রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

"মাছ বিনা ভাত খাওয়া
আজই প্রথম,"
থামেন গোপালবাবু
গলা থমথম।

ট্যাঁড়স

ট্যাঁড়স বলেন রেগে
এ কেমন কথা!
সকলের দাম বাড়ে
আমার অন্যথা!

মুখ থেকে এই বাত
যেই বেরিয়েছে
হাটে গিয়ে দেখি, হায়!
ট্যাঁড়সও বেড়েছে।

শেষ সন্দেশ

যুদ্ধকালে অভ্যাগত
সৈন্যকুলের ক্ষুধা
গোবংশ ধ্বংস করে
কমিয়ে দিল সুধা।

যাই বা ছিল বাকী, গেল
পার্টিশনে কমে।
তারপরে তো গোরুর খোরাক
কমতে থাকে ক্রমে।

এখন, বল, কে জোগাবে
স্বল্পতম দুগ্ধ?
এই সন্দেশ শেষ সন্দেশ,
হে সন্দেশমুগ্ধ!

সরষে

অ-পূর্ব বঙ্গভূমি!
সরষের তেল নাকে দিয়ে
ঘুমিয়েছিলে তুমি।

সরষের ফুল দেখছ চোখে
মূল্য আকাশচুমী।

জিব্রলটার সং

হঠাৎ শুনে চমকে উঠি
জিব্রলটার ফৌজ
কাশ্মীরেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাধিয়েছে কী মৌজ।
এরাই কি সেই আরবসেনা
তারিক যাঁদের নেতা?
এঁরাও কি পণ করেছেন—
মরা, না হয় জেতা?
ফিরে যাবার পথ রুধতে
নৌকা পুড়িয়েছেন?
শতকটা কি অষ্টম, আর
রাজ্যটা কি স্পেন!

ওহে আরব, ওহে তারিক,
কবির কথা শোনো।
শস্ত্রগুলো নতুন বটে
শাস্ত্র যে পুরোনো।
ব্যর্থ তোমার শিক্ষা করা
গেরিলা পদ্ধতি।
মধ্যযুগের মতবাদে
জারিয়ে আছে মতি।
আধুনিকের সঙ্গে এই
মধ্যযুগের দ্বন্দ্ব
পরিণাম এর সবাই জানে
তুমিই শুধু অন্ধ।

ভাগের মা

দুই পারেতে নিষ্প্রদীপ
দুই পারেতে গর্ত
কে জানত ভাগের মা,
ভাগাভাগির শর্ত!

জাপানীদের ভয় নয়
সহোদরের ভয়
কে জানত, ভাগের মা
এমন সে সময়!

বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ

বাধলে গৃহযুদ্ধ
চক্ষু করি রুদ্ধ
আমি যেন বুদ্ধ।

বাধলে গৃহযুদ্ধ
কর্ণ করি রুদ্ধ।
আমি যেন শুদ্ধ।

কচ্ছপ

কচ্ছপ চলে কচ্ছপী চালে
দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
বিংশ শতকে সবাই ছুটেছে
সময় মানেই বিত্ত।

ধীরে ধীরে চলা ছুটে চলা নয়,
না চলার চেয়ে ভালো সে।
ভালো নয় শুধু হাত পা গুটিয়ে
নিষ্ক্রিয় থাকা আলসে।

গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করা যায়
ঠিকমতো দিলে খোরপোষ।
কচ্ছপে তুমি যতই খোঁচাও
হবে না কখনো খরগোস।

কচ্ছপ সেও ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে
পৌঁছিয়ে যাবে লক্ষ্যে।
সময়পাগল মানুষের খোঁচা
বন্ধ হলেই রক্ষে।

বরং ফলবে বিপরীত ফল
খোলায় ঢুকবে হাত পা
কচ্ছপ রবে নিশ্চল হয়ে
সময়ের নেই বাপ মা।

খরগোস খুব বাহাদুর, জানি
হয় নাকো তবু বিশ্বাস
শেষতক তার দম থাকবে কি
ফুরোবে অকালে নিঃশ্বাস।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কুলাক, তোদের লিকুইডেটিতে মন চায়
কিন্তু কী করি, হাত যে ওঠে না, কুলাক!
মামাতো চাচাতো পিসতুতো মাসতুতো ভাই
তোরা আমাদের ষষ্ঠীর কোলে দু'লাখ।

খেসারত বিনা জমি কেড়ে নিতে মন চায়
কিন্তু কী করি, হাত ওঠে না যে, কুলাক!
ভাগনে ভাইপো ভগ্নীপতি ও শালারাই
রাজ্য জুড়েছে ষষ্ঠীর কোলে দু'লাখ।

কাগজের দরে ধান কেড়ে নিতে মন চায়
কিন্তু কী করি, হাত যে ওঠে না, কুলাক!
মজুতদার তো আমাদেরি দাদু দাদারাই
চোরাবাজারীও ষষ্ঠীর কোলে দু'লাখ।

কিছুই না করে হাত পা গুটিয়ে থাকা দায়
আমরা তো আর কূর্ম নইকো, কুলাক!
তোদের শাসিয়ে হরতাল করি দেশটায়
মনে করি যেন তোরা ইংরেজ দু'লাখ!

হরতাল যদি তোরাও করিস্, কী উপায়!
চাষবাস যদি বন্ধ করিস্, কুলাক!
জানটা কি তবে তোদের হাতেই, ও জামাই!
রাজ্যের রাজা তোরাই কি তবে দু'লাখ!

প্রভাসপত্তন

এ নয় দ্বাপর,
তবু কেন কেবা জানে
কালের চক্র
ঘুরে এল সেইখানে।

কৃষ্ণ পড়েন
ব্যাধের হাতের বাণে
যদুবংশকে
নিজের হস্ত হানে।

কলিযুগ পূর্ণ হলে

"কলিযুগ পূর্ণ হলে
আসবে ফিরে সত্য",
বলেছিলেন বড়কাকা,
"একথা নয় সত্য
কলিযুগ পূর্ণ হলে
আসবে ফিরে দ্বাপর
দ্বাপরশেষে ত্রেতাযুগ
সত্যযুগ তা' পর।"

তখন আমি ভেবেছিলুম
তত্ত্বটা আজগুবী
এখন দেখি লক্ষণটা
যাচ্ছে মিলে খুবই।
কাগজখানা হাতে নিয়ে,
মেলি আমার নেত্র
কোথাও দেখি মুষলপর্ব
কোথাও কুরুক্ষেত্র।

দাড়ি

এপারেতে যাদের বাড়ী
খবরদার! রেখো না দাড়ি।
ওপারেতে যাদের বাড়ী
দাড়ি গজাও তাড়াতাড়ি।

সাহেব বিবি গোলাম

মিঞা সাহেব মৌজ!
গোরী বেগম অস্ত্র জোগান
লড়াই করে ফৌজ।
দিল্লী গিয়ে নেবেন জিনে
বাপের তখত তৌস।

মিঞার কত রঙ্গ!
হলদি বেগম পাঠান ভেট
প্রেমের চতুরঙ্গ।
পাল্লা দিয়ে গোরী বিবি
জোগান অনুষঙ্গ।

ট্যাঙ্ক যে হলো জখম।
জলদি আও, জলদি আও
জলদি, হলদি বেগম।
হলদি বিবির ভাঙে ঘুম
লড়াই তখন খতম।

হিপ হিপ হুরে!
এমন সময় ও কী ধ্বনি
দূরে গোলামপুরে!
আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই,
হাঁকে নানান সুরে।

মিঞা সাহেব মৌজ!
দুই বেগমের অস্ত্র যত
নিজের যত ফৌজ
চালিয়ে দেবেন গোলামপুরে
রাখতে তখত তৌস।

চৌথী সাদী

হলদি বিবি জলদি আয়
গোরী বিবি ভির্মি খায়
গোলাপ বিবি মূর্ছা যায়
মিঞা সাহেব মেহেদী মাখেন
সুরমা আঁকেন কৌতুকে।
এবার যে তাঁর চৌথী সাদী
ভরবে মহল যৌতুকে।

রাঙা বিবি কত রঙ্গে
সাজাবে ঘর চতুরঙ্গে
জঙ্গী ভূষণ সারা অঙ্গে
জং বাহাদুর লড়তে যাবেন
শত্রুপুরে কৌতুকে।
এবার যে তাঁর তোশাখানা
ভরে যাবে যৌতুকে।

খবর শুনে সত্যি খাঁটি
শত্রুকুলের দাঁতকপাটি
পায়ের তলায় কাঁপে মাটি
মিঞা সাহেব আবার কখন
লড়কে লেঙ্গে কৌতুকে।
রাঙা বিবির সাঙা যদি
অঙ্গ সাজায় যৌতুকে।

Book No. ———
No. ———

মনোপলি

আংরেজীকে হটিয়ে দিলুম
এইবারে তোর পালা।
পালা, ওরে পালা।
তা নইলে লঙ্কাদহন
ল্যাজের আগুন জ্বালা।
উর্দূ নিপাত পালা।

উর্দূ যখন হটবে তখন
থাকবে কে কে বাকী?
ভাগিয়ে দেব নাকি?
বাংলা তামিল মালয়ালম
কেউ রবে না বাকী।
আমিই একাকী।

দেশকে স্বাধীন করার বেলা
সবার পড়ে ডাক।
কোথায় থাকে জাঁক!
ভোগের বেলা আমিই একা
আর কারো নেই ভাগ।
ভাগ রে, তোরা ভাগ!

আহ্মদবাদ

আহা মদ বাদ
মাংসও বাদ
মৎস্যও বাদ
বল্লভাচারী জৈনপীঠ!
তবুও তনুতে
অণুতে অণুতে
রক্তের স্বাদ
পেতে চায় কেন হিংসাকীট?

গান্ধীশতকে
চোখের পলকে
যা তুমি দেখালে
পিতৃঋণের সে অবদান
শুনে মনে হয়
পছন্দ নয়
মুছে দিতে চাও
তোমার ও নাম মুসলমান!

১৯৬৯

নব পদাবলী

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে হিংসা সত্য
তাহার উপরে নাই।

হিংসায় যদি হাত রাঙা করে
সকলেই বনে জল্লাদ
তা হলেই হবে বিপ্লব, আহা
তা হলেই হবে আহ্লাদ।

মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে।

তবু রঙ্গে ভরা

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা
মাথা থেকে পা অবধি শরিকী ঝগড়া।
কাটাকাটি বেধে যায় জিবে আর দাঁতে
হাতাহাতি অহরহ এ হাতে ও হাতে।
আরে ভাই, তোল হাই, নারদ নারদ!
আর কিছুদিন বাদে পাগলা গারদ!

চুনোপুঁটি

আমরা চুনোপুঁটি
হেতের বলতে দুটি
কলম আর গলা।

হেতের হলে ভোঁতা
পাত্তা পাব কোথা?
বৃথাই কথা বলা।

হেতেরে দাও শান্
কোরো না খান্ খান্
তীক্ষ্ণ হোক ফলা।

কে জানে সে কবে
তোমারও দিন হবে
ধন্য হবে বলা।

দুই কাঙাল

ভোজের খবর শুনতে পেলেই
অমনি ছোটেন ইটিং কাঙাল।
সভার খবর জানতে পেলেই
অমনি জোটেন মিটিং কাঙাল।

মুখবন্ধ

খোলা রাখি চোখ কান
দেখি শুনি জানি বুঝি
জবানটা মিঠে নয়
তাই আমি মুখ বুজি।

জবানের জন্যে কি
জান দিতে পারি, ভাই?
দেখি শুনি জানি বুঝি
মুখে শুধু কথা নাই।

দাওয়াত

হাভাতে যায় রাবাতে
সেধে নেওয়া দাওয়াতে।
পাকঘরেতে পাকেশ্বর
ভাত পড়ে না এ পাতে!
খালি পেট মাথা হেঁট
ফিরে আসে হাভাতে।

স্বখাত সলিল

দোষ কারো নয় গো মা
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি
খাল কাটি রাজ্য ভাসে
কোথায় গেলে পাব তরী।

কয়েক কোটি খরচ করে
গড়ে দে, মা, নৌকাবহর
পরের বছর চোখের জলে
নাও ভাসিয়ে চলব শহর।

হে লেখক

লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে
কোন্ স্বর্গে যাবে, হে লেখক?
তার চেয়ে থেকো তুমি
সীমাস্বর্গে নিঃসঙ্গ একক।

যাই লেখ, যাই কর,
দৃষ্টি রেখো দূর লক্ষ্য পরে
দৃষ্টিচ্যুত সৃষ্টি দিয়ে
আয়ু ভরে, হৃদয় না ভরে।

চেয়ো না ডাইনে বামে
চেয়ো শুধু সুদূর দিগন্তে
বর্ষায় যা বুনে যাবে
পাকবে তা সোনালি হেমন্তে।

শৃঙ্খলা যেথায় নেই
বাল বৃদ্ধ সম উচ্ছৃঙ্খল
ছন্দের শৃঙ্খল পরে
তুমি সেথা চির অচঞ্চল।

হট্টগোল স্তব্ধ হলে
যখন নামবে নীরবতা
ধরিত্রী পাতবে কান
শুনতে তোমার দুটি কথা।

যেখানে যা নেই

যেখানে সুন্দর নেই
তুমিই সুন্দর হয়ে এসো
ভালোবাসা নেই যেথা
সেথায় তুমিই ভালোবেসো।

শান্তি নেই যেইখানে
তুমিই সেখানে এনো শান্তি
বিশৃঙ্খল কোলাহলে
তুমিই প্রথম দিয়ো ক্ষান্তি।

ক্ষীণমধ্যা

কবিতা বনিতা লতা
হবে অনবদ্যা
বিধাতার বরে যদি
হয় ক্ষীণমধ্যা।

বাগীশ কবির গড়া
হে পৃথুল অঙ্গী
কী হবে ও ছলাকলা
কী হবে ও ভঙ্গী!

আলো দাও, রস দাও
যৌবনমদ্যা
হে কবিতা, হে বনিতা
হও ক্ষীণমধ্যা।

কঙ্গ ভঙ্গ

হিপ হিপ হূরকী!
তুরকী নাচন নাচিয়ে দিল
তরুণ যত তুরকী!
যক্ষটিকে বিদায় দিয়ে
যক্ষের ধন কোষে নিয়ে
চক্ষের নিমেষে তুমি
করলে এ কী, রাজীয়া!
পঞ্চায়েতে তুচ্ছ করে
পর্বতেরে উচ্চ করে
ডাইনে বাঁয়ে হাতে হাতে
বাধিয়ে দিলে কাজিয়া।

ওরাও জঙ্গী এরাও জঙ্গী
দেখে দোঁহার অঙ্গভঙ্গী
মনে তো হয় কঙ্গ ভঙ্গ
এমন বেশী দূর কী!
দেখেছিলুম কেমন রঙ্গ
ভারতভঙ্গ বঙ্গ ভঙ্গ
এখন দেখি কঙ্গ ভঙ্গ
হিপ হিপ হূরকী!

তুরকী নাচন নাচিয়ে দিল
তরুণ যত তুরকী।

সেও

সৃষ্টির কাজে
বিধাতার নেই হেলা
ভাঙেন যখন
সেও সৃষ্টির খেলা।

বর্ষশেষের প্রার্থনা

এই ছিল ওরা ধরার বক্ষে
এই গেল ওরা চাঁদের কক্ষে
এই ফিরে এলো অক্ষতদেহে
সকলি দেখেছি মুগ্ধ চক্ষে।
বাকী থাকে শুধু একটি কথাই—
পিতা, মানুষেরে করুন রক্ষে।

শূন্য হাঁড়িতে

শূন্য হাঁড়িতে যা তুমি ফেলবে
তাই তুমি পাবে, ভাই
তার বেশী নেই পাবার—
খাবার।
আর ভালো নেই পাবার—
খাবার।

হিংসার চালে হিংসার ভাত
মিথ্যার চালে মিথ্যার ভাত
এই তুমি পাবে, ভাই
আর কিছু নেই পাবার—
খাবার।

ক্ষমতা

দেখেও শেখে না কেউ এই সার কথা
ঠেকেও না শেখে
বন্দুকের নল থেকে আসে না ক্ষমতা
আসে ভোট থেকে।

দেখমারিজম

তখন ছিল মেসমারিজম
এখন হলো দেখমারিজম।

ওই বুড়োটা ছেলেধরা
দেখমার দেখমার।
এই ছোঁড়াটা চশমা পরা
দেখমার দেখমার।

বিটকেলটা নাড়ছে দাড়ি
দেখমার দেখমার।
রাসকেলটা চালায় গাড়ি
দেখমার দেখমার।

ওই বুড়িটা ডাইনীবুড়ি
দেখমার দেখমার।
এই ছুঁড়িটার সোনার চুড়ি
দেখমার দেখমার।

গা জ্বলে যায় শুনলে ভাষা
দেখমার দেখমার।
বাড়ীটা তো দিব্যি খাসা
চুরমার চুরমার।

শ্যামকুলিজম

বলছি, সখি, শোন লো তুই
শ্যাম আর কুল রাখব দুই।
বিপ্লবই আমার প্রিয়
সকলরূপে বরণীয়
কিন্তু আমার আলম্বন
বিধানসভার নির্বাচন।
নির্বাচনের ফাঁকে ফাঁকে
শ্যামের বাঁশি আমায় ডাকে

গদী করি বিসর্জন
আসন করি বিবর্জন।
কী হবে ছাই বিধানসভায়
মন্ত্রী হতে কেই বা লাফায়!
দিক ভেঙে ওই সভা মন্দ
নয়তো আমি ডাকব বন্ধ।
আমার দাবি নির্বাচন
নইলে হবে বিপ্লাবন।

শুক সারী সংবাদ

শুক বলে, আমার কঙ্গ
মচকাবে না, হবে ভঙ্গ
পরতন্ত্র রণসঙ্ঘ
দুই বগলে তারি!

সারী বলে, আমার কঙ্গী
তারও আছে নানান সঙ্গী
বামাপন্থী বামপন্থী
তাই তো দলে ভারী।
নইলে জিতবে কেন?

শুক বলে, আমার কঙ্গ
অতিবামকে দিল সঙ্গ
কেউ দেখেনি একই অঙ্গে
নীল কালো লাল।

সারী বলে, আমার কঙ্গী
সেও জানে নানান ভঙ্গী
ক্ষণে রঙ্গী ক্ষণে জঙ্গী
যখন যেমন চাল!
আচমকা হারবে কেন?

ছন্দোগুরু প্রবোধচন্দ্র সেন

বাহাত্তরে হয়নি যে ক্ষয়
ছিয়াত্তরে হবে না সে লয়।
নাতি নাতনির পাশাপাশি
হেসে খেলে উতরিবে আশি।

খাঁই যার দুধ আর খই
আয়ু তার হবে নব্বই।
ফলবে কি যদি আমি লিখি
দেখে যাবে শতবার্ষিকী?

সরস্বতী

সরস্বতী পূজলে পর
লক্ষ্মী এসে দেবেন বর।
তাই তো শুধি বাণীর ঋণ
বৎসরেতে একটা দিন।

পরের দিনই বিসর্জন
বাকী বছর বিস্মরণ।

রাসভশক্তি

যতই পেটাও যতই চ্যাঁচাও
গাধা হয় না ঘোড়া।
হলে কেমন ভালো হতো
বোঝে না মুখপোড়া।

সবাই বলে অশ্বশক্তি
সর্বশক্তিসার
আমি দেখি রাসভশক্তি
অনন্ত অপার।

শ্রেণীযুদ্ধ

ঘোস বোস মিত্তির
চট্টো ও বন্দ্যো
শ্রেণীতে শ্রেণীতে এঁরা
বাধালেন দ্বন্দ্ব।

শ্রেণীশত্রুরা কারা?
কী মহান সত্য।
মুখো আর গঙ্গো
দে আর দত্ত।

পিসিরা বিধবা হন
মাসিরা নির্বংশ
সোনার যাদুরা করে
যদুকুলধ্বংস।

অসুবিধে

ভদ্রতার এক অসুবিধে
মুখে লাজ পেটে খিদে।

তুষার-দম্পতির পরিণয় পঞ্চাশী

আধ শত বছরের
পুরাতন মদ্য
তুষারে জারিত বলে
স্বাদু আর সদ্য।

বিবাহের চেয়ে মিঠে
বিবাহজয়ন্তী
কনকের পরে ওঁরা
হীরকের পন্থী।

রূপকার

রূপকার, হে রূপকার
করো একটু উপকার।
এমন কোনো উপায় বলো
কেউ না যাতে রয় বেকার।

এমন কোনো উপায় বলো
রক্তারক্তি না হয় আর।
রূপকার বলেন, হায়!
কে নেবে এ রূপের দায়!

মূর্তিবদল

তোমরা বল, যাও সাহেব।
আমরা বলি, আও সাহেব।
গড়ের মাঠের মূর্তি গিয়ে
লেনিন আসুন, তাও সাহেব।
পার্ক স্ট্রীটের মাথায় বসুন
চেয়ার পেতে মাও সাহেব।

Book No

নামান্তর

যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকাচুল তারই নাম বুড়ি।
যার নাম কৃষ্ণ তারই নাম কালী
যার নাম সংস্কৃত তারই নাম পালি।
যার নাম দর দাম তারই নাম ভাও
যার নাম নিকসন তারই নাম—।

শরিক এল দেশে

খাস তালুকের প্রজা
শুনবে কেমন মজা!

বড়দা এসে জলপানি দেয়,
“ভোট দিয়ে যা, ভজা”।
মেজদা এসে তড়পানি দেয়,
“ভোট দিয়ে যা, ভজা”।

সেজদা এসে ধমক লাগায়,
“ভোট দিয়ে যা, ভজা”।
ছোড়দা এসে ঘুষি বাগায়,
“ভোট দিস নে, ভজা”।

খাস তালুকের প্রজা
এ কী নতুন মজা!
মাথা আমার হেঁট
ভোট নয় তো, ভেট!

আগডুম বাগডুম

আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
রাজ্য চালাতে গিয়ে দেখান আজব খেল।
এক একটি সুলতান ঢাকা থেকে মুলতান
গোলা আর গুলী দিয়ে করে যায় গুলতান।
চেঙ্গিজ তৈমুর নাদিরশা হুলাকু
মেরেছেন এক লাখ মেরেছেন দু' লাখু
তাঁদের উপরে নাকি দিয়েছেন টেক্কা
সার্থকনামা বীর জাঁদরেল টিক্কা!
শুনে কাঁদে এ পরাণ শুনে কাঁপে এ হিয়া
নাদিরের ঘরানা শাহান শা এহিয়া
অর্ধেক লোক মেরে রাখবেন একতা
ছয় কোটি মরবে সত্য কি একথা?

ছয় কোটি অক্কা! একদম ছক্কা!
লাশ হয়ে দেশ হবে মাশরিকি মক্কা!

হাঁক শুনি দৈনিক সাথে আছে চৈনিক
আরো কত জাঁদরেল আরো কত সৈনিক।
আসবেন চেঙ্গিজ আসবেন তৈমুর
দেখবেন দু'ইয়ার দিল্লী অনেক দূর!
কপালে কী আছে লেখা জানে সবজান্তা
বাংলায় হারবেই মিলিটারি জাণ্টা।
আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
বাংলা বিষম ফাঁদ সেখানে ফুরাবে খেল।

১৯৭১

বাগবন্দী

আছে এক খেলা তার এই হলো ফন্দী
ছাগ তাতে জিতে যায় বাঘ হয় বন্দী।
সমানে সমানে রণ নয় তবু জানিও
খান্ সেনা দূরদেশী, গেরিলারা স্থানীয়।

১৯৭১

বঙ্গবন্ধু

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার,
শেখ মুজিবুর রহমান!

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়,
জয় মুজিবুর রহমান!

১৯৭১

বাংলাদেশ

তোমার আমার আঁকা পথে
চলবে না ঘটনার ধারা
এঁকে বেঁকে চলবে আপন
চিরকেলে আঁকাবাঁকা পথে।

কী হবে কী হবে কী যে হবে
তুমি আমি ভেবে হই সারা
ইতিহাস তবু বলবে না
ধাঁধার জবাব কোনোমতে।

ধরে নাও হবে যাই চাও
এত দুঃখ যাবে না বৃথায়
যদি যায়, নিরুপায় মন
একদিন মেনে নেবে তাও।

আশার প্রদীপশিখা জ্বেলে
থেকো তবু মৌন প্রতীক্ষায়
অকস্মাৎ আরো একদিন
মিলে যাবে যাই তুমি চাও।

১৯৭১

অঘ্রানের বান

অঘ্রানেতে আজ আমাদের
বান এসেছে হর্ষের
মুদির দোকান হানা দিয়ে
তেল কিনছি সরষের।
পদ্মানদীর মৎস্য পাব
টাকা দু'তিন ওর সের
এখন থেকেই বুদ্ধি করে
তেল কিনছি সরষের!
মহানন্দে তাকিয়ে আছি
গোয়ালন্দ পানে
কখন আসে ঢাকা মেল
তাজা মৎস্য আনে
এখন থেকেই লাইন দিতে
চলি ইস্টিশানে।
চোখে দেখার আগেই হবে
অর্ধভোজন ঘ্রাণে।
কারো কাছে মুক্তি বড়ো
কারো কাছে চুক্তি
কারো কাছে হুমকি বড়ো
কারো কাছে যুক্তি।
সবার উপর মৎস্য বড়ো
এই আমাদের উক্তি।
তাই আমরা স্বপন দেখি
বাংলাদেশের মুক্তি।

১৯৭১

কাক মজলিস

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?
ভাবেন নবাব।
যেমন ওদের হ্যাংলা স্বভাব
ভাবেন নবাব।

ছড়াও ভাত, ভাত ছড়াও
দলগুলোরে হাত করাও,
বলেন নবাব।
নিজের জন্যে সরিয়ে রাখেন
কোর্মা কবাব।

চিড়িয়াখানার কাক ছাড়া কে
ভুলবে এতে!
মোগল খাবেন খানা, দেবেন
এঁটো খেতে।

কেউ যাবে না, কেউ খাবে না
ওদিকে যে মুক্তিসেনা
থাবা পেতে।
মটকাবে ঘাড় কখন এসে
আঁধার রেতে।

১৯৭১

মাণিকজোড়

সাম্যবাদীর উক্তি—

শ্রেণীবৈরীর সঙ্গে
কোলাকুলি করি রঙ্গে।
মরছে মরুক চাষা উজবুক
অস্ত্র পাঠাই বঙ্গে।

ধর্ম-অন্ধ জঙ্গী
আফিংখোরের সঙ্গী।
ধর্ষিতা নারী কাঁদছে কাঁদুক
আমি উদাসীনভঙ্গী।

গণতন্ত্রীর উক্তি—

ডিকটেটরের সঙ্গে
কোলাকুলি করি রঙ্গে।
গণতন্ত্রীরা মরছে মরুক
শস্ত্র পাঠাই বঙ্গে।

তুমিও জোগাও অস্ত্র
আমিও জোগাই শস্ত্র
তোমার চাইতে আমি আরো ভালো
বিতরি অন্ন বস্ত্র।

১৯৭১

সোনার অক্ষরে লেখা

চেঙ্গিজকে ভাগিয়ে দিয়ে
দম্ভ-তার ভাঙালি!
বাঙালী!

তৈমুরকে হারিয়ে দিয়ে
প্রাণভিক্ষা মাঙালি,
বাঙালী!

নাদিরশাকে বন্দী করে
সাজিয়ে দিলি কাঙালী!
বাঙালী!

ইতিহাসের কালি মুছে
সোনার রঙে রাঙালি!
বাঙালী!

১৯৭১

ইন্দিরার সম্মান

নারীর অপমান সয় না ভগবান
সীতাই রাবণের ধ্বংস।
দ্রৌপদীরই তরে কৌরবেরা মরে
হস্তিনাপুর নির্বংশ।

বঙ্গে খান্ সেনা নারীকে ছাড়বে না
হাজার হাজার তার সাক্ষ্য
ভারতে রানীসম তাঁকেও নির্মম
এহিয়া বলে কটুবাক্য।

তাই তো হলো তার রণে দারুণ হার
দম্ভ হলো তার তুচ্ছ
পশুরা ধরা পড়ে এহিয়া যায় সরে
ইন্দিরা হন আরো উচ্চ।

১৯৭২

স্বপ্নে দেখা দেবতাকে

বললেম আমি সজল চক্ষে,
"করুন রক্ষে! করুন রক্ষে!"
বললেম আমি করে জোড় কর,
"দয়া করে, দেবি, দেবেন না বর।"

অশেষ করুণা এ জগৎ দেখা
অশেষ করুণা এ সকল লেখা।
ভাষা হবে ঠিক, ঠিক হবে ভাব,
এতেই ধন্য। কী হবে খেতাব!

তবু যদি হয় পেতেই উপাধি
আমার স্বগণ জয়দেব আদি।
পদ্মাবতী চরণ চারণ
চক্রবর্তী আমি একজন।

১৯৫২

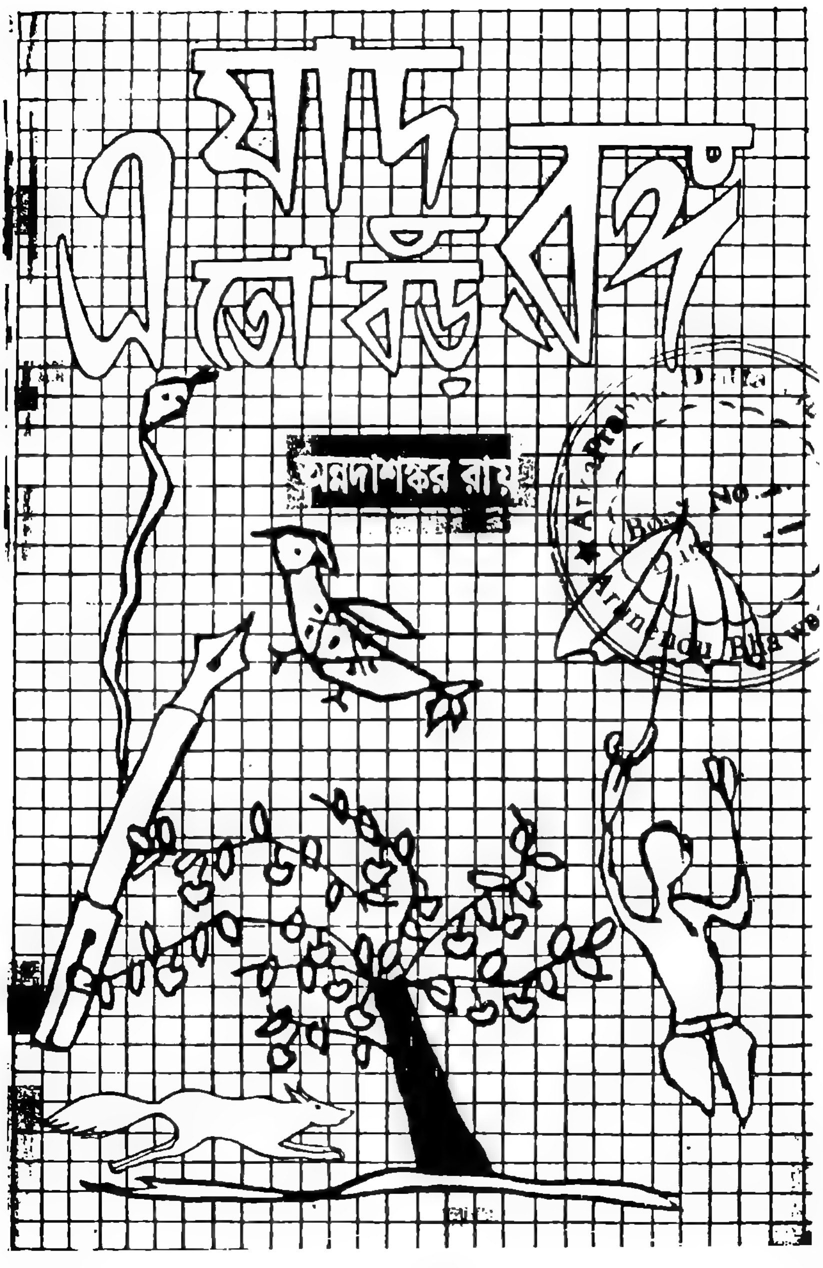
যাদু
এতো বড় রঙ্গ
অন্নদাশঙ্কর রায়

লোডশেডিং

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
লোডশেডিং থামাতে পারো
যাব তোমার সঙ্গ।
লোডশেডিং থামে যখন
অ্যাটম বানায় দেশে
অ্যাটম থেকে ইলেকট্রিক
আলো জ্বালায় শেষে।
কন্যে, আলো জ্বালায় শেষে।

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
আলো যেদিন জ্বলবে সেদিন
যাব তোমার সঙ্গ।
এই তো সবে টেস্ট শুরু
অ্যাটম হবে দেশে
আলো জ্বালার আগে তোমার
পাক ধরবে কেশে।
কন্যে, পাক ধরবে কেশে।

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
অন্ধকারে কেমন করে
যাব তোমার সঙ্গ?
অন্ধকারে সবাই চড়ে
মোটরবাইক স্কুটার
রাস্তা খোঁড়া চতুর্দিকে
পাতালপানে ছুটার।
কন্যে, পাতালপানে ছুটার।

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
পাতালপানে কেমন করে
যাব তোমার সঙ্গ?
পাতালপানে যাচ্ছে সবাই
আকাশপানে চেয়ে
তুমিই শুধু যাবে নাকো
তুমি কেমন মেয়ে?
কন্যে, তুমি কেমন মেয়ে?

১৯৭৪

বাইরে ও ভিতরে

বাইরে কোঁচার পত্তন
ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।
রাম রাম হরে হরে!

বাইরে ধলা টুপি
ভিতরে কালা রুপী।
রাম রাম হরে হরে!

বাইরে ভি আই পি
ভিতরে খোলা ছিপি
রাম রাম হরে হরে!

বাইরে হিল্লী দিল্লী
ভিতরে গ্রাম্য বিল্লী।
রাম রাম হরে হরে!

১৯৭৫

হচ্ছে হবের দেশে

সব পেয়েছির দেশে নয়
হচ্ছে হবের দেশে
কাঁঠাল গাছে আম ধরেছে
খাবে সবাই শেষে।

দুধের বাছা, কাঁদো কেন
হচ্ছে হবের দেশে
গোরুর বাঁটে মদ নেমেছে
খাবে সবাই হেসে।

হাত পা কেউ নাড়রে নাকো
হচ্ছে হবের দেশে
ফাইল জমে পাহাড় হলে
প্ল্যানগুলো যায় ফেঁসে।

কারখানাতে ঝুলছে তালা
হচ্ছে হবের দেশে
মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে
বক্তৃতা দেয় ঠেসে।

মনের কথা লুকিয়ে রাখে
হচ্ছে হবের দেশে
সবাই ভাবে পেয়ে যাবে
সব কিছু অক্লেশে!

লক্ষ্মী সোনা, ভয় পেয়ো না
হচ্ছে হবের দেশে
হাজারটা দল বাজায় মাদল
বিপ্লবীর বেশে।

১৯৭৩

বেড়াল খোঁজে নরম মাটি

কেউ বা ভোলে চোলাই মদে
কেউ বা ভোলে খোসামদে।
কেউ বা ভোলে নারীর কোলে
কেউ বা ভোলে মাছের ঝোলে।
মনে রেখো এই কথাটি
বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।

কেউ বা ভোলে নগদ টাকায়
কেউ বা পায়ে তৈল মাখায়।
কেউ বা ভোলে পদের মায়ায়
কেউ বা ভোলে রাজক্ষমতায়।
এই কথাটি জেনো খাঁটি
বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।

১৯৭৪

দিল্লী চলো

দিল্লী চলো দিল্লী চলো
কুত্তা চলো বিল্লী চলো।
হাতী চলো ঘোড়া চলো
কানা চলো খোঁড়া চলো।
গুণ্ডা চলো দাগী চলো
ঘুঘু চলো ঘাগী চলো।
সাধু চলো সন্ত চলো
মঠেরও মোহন্ত চলো।

সিনেমার তারা চলো
বেকার বেচারা চলো।
হোমরা চলো চোমরা চলো
আমরা চলি তোমরা চলো।
দিল্লী গেলে হবেই হিল্লে
দল গড়ব সবাই মিল্‌লে।
ভোট জিতলে জুটবে হিস্‌সা
কুরসী নিয়ে জমবে কিস্‌সা।

১৯৭৮ No

জরুরি জারি গান

ইস্কাবনের বিবি রে,
জরুরি তাঁর কেল্লা
বাইরে যে তার বাহার কত
কত রঙের জেল্লা রে, কত রূপের জেল্লা!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

দুষ্টজনের জীবনে তা
সর্বনাশের কেল্লা
শিষ্টজনের জীবনেও
দারুণ ত্রাসের কেল্লা রে, দীর্ঘশ্বাসের কেল্লা!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

বিশ্ববাসীরা বলে, ও যে
দুর্গাবতীর দুর্গ
আর কিছুদিন সবুর করো
হবে স্বর্গপুর গো, ভূ-ভারতের স্বর্গ!
—আহা, বেশ বেশ বেশ!

সংশয়ীরা বলে, হবে
দ্বিতীয় ক্রেমলিন
নির্বিচারে বন্দীরা যার
অন্তরালে লীন হে, অন্তরে বিলীন!
—নাকি বেশ বেশ বেশ!

ভাগ্যে হঠাৎ পড়ল ধসে
মহৎ ত্রাসের কেল্লা
নয় পাষাণের নয়কো লোহার
ফাঁপা তাসের কেল্লা রে ফাঁকা তাসের কেল্লা!
—হা হা বেশ বেশ বেশ!

১৯৭৭

শতরঞ্জকে খিলাড়ি

তোমরা কি কেউ বলতে পারো
এই নাটকের ভিলেন কে?
কৌরবে আর পাণ্ডবে এই
রণ বাধিয়ে দিলেন কে?

তিনি কি এক নারায়ণ?
নারায়ণ তো এক নন,
বলতে পারো কোন্ জন?
এর পেছনে ছিলেন কে?

তবে কি সে রাজদুলাল
নামটি নাকি শান্তিলাল?
এমন সুতের জনক যিনি
তাঁকেই মেনে নিলেন কে?

ট্র্যাজেডী তো ঘনিয়ে আসে
এখন তাকে থামায় কে?
দূতিয়ালি আর কতকাল
কুৎসার ভূত নামায় কে?

শুনছি তাঁরা চারজনা!
কোরো আমায় মার্জনা,
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
পাঞ্চজন্য বাজায় কে?

কৃষ্ণ আছেন, কৃষ্ণা আছেন
কে যে কখন কাকে নাশেন
এই ট্র্যাজেডীর কী যে মানে
বুঝিয়ে দেবে আমায় কে?

১৯৭৮

জেলখানা যায় যে-ই

জেলখানা যায় যে-ই
গাড়িঘোড়া চড়ে সে-ই।
সে-ই করে ভোট জয়
রাজপাট তারই হয়।
এই তো দেশের রীতি
সনাতন রাজনীতি।
তুমিও তো এই পথে
উঠেছিলে রাজরথে।
তবে কেন ভুলে গেলে
বিরোধীকে দিলে জেলে?
ও আমার ঠান্‌দি!
ইন্দিরা গান্ধী!

এ কী ভুল! এ কী ভুল!
হারালে যে রাজকুল!
পার হয়ে ভোট নদী
ফের কবে পাবে গদী!
মনে রেখো দেশ রীতি
সনাতন রাজনীতি!
জেলখানা যায় না যে
জনভোট পায় না সে।
ও আমার ঠান্‌দি!
ইন্দিরা গান্ধী!

বাঘের পিঠে

বাঘের পিঠে চড়েন যিনি
কেমন করে নামেন তিনি?
পিঠের থেকে নামেন যিনি
বাঘের মুখে পড়েন তিনি।

বিসর্জন

ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে
দেশাইকে ভাসাইল যমুনা সলিলে।
সার্বজনীন পূজা অবেলায় পণ্ড
পঞ্চদেবতার বেদী খণ্ড বিখণ্ড।
গণেশ মেলান হাত মহিষের সঙ্গে
গণেশ মহিষ রাজ বিরাজেন রঙ্গে।
কার্তিক সাথী নন, তিনিই বিপক্ষ
ভাবেন পাবেন কবে অসুরের সখ্য।
হায়রে নতুন দিল্লী, কী দৃশ্য হেরিলি
এ রায়বেরিলি নয় সে রায়বেরিলি।

১৯৭৯

বাঘসওয়ার

বাঘের পিঠে চড়নদার
ও যে তোমার মরণদ্বার।
মরণ তো নয়, নির্বাচন
তাতে হেরে নির্বাসন
বাঘের সঙ্গে চালাকি
বোঝ এখন জ্বালা কী।

১৯৭৮

খিলাড়িকা খেল

আয়ারামের খেল, ও ভাই
গয়ারামের খেল কী!
চকিতে ঘটিয়ে দিল
ভোজবাজি ভেল্‌কি।

এমন কাণ্ড কে দেখেছে
এমনতরো কারখানা
কালকে যেটা আস্ত ছিল
আজকে সেটা চারখানা।

ঘরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি
পরের সঙ্গে গাঁটছড়া
তাঁরই দোরে ধর্ণা, যাঁর
পরার কথা হাতকড়া।

গাছে ওঠার মই কেড়ে নেয়
মহামন্ত্রী চিৎপটাং
বিরোধীদের পক্ষ নিয়ে
গদীর দিকে ধায় সটান।

তাড়িয়ে তিনি দিলেন যাকে
তাঁকেই শেষে সে-ই তাড়ায়
এই নাটকের সে-ই তো হীরো
নেত্রীকেও সে-ই হারায়।

নাটকের কি শেষ হয়েছে
শেষের পরেও শেষ আছে
শেষ তাসটি নেতৃদেবীর
হাতের মুঠোয় বেশ আছে।

রাখেন তিনি মারেন তিনি
নাচান তিনি বাঁচান তিনি
সব খিলাড়ির খেলার ঘুঁটি
পাকান তিনি কাঁচান তিনি।

সাবাড় হবে সবাই এরা
পরস্পরের বিষ-নজরে
মনে মনে বলেন দেবী,
যা শত্রু পরে পরে।

১৯৭৯

বারো রাজপুতের বারোমাস্যা

বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি
রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি।
কেউ করে না রাজ্যত্যাগ
তবে কি ফের রাজ্য ভাগ?
রাজ্য ভাগ আবার নয়
বর্ষ ভাগ এবার হয়।
বারো মাসে বারো রাজা
প্রত্যেকেরই ভাগে খাজা।
বৈশাখটা মোরারজীর
তিনিই তখন বড়ো উজীর।
জ্যৈষ্ঠমাসে চরণ সিং
উজীর কেন, তিনিই কিং।
আষাঢ়ে জগজীবন রাম
রামরাজ্যে তিনিই রাম।
শ্রাবণমাসে শ্রী চৌহান
শিবাজীরই সুসন্তান।
ভাদ্রমাসটা বাজপেয়ীজীর
বিশ্বময় চরকিবাজির।
আশ্বিনে রাজনারায়ণ
করেন গদি আরোহণ।
কার্তিকেতে ফার্নাণ্ডিজ
ধর্মঘটের বোনেন বীজ।
অঘ্রানেতে ভূপেশ গুপ্ত
ধনিকবংশ করেন লুপ্ত।
লিমায়ের পৌষমাস
বিড়লা টাটার সর্বনাশ।
মাঘে নম্‌বুদিরিপাদ
বিপ্লবের বজ্রনাদ।
ফাল্‌গুনে সিকন্দর বখ্‌ত
হিন্দু মুসলমানের রক্ত্‌।
চৈত্রমাসটা ইন্দিরারই
এমারজেন্সী আবার জারি?

১৯৭৯

শুনহ ভোটার ভাই

শুনহ ভোটার ভাই,
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
তোমার ভাগ্যে নিত্য ভোগ্য
মৎস্য মাংস খাজা।
শুনবে আমার নাম?
আমি টুইডেলডাম।

শুনহ ভোটার ভাই,
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
সাত খুন আমি মাপ করে দেব
তোমার হবে না সাজা।
নামটি আমার কী?
আমি টুইডেলডী!

১৯৭৯

যদুকুলনিপাত

স্বর্গে গিয়ে, নারায়ণ,
    আছো তো কুশলে!
যদুকুল ধ্বংস হলো
    নিজেরি মুষলে।
যাঁদের বসিয়ে গেলে
    রাজসিংহাসনে

তাঁদের পতন হলো
    আত্মঘাতী রণে।
জয়ের প্রকাশ কোথা
    এ তো পরাজয়
আরো এক নারায়ণ
    ঘটান প্রলয়।

স্বয়ংবর

আসবে কবে নভেম্বর
নভেম্বর না ডিসেম্বর?
আবার কবে নির্বাচন
নির্বাচন না স্বয়ংবর?

এইবেলা তুই ঘর ছেয়ে নে
ছেয়ে নে তোর আপন ঘর।
স্বয়ংবরে জয় না হলে
থাকবে না তোর এই কদর।

দরখাস্ত

হায় রে আমার গড্ডলিকা!
হায় রে আমার পুত্তলিকা!
সওয়া বছর আগেই তোরা
    হঠাৎ হলি বরখাস্ত!

গড্ডলীদের টিকিট দাও!
পুত্তলীদের ভোট জোগাও!
দেশকে আবার মেষ বানাও
    ইতি আমার দরখাস্ত।

স্বয়ংবরের পরে

টুইডেলডাম এলেন ঘুরে
    হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে!
রাজ্যপাট বসুন জুড়ে
    হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে!
কমছে এখন সোনার দাম
টুডেলডাম! টুডেলডাম!
কমবে কবে মাছের দাম?
টুডেলডাম! টুডেলডাম!

আন্দোলন যাবে দূরে
      হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে!

টুইডেলডীর যত দোষ
      কী আফসোস! কী আফসোস!
টুইডেলডী নন্দঘোষ
      কী আফসোস! কী আফসোস!
কয়লা নেই খাব কী?
টুডেলডী! টুডেলডী!
ডিজেল নেই, যাব কী?
টুডেলডী! টুডেলডী!
তাই তো ভোটে জানাই রোষ
      কী আফসোস! কী আফসোস!

2847

১৯৮০

কেন এমন ভাগ্যি

কেন এমন ভাগ্যি হলো
সরষের তেল মাগ্‌গি হলো
কেউ জানে না মাখনের কী খবর।

সরষের তেল নাকে দিয়ে
রাজা ঘুমোন নাক ডাকিয়ে
মাখন মাখায় পায়ের তলায় নফর!

টুইডেলডাম রাজা, তোমায়
      ছি ছি ছি।
এখন থেকে রাজা হবেন
      টুইডেলডী।

কেন এমন ভাগ্যি হলো
শাক সবজি মাগ্‌গি হলো
কেউ দেখেনি মাছের এত দর।

সব চলে যায় রাজার পাতে
এঁটো কুড়োয় হাড় হাভাতে
কেউ জানে না কী আছে এর পর।

টুইডেলডী রাজা, আরে
      রাম রাম রাম!
এখন আবার রাজা হবেন
      টুইডেলডাম!

১৯৭৭

ভোটের ফলাফল

ভোট দিতে যাচ্ছ, মনে রেখো, ভাই
বামরাজ্য চাইনে, বামারাজ্য চাই।
বামারাজ্য ভারী ভালো, বামরাজ্য ছাই।

ভোট দিতে যাচ্ছ, মনে রেখো, ভাই
বামারাজ্য চাইনে, বামরাজ্য চাই।
বামরাজ্য ভারী ভালো, বামারাজ্য ছাই।

ভোট নেওয়া হলো সারা, শোনা গেল নাম
হোথা জয়ী হলো বামা, হেথা জয়ী বাম।

ভঙ্গ রস

একের পিঠে শূন্য ছিল
বিদায় নিল এক
বাকী তবে কী রইল
দিল্লী গিয়ে দ্যাখ।

হ্যামলেটহীন রঙ্গরস
যেমনতর ক্ষুণ্ণ
ইন্দিরাহীন কঙ্গরস
তেমনি ধারা শূন্য।

১৯৭৮

গণতন্ত্রনিপাত

সংসদীয় গণতন্ত্র
যেদিন হবে ধ্বংস
দেখবি সেদিন ধনতন্ত্র
হবেই নির্বংশ।

গণতন্ত্র খতম হলে
দারিদ্র্যও দূর রে
থাকবি সবাই দুধে ভাতে
হিপ হিপ হুররে!

আয় রে তবে ধ্বংস করি
গণতন্ত্র আগে
কাজ কী ভেবে রাজক্ষমতা
পড়বে যে কার ভাগে!

সেই লোকটা স্টালিন কি
সেই লোকটা হিটলার
হয়তো সে এক সেনাপতি
জঙ্গী জোয়ান বিটলার।

সবাই ভালো, খারাপ শুধু
গণতন্ত্রীগুলোই
মেরে তাড়াই ধরে তাড়াই
যাক্ না ওরা চুলোয়।

ওরাই যদি ঘুরে দাঁড়ায়
ওরাই যদি বাঁধে
আমরা তখন দেশ মাতাব
বিষম প্রতিবাদে।

১৯৭৯

দিল্লীকা লাড্ডু

পাঁচশো জন মহারাজা
গেলেন নির্বাসনে
পাঁচশো জন মহারাজা
এলেন নির্বাচনে।
তফাৎটা এই, ওঁদের ছিল
কায়েমী রাজত্ব
এঁদের এটা প্রজার কৃপায়
পাঁচবছরী স্বত্ব।
ডঙ্কা বাজাও ঝাণ্ডা ওড়াও
মহারাজকী জয়!

আমরা বানাই, আমরা তাড়াই
পছন্দ না হয়।
আবার নির্বাচনের ফলে
আবার মহারাজা
এ দল না হোক আরেক দল
খাবেন লাড্ডু খাজা।
গণতন্ত্র, তোমায় আমি
দিলেম দুই সাবাশ
একটি সাবাশ রইল হাতে—
রুচির কই আভাস?

কেঁচো খোঁড়া

ওয়েঞ্চু
খুঁড়তে যাচ্ছেন কেঞ্চু
দেখি দেখি কি উঠে
কেঞ্চু না কেউটে?

১৯৭৪

মৎস্যরঙ্কা

সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী
মৎস্যরঙ্কা কলঙ্কিনী
আন্তুলেকে দুষবেন কে?
সবাই করেন বিকিকিনি।

জাদু

কামরূপিণী বানায় ভেড়া
এই তো ছিল জানা
কামরূপেতে যেতে খোকার
ঠাকুরমায়ের মানা।
খোকা এখন বুড়ো হয়ে
দেখছে এ কী রঙ্গ
কাশ্মীরিণী বানায় ভেড়া
দিল্লী থেকে বঙ্গ।

১৯৭৭

সরাইঘাটের লড়াই

ভাগো ভাগো, মীর জুমলা
করব তোমায় নাস্তানাবুদ
মামলা যতই করো তুমি
কোথায় পাবে সাক্ষীসাবুদ?
পুলিস আমায় ধরবে নাকো
করবে না ঘর খানাতালাস
জেলে আমায় রাখবে নাকো
গেলে আমি অমনি খালাস।
কর্মচারী করবে না কাজ
দিন দুপুরে আফিস খাঁ খাঁ
রেল চলে না বাস চলে না
মিছিল চলে, রাস্তা ফাঁকা।
মাসের পরে মাস কেটে যায়
খনির মুখে তেল আটক
অসহায়ের মতন তুমি
দেখতে থাকো এই নাটক।
হো হো হো মীর জুমলা
সামনে তোমার সরাইঘাট
হা হা হা মীর জুমলা
ঠুঁটো তুমি জগন্নাথ।

একুশে ফেব্রুয়ারী

বাদশা হুজুর
খাঞ্জা খান্
নবাব হুজুর
গাঞ্জা খান
দুই জনাতে যুক্তি করে
জারি করেন এই বিধান—
এখন থেকে প্রজারা সব
ময়না তোতার হোক সমান।
নতুন জবান শিখুক ওরা
ভুলুক ওদের নিজ জবান।
মুখের মতো জবাব দিল
কয়েক জনা নওজওয়ান
মানুষ ওরা, নয়কো পাখী
বলবে নাকো নয়া জবান।
গুলীর মুখে দাঁড়ায় রুখে
অকাতরে হারায় জান
রক্তে রাঙা মাটির পরে
ওড়ে ওদের জয় নিশান।

১৯৭৪

কুমীর

খাল কেটে এনেছিল কুমীর যারা
কুমীরের পেটে যাবে জানত না
তাদের শোকের ছিল সান্ত্বনা।

ঘরের ঢেঁকি শেষে কুমীর হবে
এ কথা এরা কেউ জানত না।
এদের শোকের কই সান্ত্বনা।

১৯৭৫

নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! আর কত বাকী!
আর কতবার হবে একথা প্রমাণ
"বিপ্লব ভক্ষণ করে আপন সন্তান"?
দশ বছরেও ক্ষুধা দূর হলো না কি?

স্বাধীনতা ঘোষণার যে ছিল অগ্রণী
সেই বীরোত্তম আজ ভ্রাতৃকরে হত
ভ্রাতা সেও বীরবর সেও অপগত
বিনা মেঘে নেমে এল এ কোন্ অশনি!

আর বার বলি আমি, কাঁদো, প্রিয় দেশ!
কাঁদো আর কায়মনে করো অনুতাপ
অনুতাপে ক্ষয় হোক আদি অভিশাপ
পিতৃবধে শুরু যার ভ্রাতৃবধে শেষ।

আমরাও শোকাতুর তোমার এ শোকে
বেদনাকে রূপ দিই শোক থেকে শ্লোকে।

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

একদা যে ছিল অখ্যাত এক
ফৌজী হাবিলদার
সম্মানে তার কামান গর্জে
একবিংশতিবার।

গতপ্রাণ বীর পাশে নত শির
রাষ্ট্রাধিপতির!
স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধা
রথী ও মহারথীর!

রণবাজা বাজে ঘন ঘন তাকে
জানাতে শেষ বিদায়
প্রার্থনারত লক্ষ লক্ষ
জন তার জানাজায়।
আহা!
অন্তর ভরে হা হা!
হায় কী বেদন! হায় কী রোদন!
সন্তান অভাগার।

পিতার কবরে একমুঠো মাটি
দেওয়া হলো নাকো আর।

কেউ ভাবল না ইতিহাসে ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এতকাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

১৯৭৭

নোবেল প্রাইজ

নোবেল শান্তি পুরস্কার
বল্ তো পাবেন কে-এবার?
নিক্সন?
না।
ইয়াহিয়া খাঁ।

দেয়ালের লিখন

কেউ বা জেতে ভোটের জোরে
কেউ বা জেতে জোটের জোরে
জিয়া জেতেন গুলী গোলার
চোটের জোরে।

হরেক রকম ফন্দী এঁটে
লেপটে আছেন গদী সেঁটে
মিতারা সব একে একে
পড়ছে কেটে।

ওদিক থেকে সেদিক থেকে
গুলী গোলা জোগান কে কে
বলতে আমি পারব নাকো
বাজী রেখে।

বয়েৎ শুনে কেউ ভোলে না
হুকুম শুনে কেউ টলে না
রেল চলে না, বাস চলে না,
প্লেন চলে না।

শেষের সেদিন আসবে যখন
পড়বে চোখে দেয়াল লিখন
বলতে আমি পারব নাকো
সেটা কখন।

বুলেট যার ব্যালট তার

জোর যার মুলুক তার
মুলুক যার ভোট তার।

ভোট যার গদী তার
গদী যার জোট তার।

এই কথাটি জেনো সার
বুলেট যার ব্যালট তার।

১৯৭৮

শরণার্থী

এইপারে সোভিয়েট বাংলা
ওইপারে সৌদী বাংলা
বল, ভাই

কোথা যাই
কোন্ দেশ আমার শরণ্য?
দণ্ডকারণ্য?

১৯৭৮

Book No

লঙ্কা তেঁতুল সংবাদ

বাপরে! লঙ্কা এমন ঝাল!
বাঘা তেঁতুল লড়তে গিয়ে
হলেন নাজেহাল।

তেঁতুল বলেন, তোমার সঙ্গে
চিরদিনের আড়ি।
এখন থেকে দুই এলাকায়
দুই আলাদা বাড়ী।
লঙ্কা বলেন, তেঁতুল, তুমি
কেমন দেশপ্রেমী?
লঙ্কা ভাগ করবে তুমি
যেমন কালনেমি!
তেঁতুল বলেন, রাজ্যটা কি
তোমার নিজস্ব?

লঙ্কা বলেন, রামায়ণ
পড়েছ অবশ্য।
লঙ্কা ভাগ না করেই
রাম ফেরেন দেশে।
ভাগ না করে ইঙ্গরাজ
লঙ্কা ছাড়েন শেষে।
তেঁতুল বলেন, শিক্ষা তোমার
বাকী আছে পেতে।
স্বাধীনতা যায় না রাখা
গৃহযুদ্ধে মেতে।

এপার ওপার

এপার জিয়া
ওপার জিয়া
মধিখানে চরণ।

মধ্যিখানেই
শঙ্কা নেই
দুই পারেতে মরণ।

ভুট্টোকে আর
মুজিবকে
করি যখন স্মরণ।
১৯৭৯

ভীটো

হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া
রাগ করেছেন হুয়াং হুয়া।
জী হুজুরের কী আদেশ!
ঠাঁই পাবে না বাংলাদেশ।

ধুত্তোর! ধুত্তোর!
রঙ্গ দেখ ভুট্টোর!
হার মেনে তো যুদ্ধ শেষ
মানবেন না বাংলাদেশ।

দিল্লীকে দেন শাসানি
মহান নেতা ভাসানী।
অন্তরে নেই দুঃখলেশ
অপাঙ্‌ক্তেয় বাংলাদেশ।
১৯৭৩

লেবাননের লড়াই

মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে
নয়তো হেথায় হোথায় ঘোরে।
আরাফতের কোথায় খুঁটি?
কোথায় সারা আরব জুটি?
কোথায় বিশ্ব মুসলমান?
কেউ করে না রক্তদান।

কোথায় সখা সোভিয়েট?
গরম বুলি, মাথা হেঁট।
বেগিন করেন হিটলারি
খোদার উপর খোদকারি।
রেগানকেও রাঙান চোখ
দাঁড়িয়ে দ্যাখে বেবাক লোক।

ব্যাঙ্ ছিল যে, হলো হাতী
ফুলতে ফুলতে রাতারাতি।
অতি বাড় বাড়ে যে-ই
ঝড়ে পড়ে যায় সে-ই।

মার্কো পোলোর প্রত্যাবর্তন

নেই চায়না সেই চায়না
চড়ুইতে আর ধান খায় না।
চড়ুই হলো মারা
ধান কাটা সারা।
চড়ুই গেল মরে
ধান উঠল ঘরে।
ঘরে ঘরে লক্ষ্মী
প্যাঁচা নামে পক্ষী।

নেই চায়না সেই চায়না
চড়ুইতে আর গান গায় না।
চড়ুইয়ের বদলে
ঝিঁঝি ডাকে সদলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ
শোনে বৌ শোনে ঝি।
অবিরাম কলতান
দিনমান নিশিমান।

১৯৭৮

লাল কুমড়ো চাল কুমড়ো

লাল কুমড়ো চাল কুমড়ো
দুইজনাতে বাধল বিবাদ
কোন্‌জনা তার জাল কুমড়ো।

মামলা গেল আদালতে
মুনসেফিতে লাল হারল
আপীল গেল জজের কাছে
তাঁর বিচারে চাল হারল।
হাইকোর্টেতে আরেক দফা
সেইখানেতে হয় রফা
দুই উকীলের খাঁই মেটাতে
দফাও কি নয় রফা?

ব্যস্।
এক উকীলের পেটে গেল
লাল কুমড়ো
আর উকীলের পেটে গেল
চাল কুমড়ো।
তলিয়ে গেল মিলিয়ে গেল
জাল কুমড়ো।
ব্যস্।

ব্যাঙ্ বাদশা

এক কোণে ছিল এক কোলা ব্যাঙ্
ফুলতে ফুলতে হলো ফোলা ব্যাঙ্।
চার দিকে চারজন হাতী
ধরল মাথায় তার ছাতি।
হাতীরাই হাঁটু গেড়ে
তুলে নিল পিঠে তার চেয়ার।

মাথার উপরে চড়ে
ব্যাঙ্ হলো হাতীদের সওয়ার।
এর পরে বাদশা সে ফোলা ব্যাঙ্
ফুলতে ফুলতে হবে হাতী।
হঠাৎ যদি না তার
একদিন ফেটে যায় ছাতি।

১৯৭৫

নিউট্রন বোম

গরিলা এক কুড়িয়ে পায়
জিরাফের এক হাড়
সেই হাড়ে সে গুঁড়ায় মাথা
আরেক গরিলার।

কোটি কোটি বছর গেছে
সেই ঘটনার পরে
বনমানুষের জ্ঞাতি মানুষ
শহরে বাস করে।

সভ্য এখন বন্য স্বভাব
বিবর্তনের ক্রমে
সেই হাড়েরই বিবর্তন
নিউট্রন বোমে।

লটারি

গা জ্বলে যায় যা শুনে
কী হবে তোর তা শুনে?
বল না, সখি, গঙ্গাজল
কী হয়েছে, খুলে বল্।

দেয় না কাপড়, দেয় না ভাত
ঠুঁটো আমার জগন্নাথ
জিতলে পরে লটারি
কিনে দেবে মশারি।

১৯৭৮

নাক ডাকা

গিন্নী বলেন কর্তাকে,
তোমার কেন নাক ডাকে।
কর্তা বলেন, রাম! রাম!
নাক ডাকলে শুনতাম।

মাছের বাজারে ব্যাঙ্

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
মাছের বাজারে ব্যাঙ্।
কে খাবে রে কে খাবে রে
সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং?

না খাবে তো খাবে কী?
এ বাজারে পাবে কী?
আকাশছোঁয়া দর যেখানে
সস্তা পাওয়া যাবে কী?

ফরাসী খায় প্যারিসে
রসিকজনের প্যারী সে!
ফরাসী নাম দিয়ে দেখো
কেমন মনোহারী সে।

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
মাছের বাজারে ব্যাঙ্।
তাও একদিন উধাও হবে
কোলাব্যাঙের ঠ্যাং।

হাওড়া যাওয়া

বুড়ো হাবড়া
কেমন করে যায় হাবড়া?
ট্যাক্সিতে?
ট্যাক্সিতে তো দুনো ভাড়া
কে চড়বে নবাব ছাড়া?
বাসে?
বাসে চড়ার হুড়োহুড়ি
পারবে কেন বুড়োবুড়ি?

তবে কিসে?
জীতা রহো বয়েল গাড়ী
কী দরকার তাড়াতাড়ি?
ট্রেন তো এখন বয়েল গাড়ীর
অধম।
হাবড়া থেকে খড়গপুর
ষোলঘণ্টা কদম।

ঘটকালি

ঘটক ঘটক ঘটকালি
ঘটক রে, ঘাড় মটকালি।
এ যে দেখি বুড়ো বর
ব্যোম বাবা মহেশ্বর।

ঘটক বলে, বিনা পণে
আর কে নেবে বিয়ের কনে।
কোথায় পাব তেমন্ ছেলে
অমনি কি আর পাত্র মেলে?

শোন আমার স্পষ্ট জবাব
ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?

সুবচন

কথা শোনো সু
সামনে দিয়ে যেয়ো নাকো
মারবে গোরু ঢুঁ।
সাচ্চা শোনো বাত
পেছন দিয়ে যেয়ো নাকো
মারবে গোরু লাথ।

শোনো ও ভাই, ভূতো
পাশ দিয়ে ওর যেয়ো নাকো
কখন মারে গুঁতো!
সেই তো চতুর
গোরুর থেকে থাকে যেজন
শতহস্ত দূর।

কিসের অভাবে কী

চিনির অভাবে গুড় খাওয়া যায়
চিনির অভাবে গুড়
গুড়ের অভাবে কী খাওয়া যায়
ভাবছি অনেকদূর।
চালের অভাবে গম খাওয়া যায়
চালের অভাবে গম

গমের অভাবে কী খাওয়া যায়
ভাবছি পাঁচরকম।
ঘিয়ের অভাবে তেল খাওয়া যায়
ঘিয়ের অভাবে তেল
তেলের অভাবে কী খাওয়া যায়
ভাবছি এ কোন্ খেল্।

কলা

কাঁচকলা বলে, ভাই, পাকাকলা রে
তোকেই সকলে ডাকে কেন ফলারে?
আমিও তো কলা তবে আমার কী দোষ?
এই বলে কাঁচকলা করে ফোঁস ফোঁস।

পাকাকলা বলে, ভাই, তোকেই তো ডাকে
আমাকে তখন কার মনেই বা থাকে?
যখন সময় হয় খেতে হবিষ্যি
কাঁচকলা দেয় পাতে অতি অবিশ্যি।

শ্যালক

সেকালের রীতি ছিল ধামা ধরা
একালের রীতি হলো মামা ধরা।
তোমার গলায় দেবে মালা কে।
তার চেয়ে বড়ো কথা, শালা কে।

থোড় বড়ি খাড়া

থোড় খেতে লাগে বড়ি
বড়ি কিনতে বেরিয়ে পড়ি।
বড়ি খেতে লাগে খাড়া
খাড়া কিনলে রান্না সারা।

খাড়া বড়ি থোড়
কী যে মজা ওর!

লঙ্কা

কে ডাকছে কাকে?
আমি, খোকার মাকে।
কী বলতে চাও?
লঙ্কা দিয়ে যাও।
লঙ্কা যদি খায়
মুখ জ্বলে যায়।
লঙ্কা ছাড়া ভাত
নেই তাতে স্বাদ।
লঙ্কা ছাড়া ডাল
লাগে নাকো ঝাল।
মাছে নেই লঙ্কা
খেতে মানি শঙ্কা।

কিন্তু—
দিই যদি চুমুতে
পারবে কি ঘুমুতে?

১৯৭৮

তুষার-দম্পতির হীরক জয়ন্তী

শোন শোন, দাদাভাই
শোন, দিদিবোন
তোমরাই এ দেশের
ডারবি ও জোন।
নশ্বর ধরণীতে
ষাট বৎসর
সুখে দুখে কাটিয়েছ
তোমরা অজর।

মনে পড়ে তোমাদের
কনক জয়ন্তী
তখন চেয়েছি আমি
হীরক জয়ন্তী।
অতি ভাগ্যের কথা
পুরেছে সে সাধ

বন্ধুজনের মনে
কত আহ্লাদ।
শোন শোন, দাদাভাই
শোন, দিদিবোন
চিরদিন রও যেন
ডারবি ও জোন।

Darby and Joan : Devoted old couple

ডারবি ও জোন একটি বৃদ্ধ দম্পতির নাম। ওঁরা পরস্পরকে ভালোবাসতেন।

ছাতু

যেমন দেখছি আর
দুধ ভাত পাব না
তা হলে খাব কী আমি
ছিল বড়ো ভাবনা।

দেখলেম খাচ্ছে
ছাতু আর লঙ্কা
গায়ে বেশ জোর আছে
মনে নেই শঙ্কা।

পশ্চিমা মজুরের
এক একটি দল
চাল নেই চুলো নেই
থালা সম্বল।

উপমা

যেমন
নিজের নারীর চাইতে প্রিয় পরের নারী
বাপের বাড়ীর চাইতে প্রিয় শ্বশুরবাড়ী
তেমনি
কর্মকাজের চাইতে প্রিয় ধর্মঘট
মিছিল করে রাস্তা জুড়ে ট্রাফিক জট।

টোকাটুকি

খোকাখুকী
করে গণ টোকাটুকি।
ও বয়সে গুরুগণও
দেননি কি উঁকিঝুঁকি!

রাম রাম।
কোন্ যুগে কে শুনেছে
এ্যায়সা কাম।

নতুন ধাঁধা

ঝোলেও আছেন ঝালেও আছেন
অম্বলেও
খুঁজলে তাঁকে হয়তো পাবে
চম্বলেও।

যেথায় যেমন সেথায় তেমন
যখন যেমন তখন তেমন
নেই অরুচি হয়তো লোটা
কম্বলেও।

ঘরোয়া

বিয়ে যদি করো তবে তুমিই হবে ভর্তা
কিন্তু তুমি দেখবে তোমার গিন্নী হবেন কর্তা।
কোথায় তোমার স্বাধীনতা কোথায় তোমার ফুর্তি?
বাড়ী ফিরে দেখবে তোমার সতীর অগ্নিমূর্তি।

কথাটা ঠিক, তাহলেও শোন, ও ভাই টোগো
বিয়ে যদি না করি তো কে বলবে, "ওগো।"
আমারও তো প্রাণ চাইছে, "ওগো" ডাকি কাকে?
খোকা যদি আসে তবে ডাকব খোকার মাকে।

ক্যানিউট ও সমুদ্র

অমাত্যরা বললেন, রাজা ক্যানিউট,
সমুদ্রও হুজুরকে করে স্যালিউট।
হুজুরের হুকুমৎ মানবে যে-কেউ
আজ্ঞা দিলে হটে যাবে সাগরের ঢেউ।

আসন পাতেন রাজা জলের কিনারে
দেখা যাক ঢেউ তাঁর কী করতে পারে।
গর্জে ওঠেন তিনি, ঢেউ, হট যাও!
হটতে হটতে ঢেউ সত্যি উধাও।

তার পরে আরো জোরে আছড়িয়ে পড়ে
দূর থেকে পারাবার গর্জন করে।
কোথা হে অমাত্যগণ, কোথায় তোমরা!
চোঁ চা দৌড় দেন ভয়ে আধমরা।

রাজার আসন ডোবে, রাজার শাসন
দেখা গেল নয়কো তা জগৎ ত্রাসন।

নিন্দাপ্রশংসা

ওসব জনের নিন্দাবাদ
ও তো আমার জিন্দাবাদ।

ওসব জনের গালমন্দ
ও তো আমার অভিনন্দ।

প্রশংসাকেই করি ভয়
ও তোমার পরাজয়।

১৯৭৬

পুরস্কার

এ জগতে কাজ যদি থাকে
সেই কাজ করিয়ো তোমার।
পুরস্কার কেবা দেয় কাকে।
কাজই কাজের পুরস্কার।

র‍্যাগিং

র‍্যাগিং বলে না একে
এর নাম টরচার।
এরাই একদা হবে
নাৎসীর সরদার।

কনসেনট্রেশনের
ক্যাম্প নয় বেশীদূর।
ঠিকানা জানতে চাও?
হিজলী খড়্গপুর।

অতঃপর

মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার
এই ছিল প্রোগ্রাম
হরিধন পাণ্ডার।

ভাণ্ডারে মা ভবানী
গণ্ডার নিঃশেষ
কী করবে হরিধন
কে বা দেয় নির্দেশ!

কলমবীর

বিটলা রে!
মিথ্যার জয় কলমেই হয়
বলত একথা হিটলারে!
জানত না জয় আনে পরাজয়
শেষ হার যার সেই হারে।

রজ্জুতে
সর্পের ভ্রম করে বহুজন
প্রচারের গুণে হুজ্জুতে।
সর্পকে যারা রজ্জু ঠাহরে
ছোবলটি খায় ল্যাজ ছুঁতে।

১৯৭৬

সকল খেলার সেরা

ঋষি টলস্টয়
একে একে সকল নেশাই
করেছিলেন জয়।

মদ, জুয়া, শিকার
পঞ্চ ম'কার বলে যাকে
সব ক'টাতেই বিকার।

রইল শুধু বাকী
সবার সেরা কোন্ নেশাটি
বলতে হবে তা কি?

রাত্রে বারো মাস
পরিজনের সঙ্গে বসে
ঋষি খেলেন তাস।

সবজান্‌তা

শিশুকালে সাধ ছিল
হব সবজান্‌তা
আর কেউ কিছু জানে
আমি নেহি মান্‌তা।

বৃদ্ধ বয়সে ভাবি
কতটুকু জানি হে
নাতিরাই সব জানে
ভয়ে ভয়ে মানি হে।

চিঠির জবাব

পিকাসোর ছিল এ স্বভাব
দিতেন না চিঠির জবাব।
শিল্পীরা বুঁদ হয়ে থাকে
চিঠি সব জমিয়েই রাখে।
সৃষ্টির নেশা যদি ছাড়ে
জবাব দিলেও দিতে পারে।

খেলার মাঠ না কারবালা

ভারত খেলোয়াড়ের মেলায়
তোদের করি গর্ব
বাঙালী ফুটবলের রাজা
বাঙালী নয় খর্ব।
হায় রে বাগান! হায় বেঙ্গল!
হারালি আজ সর্ব।

কাণ্ড দেখে দর্শকেরা
হাঁকে, ''পালা। পালা।''
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি—
''মার ডালা। মার ডালা।''
খেলার মাঠ না মরণফাঁদ
বাংলার কারবালা।

কলকাতার পাঁচালি

কে শুনেছে এমন কথা
কে দেখেছে এমনতরো নাটক
তিনটি দিনের জন্যে এসে
চোদ্দ বছর এক শহরে আটক।
এ যেন সেই টোমাস মানের
মায়াপাহাড় ম্যাজিক মাউনটেন
দিনকয়েকের পথিক এসে
হারিয়ে ফেলে কালগণনার ট্রেন।
এ যেন সেই কমলী, যাকে
ছাড়তে গেলে কমলী নেহি ছোড়তি
সাধুবাবার মতন আমি
পারছি নাকো নড়তি কিংবা চড়তি।
অমিতাভ দেখছে চেয়ে
হচ্ছে খোঁড়া মোহেঞ্জো হরপ্পা
আমি তো, ভাই, শুনছি বসে
দাশু নিধুর পাঁচালি আর টপ্পা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ
কলিকাতা তবু রঙ্গে ভরা
কী দিয়ে গড়েছে বিধি
নগরীর ভাগ্যে নেই জরা।

আড্ডায় আড্ডায় চলে
বারোয়ারি বিপ্লবী গুলতানি
পিছু হেঁটে ফিরে আসে
আমলটা নবাবী সুলতানী।

ভগীরথের খেল

ধূমধড়ক্কা
চল ফরক্কা
দার্জিলিং মেল।
প্ল্যান আঁটব
খাল কাটব
ভগীরথের খেল।
জল আসবে
নাও ভাসবে
সাত দরিয়া পার।
জান বাঁচবে
প্রাণ নাচবে
এই বন্দরটার।
নইলে অক্কা!
জয় ফরক্কা
ভানুমতীর খেল।
গাছে কাঁঠাল
আঁটাল সাঁটাল
গোঁফে দিই তেল।

পাতাল রেল

পাতাল রেল! পাতাল রেল!
দেখব বলে তোমার খেল্
কখন থেকে রয়েছি উৎসুক।
কিন্তু নেমে পাতালেতে
কেই বা চায় স্বর্গে যেতে।
তাই তো আমার শঙ্কাভরা বুক।
বিন্ টিকিটের যাত্রী যত
তারাও ভয়ে থতমত
টিকিটিও যায় না কারো দেখা
রেল চলবে, চড়বে কারা?
হোমরা যারা, চোমরা যারা
গার্ড ড্রাইভার চড়বে একা একা।

আজব শহর

আজব শহর কলকাতা
মাটির তলায় রেল পাতা।
সুড়ং দিয়ে নামছে মানুষ
যাচ্ছে রসাতল,
পাতালযাত্রী দল।
মাটির উপর ট্রাম বাস

মাটির তলায় রেল,
ভানুমতীর খেল।
রাস্তা জুড়ে তবুও ট্রাফিক জট
এবার তাই আসছে চক্র রেল
ঘুরে ঘুরে চলবে নাকি
শিয়ালদহ মেল।
ভাবছি বসে আসবে কবে আর
মিনিবাসের মতন ছোট
হেলিকপ্টার।
জট এড়িয়ে হব গঙ্গাপার!

শ্যালক-ভগ্নীপতি সংবাদ

ভগ্নীপতি বলেন, শালা,
গদী আমার শ্বশুরের
গদী ছেড়ে জল্দি পালা
আমার জোর অসুরের।

রাজকন্যার বিয়ে হলে
রাজত্ব হয় যৌতুক
বাপের রাজ্য বেটার হবে
এটা কেমন কৌতুক!

শ্যালক তুমি বালক তুমি
বয়স হলে বুঝবে সার
পুতুল আমি পুতুল তুমি
নেপথ্যে এক সূত্রধার।

কান পাতলা ও পেট পাতলা

কান পাতলা বলে, ভাই পেট পাতলা রে
কানের ভিতর যায় তলিয়ে রুই কাতলা রে।
যে যা বলে সত্য মানি
আপন জনে আঘাত হানি
আমার কথার দাম যে এখন এক আধলা রে।

পেট পাতলা বলে, ভাই কান পাতলা রে
পেট থেকে যে যায় বেরিয়ে রুই কাতলা রে।
যে যা বলে গুপ্ত কথা
শুনিয়ে বেড়াই হেথা হোথা
আমার কথার বিশ্বাস যে এক আধলা রে।

চোখ ওঠা

কপাল মন্দ
লেখাপড়া সব হয়েছে বন্ধ।
মুজিবের শোকে করি হায় হায়
চোখ বুজে আসে জয় বাংলায়।

১৯৭৫

অযোধ্যা কাণ্ড

অযোধ্যায় ফিরলেন রাম রাও
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম আমরাও।
এবার তোমরা যারা
মাস শেষে গদীহারা
ঘরে বসে হাত পা কামড়াও।

বর্ষশেষ

বর্ষ শেষ হয়ে এল, শতাব্দীও সারা
বিপ্লবের যুগ সেও বুঝি বা নিঃশেষ
বিপ্লবী ভূমিকা ভোলে দেশ পরে দেশ
বিপ্লবীরা একে একে সিংহাসন হারা।

যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল ফরাসী বিপ্লব
তার দুইশত পূর্তি এই বৎসরেই
বিপ্লব নাট্যের যদি শেষ দৃশ্য এই
তবে কেন দুই শতবর্ষের উৎসব?

আমাদের স্বপ্ন ছিল সেই স্বাধীনতা
প্রেমডোরে বাঁধা যেথা হিন্দু মুসলমান
নিত্য নব দ্বন্দ্ব দেখে ক্লান্ত আজ প্রাণ
কী যে এর ভবিষ্যৎ ভেবে পাই ব্যথা।

এস নববর্ষ, নিয়ে দেশে সুখ শান্তি
নতুন দশক, আনো বিশ্বে রণক্ষান্তি।

১৯৮৯

বেনজীর

বেনজীর সত্যিই বেনজীর,
তাঁর আগে হয়েছেন কে উজীর
ইতিহাসে মুসলিম জাহানের?
জবাব তো জানিনেকো আমি এর।

এর পরে হাসিনা ও খালেদা
এঁদের বেলা কি হবে আলাদা?
এদিকেও যদি ঘটে সে নজীর
এঁরাও হবেন দুই বেনজীর।

দেখা যায় মুসলিম মহিলার
রাজ্যশাসনে আছে অধিকার।
অধিকার থাকলেও মানে কে
রাজিয়ার নিয়তি না জানে কে?

মোল্লা ও মিলিটারি একতা
মহিলাকে ছাড়বে কি ক্ষমতা?
হাতের পুতুল ওরা বানাবে
না মানলে তরবারি শানাবে।

ওরাও কি জয়ী হবে চিরকাল
জনগণ থাকবে কি মেষপাল
ইতিহাসে মুসলিম জাহানের,
জবাব তো জানিনেকো আমি এর।

১৯৮৯

সাত ভাই চম্পা

[দ্বিতীয় ভাগ]

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চৌধুরী

সীজারের যুগে রোমান্ যে ছিল
পুনর্জন্ম ক্রমে
নওগাঁ নগরে পৌঁছিল আসি
কী জানি কিসের ভ্রমে।
শামলা আঁটিয়া মামলা লড়িতে
ব্যাঙ্কো ফাঁদিয়া চাষার কড়িতে
পরের মহিষ চারণ করিতে
ঘরের খাইল সব-ই।
তবু দেখ তার রোমান্ আননে
সৌজন্যের ছবি!

১৯৩৩

ক্লেরিহিউ

মিস্টার জাস্টিস সেন
রায় যত উলটিয়ে দেন।
ছোট ছোট জজ তাই দেখে
রায় ছেড়ে ক্লেরিহিউ লেখে।

No.

উগাণ্ডা

সিংহের ল্যাজে পা দিয়েছ, বাবা।
আমীন! আমীন!
দেখনি তো তুমি সিংহের থাবা।
আমীন! আমীন!

দোভাগা

করলে আমায় অবাক
চেক আর স্লোভাক।
সাম্যবাদী ছিল যখন
এক রাজ্যে ছিল তখন
গণতন্ত্রী হয়ে এখন
দেশকে করে দোভাগ।

এ নিষাদ

সে নিষাদ করেছিল ক্রৌঞ্চ বধ
        বাল্মীকি ঋষি তাঁকে দিলেন শাপ
এ নিষাদ বধ করে বট অশথ
        আমরা পাই শুধু মনস্তাপ।

পুনরাবৃত্তি

হায় কন্যা বেনজীর
রাজিয়ার সে নজীর
        ইতিহাসে রূপ নিল পুনরায়

মোল্লা ও মিলিটারি
এখনো জবর ভারি
        ভুট্টোর নজীর কি ভোলা যায়?

প্রার্থনা একটাই
প্রাণে বেঁচে থাকা চাই
        কাজ কী তোমার রাজক্ষমতায়।

ঘোড়াবদল

        কে না এটা জানে
ঘোড়াবদল করতে নেই
        স্রোতের মাঝখানে।
ঘোড়ার থেকে ঘোড়ায় যেতে
        যেমনি দেবে লাফ
পা ফস্‌কে পড়বে জলে
        লাফ নয় তো ঝাঁপ।

ভাসবে ঘোড়া, ভাসবে সওয়ার
        পারাপার বন্ধ
ঘোড়াবদল করতে গিয়ে
        ঘটবে শেষে মন্দ।
        হবে যেটা হওয়ার
ঘোড়ার নাম সরকার
        রাজীব তার সওয়ার।

ছাতা রহস্য

এ ছাতা কার? আমার ঘরে
ফেলে গেছেন কোন্ সুজন?
নাম জানিনে, কাল সকালে
হবেই তাঁর আগমন।

আসেন না কেউ। দিন চলে যায়
করেন না কেউ সুসন্ধান।
ও মা এ কী! এ যে দেখি
আমার ছাতাও অন্তর্ধান!

ছিন্নকেশী

চুল কই! চুল কই!
কোথা গেল কবরী?
আধুনিকা কন্যাকে
দেখে বলি, আ মরি!

এলোকেশী সেও ভালো
ওই দ্যাখ সোনিয়া
এলো কেশে স্বামী সাথে
ঘুরে আসে দুনিয়া।

আবার বাড়াও চুল
বলেছি তো ইরাকে
এবার ধমক দেব
কথা যদি না রাখে।

আধলা

এক যে ছিল আধলা
আধলা দিয়ে কেনা যেত
আধসেরী এক কাতলা।

আধলা এখন হাওয়া
এক তাড়া নোট না দিলে, ভাই,
কাতলা না হয় খাওয়া।

মাছ ছাড়া কেউ বাঁচে?
যে কোনো দাম দিয়ে খাবে
যেটুকু যার আছে।

সেকেলে এক আধলা
সেটাই নিয়ে যাই বাজারে
কিনব আমি কাতলা।

ধন্য এই শহর!
তামার দাম আগুন এখন
আধলা এখন মোহর।

দেখিয়ে সেই আধলা
আগের মতোই কিনতে চাই
আধসেরী এক কাতলা।

ব্যাপারী কয়, মোহরটাকে
টাকা করেই আনুন
যেমন টাকা তেমনি মাল
ভালো করেই জানুন।
আমি তখন হেসেই ফেলি
লোকটা দেখি পাগলা।

আদার আকাল

আদা চা খেতে গিয়ে
হয়েছি নাকাল
বাজারেতে আজ নাকি
আদার আকাল।

চল্লিশ টাকা কেজি
তবু তা উধাও
মিলবে যখন হবে
আরো বেশি ভাও

জল কামান

কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
পথের ধুলোয় পড়ে আছো, রাজার দুলাল।
বিষ্টি নেই বাদল নেই ধুলো নয় তো, কাদা
কাপড় ভিজে চোপড় ভিজে। কী হয়েছে, দাদা?

আরে ভাই, রাম রাম! এ কী অপমান!
সিপাই দিয়ে দাগা হলো জলের কামান।
কামানের গোলা যেন ফোয়ারার তোড়
তোড়ের মুখে খাড়া হতে কোথায় এত জোর!

আমার যত সৈন্য ছিল রণে দিল ভঙ্গ
লড়তে গিয়ে নাকাল আমি, এ তো বড়ো রঙ্গ।
ঠা ঠা রোদ্দুরে আমি ভিজে সপ সপ
কাদায় লুটিয়ে আছি জলের কচ্ছপ।

তুমি ভাগ্যবান, দাদা, তুমি ভাগ্যবান
কামান দেগেই হয় রাজার সম্মান।
সাহেবরা বলত একে গান স্যালিউট
কামান তো বটে, তাই সম্মান অটুট।

ধৌত তুলসীপত্র

মশাই,
বলতে পারেন কোথায় পাব
ধৌত তুলসীপত্র?
রোমে গিয়ে এলেম দেখে
নেইকো সেটা তত্র।
টোকিওতে এলেম দেখে
নেইকো সেটা তত্র।

কলকাতায় দেখছি এসে
নেইকো সেটা অত্র।
জানতে চাই সেই ঠিকানা
মিলবে সেটা যত্র।
ধৌত তুলসীপত্র।

এঁরা আর ওঁরা

এঁরা॥ তোমরা খারাপ। তোমরা মন্দ।
সেইজন্যেই ডেকেছি বন্ধ।
নিজেদের কেটে ঘ্রাণের অঙ্গ
তোমাদের করি যাত্রাভঙ্গ।

ট্রাম বাস থামাও
যাত্রীদের নামাও।
মিলবে না খাবার
মরে হোক সাবাড়।

ওঁরা॥ তোমরা খারাপ। তোমরা মন্দ।
সেইজন্যেই ডেকেছি বন্ধ।
নিজেদের কেটে শ্রুতির অঙ্গ
তোমাদের করি যাত্রাভঙ্গ।

ট্রেন প্লেন থামাও
যাত্রীদের নামাও।
খুলবে না হোটেল
তুলুক না পটল।

জাত ও জাতি

জাতও বাঁচবে, জাতিও বাঁচবে
জাতিগঠনের ধারা নয়
জাতপাত যদি পথ জুড়ে থাকে
জাতির ঘটবে পরাজয়।

পরাজিত যারা পরাধীন তারা
এই কথা কয় ইতিহাস
সাধ করে কেউ পরতে চায় কি
পরাধীনতার নাগপাশ!

চালাকি

চালাকির দ্বারা হয় না মহৎ কর্ম
মেশাতে চেয়ো না রাজনীতি আর ধর্ম।
ভোটের যুদ্ধে জিতলেও তুমি মসনদ
দেখবে সেখানে ফাঁকি দিয়ে বসা কী আপদ!
যারাই ওঠাবে তারাই নামাবে ভোট দিয়ে
ভূত নেমে যাবে দলটার ঘাড় মটকিয়ে।
লোকের সেবায় কর কিছু ত্যাগ কর্ম
ত্যাগ দিয়ে তুমি জয় করে নাও মর্ম।
ত্যাগের পুণ্য এনে দিতে পারে রাজপদ
রাজনীতিকের ত্যাগই পরম সম্পদ।

ওষুধ

এই ভারতের বন বাদাড়ে ওষুধ আছে কত
সেসব নিয়ে হও না কেন গবেষণারত।
যাও না কেন হিমাচলে বা অরুণাচলে
যাও না কেন কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে।
তরুলতা শিকড়বাকড়, হরেক রকম জীব
তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয় শিব।
ন্যায্য দরে দেয় না ওষুধ বিদেশী কোম্পানি
বেশ তো, তুমি কমিয়ে দাও ওষুধ আমদানি।
প্রকৃতির ভাণ্ডারেই মজুত জবাব
খুঁজে পেতে নাও যদি তো রবে না অভাব।

কাজ

সকলের কাজ আছে জগতে
আছে কাজ পোকা আর মাকড়ের
গাছপালা লতা আর পাতাদের
কাজ আছে শিকড়ের বাকড়ের।

প্রকৃতির সংসারে কোথাও
কেউ কি দেখেছে কোনো বেকারি
আর কোনো প্রাণীদের নয় তা
বেকারিটা মানুষের একারি।

কত শত কাজ আছে করবার
কত শত কর্মীর জন্য
কর্ম না করে কেউ খাবে না
অপরের অর্জিত অন্ন।

তোমরা নতুন যারা এসেছ
তোমরা করবে এর প্রতিকার
অকর্মা যেন কেউ না থাকে
কর্মেতে সকলেরি অধিকার।

এটাও মানতে হবে সবাকে
কর্মের সাথে আছে ঘর্ম
শ্রম থেকে নাই কারো নিস্তার
শ্রম জীবজগতের ধর্ম।

ধন্বন্তরি

যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে
যে মারে সে মরে
ধন্বন্তরি বলি তাকে
আরোগ্য যে করে।

সবুজের অন্তর্ধান

ওরে অবুঝ,
কলকাতাকে করবি কি তুই
নিঃসবুজ?
পার্ক ছিল, হলো বাজার
পুকুর ছিল, হলো পাচার
কোথায় গাছ?
কোথায় মাছ?
দিকে দিকে দালান ওঠে
হরপ্পার দোসর জোটে
পরিণাম তো তেমনি হবে
নেই কি হুঁশ,
নিরঙ্কুশ?

ওরে অবুঝ,
কলকাতাকে করতে হবে
চির সবুজ।
থাকবে কত গাছগাছালি
থাকবে কত পাখপাখালি
শত পুকুর
টইটম্বুর
খোলা আকাশ মেলা বাতাস
মখমলের মতন ঘাস
বাঁচবে মানুষ নাচবে মানুষ
ঊর্ধ্বভুজ
ওরে অবুঝ।

তরুহীন মরু

গাছগাছালি ছিল কত
কোথায় গেল তারা
বহুতল বাড়ীর মেলায়
গাছগাছালি হারা।
পাখপাখালি ছিল কত
কোথায় গেল তারা
গাছ বিনা কে বাঁধে বাসা?
তারাও দেশছাড়া।

নির্মল বাতাস ছিল
কোথায় গেল সে বা
বৃক্ষ বিনা দূষণ রোধ
করতে পারে কেবা।
পার্কগুলো নীলাম করে
পুকুর করে ভরাট
আমরা দিয়ে যাচ্ছি, ভায়া,
শ্বাসকষ্টের বরাত।

বৃক্ষনিধন

তিনটি গাছ মিলে একটি গাছ ছিল
অশ্বত্থ, বট আর জাম
ত্রিবেণী সঙ্গম তিনটি বৃক্ষের
খুঁজেও পাইনেকো নাম
জানালা খুলতেই নিত্য দেখা হতো
বাড়িয়ে দিত ডালপালা

বাড়তে বাড়তেই করত বেদখল
আমার খোলা সে জানালা।
বাইরে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে আমি
দেখি সে গাছ গেছে কাটা
জমিটা ফাঁকা হলো, উঠবে বাড়ীঘর
গাছটা ছিল পথে কাঁটা।

খোকনকে

যাত্রাপথ শুভ হোক, বৎস, তোমার
পথের সাথীরা হোক দরদী সুজন
প্রবাসে বাসা হোক ঘরের মতন
বিদেশী স্বদেশী হোক আত্মীয় আত্মার।

মানুষ যেখানে থাকে, থাকে ভালোবাসা
ব্যবধান ঘুচে যায় অপরিচয়ের
যাত্রা বিনিময় হয় দুই হৃদয়ের
মুখে যার ভাষা নেই চোখে আছে ভাষা।

দ্বাদশ বছর ছিলে আমাদের পাশে
ব্যথা দেবে অহরহ তোমার শূন্যতা
তবুও আনন্দ আছে, তোমারি জন্য তা
তোমার উদয় হবে পশ্চিম আকাশে।

হে বৎস, তোমার যাত্রা জয়যাত্রা হোক
পশ্চাতের তরে তুমি করিও না শোক।

বৃক্ষরোপণ

ছাতিম, তোমায় রোপণ করি
এই নগরীর পথের ধারে
বাঁচবে তুমি, বাড়বে তুমি
আলোকে আর অন্ধকারে।

শিশু তুমি, একলা তুমি
জনক কিংবা নেই জননী
কে যে তোমায় চোখে চোখে
রাখবে, যেন চোখের মণি।

তোমার জন্যে ভাবনা আমার
আমিই যখন রোপণকারী
দীর্ঘজীবী হও গো, বাছা,
প্রার্থনাই করতে পারি।

আশ্রয়ের জন্যে পাখী
আসবে তোমার ধারে কাছে
মানুষেরও তোমার মতো
বন্ধুও কি আর একটি আছে?

ছায়া পাবে পথিক তোমার
খরার দিনে দ্বিপ্রহরে
বর্ষাকালে তুমিই সহায়
মেলবে ছাতা মাথার পরে।

উপকারের বদলে সে
কাটবে তোমার ডাল পালা
সহিষ্ণুতার মূর্তি তুমি
সইবে চিরকাল জ্বালা।

আজ শ্রাবণের বাইশেতে
কবির বাণী স্মরণ করি
ধরণীকে রাখতে সবুজ
বৃক্ষ, তোমায় বরণ করি।

ড্রাগের নেশা সর্বনাশা

তুমিও শেষে ধরলে নেশা
মারাদোনা?
পড়লে ধরা, ছাড়লে পেশা
কী বেদনা!

অলিম্পিকে তুমি কি আর
পাবে সোনা?
তোমার জন্যে মিথ্যে আমার
বছর গোণা।

ড্রাগের নেশা সর্বনাশা
ভুলিও না
নইলে যাবে সকল আশা,
মারাদোনা!

লেনিন মূর্তি

লেনিন মূর্তি না বাঁচে তো
গান্ধীও কি বাঁচবে
গান্ধীমূর্তি ধ্বংস করে
নাচবে ওরা নাচবে।

গান্ধী মূর্তি না বাঁচে তো
সুভাষও কি বাঁচবে
সুভাষ মূর্তি চূর্ণ করে
নাচবে ওরা নাচবে।

ওদের নাচন ওদের মাতন
ওইখানে কি থামবে
রাজনীতির রণাঙ্গনে
নামবে ওরা নামবে।

মারদাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে
বুলেট ছুঁড়ে মারবে
নির্বাচনের ব্যালট বাণে
হারবে ওরা হারবে।

বিশ শতকের সঙ্গে লড়ে
অষ্টাদশ কি পারবে
ভাঙবে কিছু, চুরবে কিছু
সর্বশেষে হারবে।

তৈলসঙ্কট

তেলের থেকে মানুষ মরে
তেলের থেকে পঙ্গু হয়
তবুও তেল খেতেই হবে
না খেলে নয়, না খেলে নয়।
তেল না হলে হয় না মাছ
মাছ না হলে হয় না খাওয়া
দোকানদার কোথায় পাবে
না যদি দেয় জোগানদার।

জোগানদারও পাবে কোথায়
যদি না পায় ঘানী যার
কে যে কোথায় ভেজাল মেশায়
ধরবে কারো সাধ্য নাই
আদৌ সেটা ভেজাল কিনা
আদ্যে প্রতিপাদ্য তাই।
পুলিস থেকে নমুনা তার
মধ্যে ঘটে হাত বদল
বিশ্লেষণের রিপোর্ট আসে
তাতেও থাকে ফাঁকের ছল।

গান্ধীবাদী বন্ধু আমার
আশ্রমেতে বসান ঘানী
তেলী নিজেই ভেজাল মেশায়
হয় তা শেষে জানাজানি।
আশ্রম তো জেলখানা নয়
পাহারা দেয় কর্ম কার
খাঁটি তেল তো জেলেই মেলে
বন্ধু করেন আবিষ্কার।
নিজের ঘানী নিজেই টানো
নয়তো আবার জেল ভরো
"ভেজাল হটাও, শাস্তি দাও"
মিথ্যে কেন গোল করো।

বঙ্গ অন্বেষণ

বাংলাদেশে বঙ্গ কই পশ্চিমেই বঙ্গ
পূর্ববঙ্গ গেল কোথা হলো কিসের অঙ্গ?
পূর্ব বিনা পশ্চিম যে ভূগোলে নিঃসঙ্গ
ইতিহাস বিধাতার এ কী করুণ রঙ্গ!

পশ্চিমকে সঙ্গ দিতে আসেন পশ্চিমা
ইট হয়ে যায় শিলা, রামের মহিমা।
বিদ্যুতে ঘাটতি আর তৈলে অনটন
আনাও পশ্চিম হতে ব্রহ্মাম ফীটন।

নির্বিশেষ বঙ্গ আছে বঙ্গোপসাগরে
পূর্ব ও পশ্চিমে ভেদ সাগর না করে।
বঙ্গোপসাগর সে যে বিশ্বে বৃহত্তম
সর্ব বাঙালীর গর্ব সেই তো পরম।

ঘূর্ণি ঝড়

এল ঝড় সর্বনেশে বাংলাদেশে
দক্ষিণ উপকূলে
ঢেউ সব উথাল পাথাল, টাল মাটাল
সাগরের বক্ষ ফুলে।

ঝড়ের মাতন নামে গ্রামে গ্রামে
বাড়িঘর ভেঙে পড়ে
কেউ বা পালিয়ে বাঁচে দূরে কাছে
কেউ বা ঘুমেই মরে।

বিশ হাত উচ্চে ওঠে, সামনে ছোটে
ডুবে যায় দ্বীপমালাও
ভেসে যায় মানুষ কত, প্রাণী যত
মুছে যায় গাছপালাও।

যদিও বাইরে থাকি, এ কথা কি
কখনো ভুলতে পারি।
দুই দেশ একই হৃদয়, তাই বয়
নীরবে নয়ন বারি।

অশুভের থেকেই শুভ, এটাই ধ্রুব
শুভ হোক বাংলাদেশের
ভালো তো তাকেই বলে, সারা হলে
ভালো যা সর্বশেষের।

পদ্মা গঙ্গা দুই বোন

পদ্মা গঙ্গা দুটি বোন
তোরা আমার কথা শোন্
আপসে মিটিয়ে ফেল্ ঝগড়া।

কেন এত রাগারাগি
জল হোক ভাগাভাগি
পেয়ে যাক যে যার বখরা।

১৯৯২

সেকালের স্মৃতি

কোথায় সেই পদ্মানদী
বিশাল পারাবার
পারাবার পার হব যে
কোথায় ইস্টিমার?

গোয়ালন্দ থেকে দিতাম
চাঁদপুরেতে পাড়ি
চাঁদপুরেতে ধরতে হতো
রাতের রেলগাড়ী।

কুমিল্লায় যাত্রা আমার
নয়তো চাটগাঁয়
ফেরার পথে ইস্টিমারে
সমস্ত দিন যায়।

গোয়ালন্দে নেমে পেতাম
চিটাগং মেল
কলকাতায় পৌঁছে দিত
সকালে সেই রেল।

মেঘনাতেও পাড়ি দিতাম
যমুনাতেও পাড়ি
ইস্টিমার থেকে নেমে
আবার রেলগাড়ী।

ইস্টিমারের আয়েস সে কি
বিমানে যায় পাওয়া
কোথায় সেই হাওয়া আর
কোথায় সেই খাওয়া?

দাও ফিরে সে ইস্টিমার
নাও এ বিমান
সে পদ্মা ফিরিয়ে দাও
নাও এ আস্‌মান।

কলকাতা তিন শ’

বারাণসী বলেন হেসে, শুনছ ভায়া রোম,
কলকাতার তিন শ’ বছর মাত্র বয়ঃক্রম।
তোমার কাছে আমার কাছে তিন শ’ তো শৈশব
কলকাতার কাছে সেটা বিজয় গৌরব।
তিন শ’ বছর পূর্তি বলে তিন শ’ দিন ফুর্তি
মহাকালকে জয় করেছে এমনতর মূর্তি।
কলকাতার কীর্তি শুনে হাসেন দামাসকাস
আমার কাছে তিন শ’ বছর যেন তিরিশ মাস।
বাছা আমার বড়ো হতে চাইছে তাড়াতাড়ি
গুরুজনের চক্ষে সেটা নেহাত বাড়াবাড়ি।
কলকাতার কাণ্ড শুনে গর্জেন অ্যাথেন্স

সদ্যোজাত শহরটার নাই কি কোনো সেন্স?
টিপ্পনী কাটেন হেসে বৃদ্ধ জেরস্লেম,
ভুঁইফোঁড় বন্দরের নাইকো কোনো শেম।
তিন হাজারী নগর এঁরা অবনী মণ্ডন
এঁদের চেয়ে কম বয়সী প্যারিস লণ্ডন।
সেদিনকার কলকাতা তো নয়কো তুলনীয়
তার চেয়েও কমবয়সী শাংহাই টোকিও।
শিশুর চেয়েও শিশু আছে, কিসের তবে চিন্তা?
সবাই মিলে নাচি এস তা ধিন তা ধিনতা।

ধন্য নগরী

রাতের বেলা লোডশেডিং
দিনের বেলা ট্রাফিক জাম
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!

টেলিফোন কয় না কথা
বারোমাসই ব্যায়রাম
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!

টিউবওয়েল দেয় না জল
মেরামতি অবিরাম।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!

রঙ্গময়ী কলকাতা

চার্ণক, ক্লাইভ আর কর্ণওয়ালিস
যেদিকে তাকাই দেখি তাঁদেরি ওয়ারিশ।
গৌরবর্ণ নন, তবু তেমনি বুর্জোয়া
যদিও তুলসীপত্র, তবু নন ধোয়া।
কোম্পানী কেনেন আর কেনেন প্রাসাদ
বাস্তুভিটা কিনে নিতে মনে বড়ো সাধ।
মধ্যবিত্ত বেচে দেয় মধ্য কলকাতা
বহুতল বাড়ী ওঠে যেন ব্যাঙের ছাতা।
দু' একটা ভেঙে পড়ে জাগায় সন্ত্রাস
তবুও নড়ে না কেউ, এতই বিশ্বাস।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা
রঙ্গময়ী কলকাতা নাইকো তার জরা।
ওয়ারিশ বদল হলে কী হবে কী জানি।
কলকাতা বনবে কি মজদুরধানী?

কল্লোলিনী কলকাতা

বাংলাদেশের মানচিত্রে
নাইকো যার স্থান
বাঙালীদের প্রাণচিত্রে
তবু সে অম্লান।
তিনশো বছর পার হয়ে সে
নয়কো রাজরানী
খর্ব এক প্রদেশেরই
গর্ব রাজধানী।
বারো হাত কাঁকুড়ের
তেরো হাত বীচি
তাকেই নিয়ে এত রঙ্গ
নয় কি মিছামিছি?
সেই টাকাতে ডরমিটরি
তৈরি করে দাও
ফুটপাথেতে বসত যাদের
মানুষ তারাও।
পথের কুকুর মারা
কিসের সভ্যতা?
প্রাণে বাঁচার অধিকার
ওদেরও লভ্য তা।

কালীঘাটের পশুবলি
কিসের সংস্কৃতি?
কলঙ্ক রটায় বিশ্বে
আদিম প্রকৃতি।
বৃহত্ত্বের অভিমান তো
মহত্ত্বের নয়
মহান সে সর্ব জীবে
দেয় যে অভয়।
তিলোত্তমার না আছে আর
রূপ ও যৌবন
হৃদয় দিয়ে করুক এখন
প্রেমের আরাধন।
পথের দু'ধারে তরু
মাঠে মাঠে ঘাস
পাখীদের কলরব
নির্মল বাতাস।
কল্লোলিনী কলকাতার
এই তো বৈভব।
গুণীজনের সমাবেশ
সেই তো উৎসব।

কলকাতা

আধুনিকতার বার্তা বয়ে নিয়ে আসে যবে পশ্চিমা বাতাস
দেখা দেয় ভারতের তিন সিন্ধু উপকূলে তিনটি নগর
মাদ্রাজ, বোম্বাই আর কলকাতা প্রতীচীর নব কণ্ঠস্বর
তিনটিতে মিশে আছে দূর অতলান্তিকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।
কলকাতা আরো বড়ো। এখানেই সাগরের জোয়ারের সাথে
গঙ্গা মিলিয়েছে তার হিমাচল শিখরের চিরন্তন বাণী
গঙ্গা আর সাগরের মিলে যাওয়া ধ্বনি যেথা করে কানাকানি
দুই যুগ দুই দেশ সভ্যতার বিনিময় করে দুই হাতে।
তুমি অভিজাত নও, হে নগর, অর্বাচীন অভিনবজাত।

কাশী কাঞ্চী প্রয়াগের কী প্রাচীন কী বনেদী বংশপরিচয়!
দিল্লী আগ্রা মথুরার কী সমৃদ্ধ পুরাকীর্তিচয়!
উজ্জয়িনী কী মহান! ইতিহাসে তুমি নও তেমনি বিখ্যাত।
তুমি নও অতীতের, তুমি নও কুলীনের উত্তরাধিকারী
তুমি কুলপ্রবর্তক, আধুনিক সংস্কৃতির তুমিই অগ্রণী
রেনেসাঁসে তুমি শীর্ষে, সংস্কারের বিপ্লবের তুমি শিরোমণি
সাম্য আর স্বাধীনতা দুই ধ্বজা দুই ভুজে তুমি ধ্বজাধারী।
হিংসাতেও তুমি সেরা। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং তোমারি কলঙ্ক
তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেশভাগ লোকভাগ, মানুষ বিপন্ন
তোমারি রাক্ষসী ক্ষুধা গ্রাম থেকে টেনে আনে নিরন্নের অন্ন।
তোমার সর্বাঙ্গে মাখা গঙ্গামৃত্তিকার সাথে দুর্নীতির পঙ্ক।
সাহেবরা চলে গেছে, সাহেবিয়ানা তো আরো বেড়ে গেছে বেশি
মাতঙ্গীর পূজা করে মণ্ডপে মণ্ডপে আজ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী।
টুইস্ট নাচন নাচে বিসর্জনে ঘুরে ঘুরে নন্দী আর ভৃঙ্গী।
ওদিকে বাজায় খোল হরিবোল হরিবোল মার্কিন বিদেশী।
বাবুস্থানে বাবুয়ানী বাঙালী জাতির তুমি মহাতীর্থ মক্কা।
এখনো তোমার প্রিয় যাত্রা আর সঙ্ আর পাঁচালি ও টপ্পা।
গঙ্গা ভ্যালী সভ্যতার তুমিই মোহেঞ্জোদরো তুমিই হরপ্পা।
তুমি যদি লুপ্ত হও আমরাও সাথে সাথে পাব জানি অক্কা
হাঁকি তাই, "ফরক্কা", "ফরক্কা"
বিশ্ব ব্যাঙ্ক, করো এসে রক্ষা।

পায়রা পুরাণ

যাঁর পরনে সবুজ জামা
তাঁরই নাম কেষ্ট মামা।
কেষ্টমামার রংটি কালো
হলে কী হয়, মনটি ভালো
ওঁদের বাড়ী যাই যখনি
দানাপানি পাই তখনি।
মটর দানা, অড়র দানা
যত রাজ্যের পাখীর খানা।
পায়রা ছিল গণ্ডা কুড়ি
তাদের জন্যে রোজ খিচুড়ি।
দেয়াল জুড়ে ওদের বাসা
খোপে খোপে পায়রা ঠাসা।

লক্কা নোটন গেরোবাজ
কী বিচিত্র ডানার সাজ!
বুলি কিন্তু একই রকম
সবার কণ্ঠে বকম বকম।
মামার ছিল একই নেশা
পায়রা ওড়ান রোজ হামেশা।
নীল আকাশে উড়বে ওরা
চরকিবাজি লাট্টু ঘোরা।
আমরা কি ছাই অত জানি
মামার ভাঁড়ে মা ভবানী?
নিঃস্ব হয়ে ছাড়েন শহর
কোথায় গেল পায়রা বহর!

এইটুকুই আছে মনে
দুষ্টু আমি অকারণে
পায়রার ডিম নিলেম কেড়ে
দিতেম ফেরৎ নেড়ে চেড়ে।
ক্ষুদে যেমন পিং পং বল
রংটা কিন্তু নয়কো ধবল।
পলকা ছিল ডিমের খোলা
গেল ভেঙে লাগতে দোলা।
নষ্ট হবে? আহা! সে কী!
একটুখানি চেখে দেখি।
তারপরে দিই লম্ফ দান
মামা পাছে দেখতে পান।

কে যে কখন আড়াল থেকে
আমার কাণ্ড ছিল দেখে
গলা ছেড়ে জোর চ্যাঁচায়,
"খোকাডিম পায়রা খায়।"
আমি তো, ভাই, ভয়ে হিম
পায়রা খায় আমার ডিম!
ছেলেমেয়ে সবাই মিলে
কী অপবাদ আমায় দিলে!
ছড়া কাটে, নাচে গায়,
"খোকাডিম পায়রা খায়।"

১৯৮৫

চাবুক

যে যা ভাবে ভাবুক, দাদা
যে যা ভাবে ভাবুক
ঘোড়ার চেয়ে চাবুক বড়ো
ঘোড়ার চেয়ে চাবুক।

হুড়মুড়িয়ে পড়লো ঘোড়া
আর পারে না ছুটতে
চাবুক মারো, চাবুক মারো
পারে না আর উঠতে।

ঘোড়া গেছে, চাবুক আছে
ধন্য তোমার চাবুক
যে যা ভাবে ভাবুক, দাদা
যে যা ভাবে ভাবুক।

দোল দোল দুলুনি

[দ্বিতীয় ভাগ]

অটোগ্রাফ

॥ আত্মীয়েরা ॥

আত্মীয়েরা আছে আমার
দেশে দেশে
ছড়ানো।
দেখে গেলাম, সুধারসে
নয়ন হলো
ভরানো।

॥ সূর্যোদয়ের দেশে ॥

সূর্যোদয়ের দেশে
হঠাৎ আমি এসে
ভালোবাসা পেলাম এবং
গেলাম ভালোবেসে।

বৈশাখ, ১৩৭৮

জামাই আদর

ঝণ্টু গেল শ্বশুরবাড়ি
ঝণ্টু! ঝণ্টু!
জামাইবাবুর আদর ভারি
ঝণ্টু!

দিনে ভোজ রাতে ভোজ
কত খাবে রোজ রোজ
ঝণ্টু! ঝণ্টু!
যত বলে, না! না!
ওরা বোঝে, হাঁ! হাঁ!
ঝণ্টু!

মনে হলো ছিঁড়বে নাড়ি!
ঝণ্টু! ঝণ্টু!
হায় বেচারি! হায় বেচারি!
ঝণ্টু!

সমুদ্রের জোয়ার

নদীর তীরে বাস
ভাবনা বারো মাস।
সাগর তীরে বাস
এ কী সর্বনাশ!
সমুদ্রের জোয়ার এসে
করছে দীঘা গ্রাস।

সমুদ্রের ঢেউ
রুখতে পারে কেউ?
ডুবছে রাস্তা ঘাট
দোকান বাজার হাট।
পড়ছে ভেঙে দালান
পর্যটকরা পালান।

কেটে গেলে বর্ষা
আসবে মনে ভরসা।
সাগর হবে শান্ত
জোয়ার হবে ক্ষান্ত।
দীঘার হবে ফের গঠন
চলবে আবার পর্যটন।

২৯. ৮. '৯৭

কলকাতার এ কী দশা

কলকাতার এ কী দশা
রাতেও মশা দিনেও মশা!
মশার জ্বালায় জ্বালাতন
কোথায় করব পলায়ন?
বল্ তো কোথায় মশা নেই
চলব আমি সেইখানেই।
তেমন ঠাঁই কোথায় আজ?
রাজ্য জুড়ে মশক রাজ।

ম্যালেরিয়ার মহামারী
রুখতে পারে কোন্ মশারি?
সাধ্যি কার করবে ধ্বংস
আদ্যিকালের মশক বংশ!
মশা বলে, কী আফসোস!
জ্বরজারি কি আমার দোষ?
অজান্তেই বয়ে আনি
কার বীজাণু তা কি জানি?

সবার উপর কপাল সত্য

বহুতল পড়লে ভেঙে
কে করবে রক্ষা?
বাসিন্দারা ঘুমের ঘোরে
পাবেন নাকি অক্কা?

লক্ষ টাকার প্রশ্ন এটা
কে দেবে এর জবাব?
প্রোমোটাররা হাল আমলে
এক একটি নবাব।

পৌর পিতা পৌর মাতা
এঁরাও সাক্ষীগোপাল
সবার উপর কপাল সত্য
কপাল, দাদা কপাল।

২৩. ৮. '৯৫

অবাক দুগ্ধপান

খবরটা শুনে আমি মুগ্ধ
গণেশজী খেয়েছেন দুগ্ধ।
বিমোহিত হব শুনি যদি
ইঁদুরজী খেয়েছেন দধি।

পার্টিশন

রাজা যাবেন বনবাসে
রাজ্য দেবেন কাকে
দুই ছেলেই আর্জি জানায়
আমাকে, আমাকে।

খোকন বলে, আমিই বড়
রাজ্য আমার ন্যায্য
ছোটন বলে, ছোট আমি
তাই বলে কি ত্যাজ্য?

খোকন ছোটন দুই ভাইয়ে
বাধে তুমুল ঝগড়া
রাজ্যটাকে দু'ভাগ করে
দিতেই হলো বখরা।

ছোটনের দুই বাচ্চা ছিল
নোটন আর ঝোটন
ওরা যখন বড় হলো
ঘটল বিস্ফোটন।

আবার সেই রাগারাগি
আবার সেই ঝগড়া
আবার সেই ভাগাভাগি
রাজ্য দুই বখরা।

খোকনেরও বাচ্চাগুলো
নয়কো অতি শিষ্ট
কেউ জানে না বড় হলে
কী হবে অদৃষ্ট।

৬. ৯. '৯৭

বিশ্বসুন্দরী

বিশ্ব পরীসভায় আমরা
তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ পরীর রাণী
বাঙালী নয় খর্ব।

কিন্তু, হায়, একটি বছর
মুকুট ও খেতাব
তারপর তো আবার সেই
কলেজ ও কেতাব।

ঘেন্না

রাজপুত্তুর রাজা হলে
ডায়ানা হবে রাণী
ব্যর্থ হলো আমার সেই
ভবিষ্যদ্ বাণী।
কুলহারা কন্যাটি
খুঁজতে ছিল কুল
এমন সময় ঘটে গেল
ট্র্যাজেডি বিপুল।

ব্রিটেনের গাটার প্রেস
ফ্রেঞ্চ ফোটোগ্রাফার
ঘেন্না করি তোমাদের
ছবি তোলার ব্যাপার।
ঘেন্না করি পাঠকদের
কৌতূহলী ধরন
যাকেই তারা ভালোবাসে
তারই ঘটায় মরণ।

৯. ৯. '৯৭

রামরাজ্য বাদ

রামরাজ্য রইল কই
রাম তো আবার বনে
শম্বুকের বংশ এখন
রামের সিংহাসনে।

হিন্দুত্ব বিপন্ন নয়
যবনের দ্বারা
দ্বিজত্ব বিপন্ন আজ
শূদ্র করে তাড়া।

অযোদ্ধা কাণ্ড

মায়াবতী শক্তিমতী
তোমায় করি সেলাম
দলিত নারীর মধ্যে এক
রাজ্ঞী দেখতে পেলাম।

আজ্ঞায় তাঁর সাধুসন্ত
যজ্ঞশালা সরান
দাঙ্গাবাজ জঙ্গিরাও
তাঁর ভঙ্গি ডরান।

মথুরাতে যুদ্ধে নেমে
দিলেন এঁরা ভঙ্গ
মায়াবতীর কুহক যেন
ভানুমতীর রঙ্গ।

অযোধ্যার যোদ্ধা যাঁরা
মথুরায় অযোদ্ধা
পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন তাঁরা
এই কথাটা মোদ্দা।

বাবর শা'র শোধ তুললেন
মসজিদ গুঁড়িয়ে
লঙ্কা দহন ফের করলেন
মুখখানি পুড়িয়ে।

মথুরাতে হত সে মুখ
আর-এক পোঁচ কালো
হল না যে, এই কাণ্ডের
এইটুকু যা ভালো।

হাটে হাঁড়ি

নাইকো এখন মারামারি
ভাবছি হাটে ভাঙব হাঁড়ি।
নাইকো এখন ভোটাভোটি
কে খেয়েছে কত কোটি!

২১. ৯. '৯৬

ঘোড়া বেচা কেনা

কাজটা সবার চেনা
ঘোড়া বেচা কেনা।
কাজের কাজী যে
চিনবে তাঁরে কে?
হন্যে হয়ে তাই
খুঁজছে সি বি আই।

সুষমার বিয়ে

সবাই বলে শান্তি চাই
শান্তি কোথায় পাবে
শান্তি সে তো যায় না পাওয়া
সুষমা অভাবে।

অনেক দেখে অনেক ঠেকে
কেটেছে আজ ভ্রান্তি
সুষমাতেই শান্তি আছে
সুষমাই শান্তি।

এপার ওপার

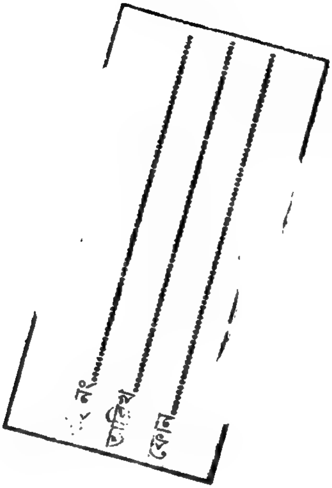

সেই বঙ্গের পাঁচটি বিভাগ
ঘুরি এক এক করে
প্রেসিডেন্সি দিয়ে শুরু
বর্ধমান পরে।
সেখান থেকে রাজশাহী
পরে চট্টগ্রাম
সেখান থেকে ঢাকায় আমি
বদলি হলাম।
সেসব ঠাঁই স্বপ্ন আজ
সেসব দিন স্মৃতি
তবুও আছে আপন জন
আছে তাদের প্রীতি।
একই ভাষা একই গান
একই সাহিত্য
একই চিত্ত একই রক্ত
একই ইতিবৃত্ত।
দুই পারেতে বাঁধুক সেতু
পহেলা বৈশাখ
একটি দিনের তরে ভাঙা
হৃদয় জুড়ে যাক!
সেই দিনটি নেই কোথাও
হিন্দু মুসলমান
দুই পারেই আছে কেবল
বাঙালী সন্তান।

অগ্রন্থিত ছড়া

ঐরাবত

ঐরাবত ছিলেন এক যোগ্য অফিসার যে
বর্ষাকালে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন কার্যে
গ্রামের কাজ সেরে তিনি ফিরে এলেন লঞ্চে
পা ফসকে পড়ে গেলেন ভাগ্যের প্রবঞ্চে
স্ত্রী তাঁর সেই লঞ্চে ছিলেন অসহায়
প্রাণ তাঁর করে শুধু হায় হায় হায়
স্বামীর দেহ তলিয়ে গেল নদীর গহ্বরে
দু'দিন পরে পাওয়া গেল নদীর এক চরে।
দেহ আছে, প্রাণ নেই, ধরাধরি করে
সেই লঞ্চে চালান হ'ল জেলার সদরে।
সদরে ফিরিয়ে এনে হ'ল যে সৎকার
যা কিছু করার ছিল করেন সরকার।

২০০২

2837

—

রাঙা ধানের খই

প্রকাশক — সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রভাস সেন
মূল্য তিন টাকা
উৎসর্গ — আনন্দরূপ ও তৃপ্তি ও তাদের বয়সী সব ছেলেমেয়েদের হাতে দিলুম।
প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৮
চতুর্থ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৪
বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—"হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খৈ।"—ছড়া

ডালিম গাছে মৌ

প্রকাশক — শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদপটশিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধ্রুবজ্যোতি সেন।
মূল্য দু টাকা
উৎসর্গ — পারিজাত /তপতী /বন্দনা / প্রণতি / ভারতী / সোমনাথ /
গোপাল—জ্যাঠামশাই।
প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৫
বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—আতাগাছে তোতাপাখী
ডালিম গাছে মৌ।—ছড়া

আতা গাছে তোতা

প্রকাশক — সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ছবি এঁকেছেন প্রদীপ দাশ।
মূল্য চার টাকা
উৎসর্গ—চন্দ্রহাস ও শতরূপা / তোমাদের জন্যে / দাদু।
প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮১
বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ।—ছড়া

হৈ রে বাবুই হৈ

প্রকাশক — দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ—অহিভূষণ মালিক।
মূল্য পনেরো টাকা
ছড়াগুলি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে লেখা।
উৎসর্গ—ঋতুপর্ণা বর্ণিনী আদিত্যবর্ণ শরণ্য / তোমাদের দাদু।
প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৭
তৃতীয় মুদ্রণ অগস্ট ১৯৭৯
চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৮১
পঞ্চম মুদ্রণ মে ১৯৮৮
ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯২
সূচনায় এই উদ্ধৃতি ছিল— হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খৈ।

রাঙা মাথায় চিরুনি

প্রকাশক — শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ মনোজ বিশ্বাস
মূল্য : পাঁচ টাকা
গ্রন্থটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।
প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৭

বিন্নি ধানের খই

প্রকাশক — রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পীর নাম অনুল্লেখিত।
দাম দশ টাকা।
উৎসর্গ—শতরূপা (মুনমুন) স্মরণে : দাদু।
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯

No.

সাত ভাই চম্পা

প্রকাশক — অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি।
দাম কুড়ি টাকা
উৎসর্গ—শ্রীমান ধীমান ও শ্রীমতী পুতুল দাশগুপ্তকে।
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪
বইটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে ছোটদের ছড়া, দ্বিতীয় ভাগে বড়োদের ছড়া।

দোল দোল দুলুনি

প্রকাশক — অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি
দাম পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ—সুমেধকে / স্নেহাশীর্বাদ / দাদু (অন্নদাশঙ্কর)।
প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৮
বইটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে ছোটদের ছড়া, দ্বিতীয় ভাগে বড়োদের ছড়া।

রাঙা ঘোড়ার সওয়ার

প্রকাশক — অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি।
দাম পঁচিশ টাকা
উৎসর্গ—চন্দ্রহাস রায়
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

Book No —
Date —

উড়কি ধানের মুড়কি

প্রকাশক — শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ
উৎসর্গ—শ্রীদিলীপকুমার রায়কে।
প্রথম সংস্করণ ১৯৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৩
চতুর্থ সংস্করণ ১৯৫৫
পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৩
ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫
বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—'উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ি ভুলাতে!'

2887

শালি ধানের চিঁড়ে

প্রকাশক — শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
দাম তিন টাকা
উৎসর্গ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রদ্ধাস্পদেষু।
প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৯
বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—জলপান করতে দিল
শালি ধানের চিঁড়ে।—ছড়া

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ

প্রকাশক — শিশির ভট্টাচার্য
সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদশিল্পী সমীর দাশগুপ্ত।
দাম পনের টাকা
উৎসর্গ—দাউদ হায়দার কল্যাণীয়েষু [উৎসর্গপত্রে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল]।
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৪

ছড়াসমগ্রে প্রতিটি বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

অগ্রন্থিত ছড়া
২০০২ সনে রচিত কবির শেষ ছড়া এই অংশে স্থান পেয়েছে :
ঐরাবত

লেখকের পৃথক ছড়াগ্রন্থ নয়, নির্বাচিত ছড়া-সংকলন 'হট্টমালার দেশে' ও 'ক্ষীর নদীর কূলে।'
প্রথম বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—খোকন মণির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে।—ছড়া
দ্বিতীয় বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে।—ছড়া।

"অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসম্ভার বাংলাসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ, আরও মূল্যবান তাঁর কথাসাহিত্য, আর তাঁর ছড়াসাহিত্য অমূল্য।

তাঁর ছড়াগুলি রীতিমতো শিল্পকর্ম। খনার বচন, ডাকের বচন, ছেলে-ভুলানো ছড়া, ইত্যাদি লোকসাহিত্যের ভাঙাচোরা ছন্দের রচনা এগুলি নয়। এগুলির ভাবে, ভাষায়, ছন্দে সর্বত্রই শিল্পীর হাতের ছাপ। ছন্দে ও বলার ভঙ্গিতে হাল্কা, কিন্তু ভাবে ভারী। শিল্পগুণ বজায় রেখে তিনি তাঁর রচনার ছন্দ ও বলার ভঙ্গিকে যথাসম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর রচনা কোনোক্রমেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার পর্যায়ভুক্ত নয়। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতা থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কান ও মন খোলা রাখলে দেখা যাবে এই ছড়াগুলিতে অন্নদাশঙ্করের স্বকীয়তা জ্বলজ্বল করছে। এ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

এক সময়ে তিনি লিখেছিলেন:

জব্দিবে কে শব্দীকে,
শব্দ যে যায় সবদিকে।

এই কথাগুলিকেই অঞ্জলি করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম। এর চেয়ে সত্য ও সুন্দর করে তাঁর এই শিল্পকর্মের পরিচয় দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যে তাঁকে ছড়ার রাজা বলেছিলাম, সেটা শুধুই মুখের কথা ছিল না।

তিনি তাঁর ছন্দোবদ্ধ সব রচনাকেই বলেছেন ছড়া। কিন্তু তাঁর অনেক রচনাই আসলে যথার্থ কবিতা। আকৃতি ও আয়তনে ছড়াজাতীয় হলেও, প্রকৃতি ও ভাবগুণে যথার্থ কবিতা। অর্থাৎ এগুলি কবির হাতের কাজ, নেহাত ছড়াকারের কাজ নয়। আসল কবিতার প্রধান লক্ষণ দুটি—অল্প কথার ব্যঞ্জনায় বৃহৎ ভাবকে প্রতিফলিত করা, আর স্বকালের সীমানা পেরিয়ে ভাবীকালে উত্তরণের ক্ষমতা। অন্নদাশঙ্করের অনেক ছড়াই এক-একটি হীরকখণ্ডের মতো এই দুই গুণের আভায় ঝকঝক করে।"

—প্রবোধচন্দ্র সেন

ছোটদের জন্য আরো বই পেতে

এখানে ক্লিক করবেন